অখণ্ড সংহিতা বা

পঞ্চদশ খণ্ড

শ্রী শ্রী স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেবের

উপদেশ - বাণী

ওঁ

অখণ্ড-সংহিতা

বা

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের

উপদেশ-বাণী

পঞ্চদশ খণ্ড

তৃতীয় সংস্করণ পৌষ, ১৪১৪

ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী

ও

ব্রহ্মচারী স্নেহময়

সম্পাদিত।

—নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ—

—ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ—

অযাচক আশ্রম

ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, লাক্সা, বারাণসী-১০

ধর্ম্মার্থ শুল্ক ঃ পঁয়ষট্টি টাকা (মাশুলাদি স্বতন্ত্র)

মুদ্রণ-সংখ্যা ২,০০০ (দুই হাজার)

প্রকাশক—শ্রীস্নেহময় ব্রহ্মচারী
অযাচক আশ্রম
ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, লাক্সা,
বারাণসী-২২১০১০, দূরভাষ : (০৫৪২) ২৪৫২৩৭৬

প্রিণ্টার :—শ্রীস্নেহময় ব্রহ্মচারী,
অযাচক আশ্রম প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,
ডি ৪৬/১৯এ, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট,
লাক্সা, বারাণসী-২২১০১০

: পুস্তকসমূহের প্রাপ্তিস্থান :

অযাচক আশ্রম
ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী-২২১০১০ (উত্তর প্রদেশ)

গুরুধাম
পি-২৩৮, সি-আই-টি রোড, কাঁকুড়গাছি,
কলকাতা-৭০০০৫৪ ● দূরভাষ-২৩২০-৮৪৫৫/০৫১৬

অযাচক আশ্রম
"নগেশ ভবন", ৯৯, রামকৃষ্ণ রোড, শিলিগুড়ি, দার্জ্জিলিং

অযাচক আশ্রম
পোঃ চন্দ্রপুর, ধর্মনগর, ত্রিপুরা (উত্তর)

অযাচক আশ্রম
২০বি, লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা (পশ্চিম)
দূরভাষ : (০৩৮১)২২২৮৩০৫

অযাচক আশ্রম
রাধামাধব রোড, শিলচর-৭৮৮০০১, দূরভাষ : (০৩৮৪২) ২২০২১২

সাধন কুঞ্জ
হীরাপুর, ধানবাদ, ঝাড়খণ্ড ● দূরভাষ-০৩২৬ ২৩১০৭১০

দি মাল্টিভারসিটি
পোঃ—পুপুন্‌কী আশ্রম, জেলা—বোকারো, ঝাড়খণ্ড, পিনকোড :৮২৭০১৩

ডাকে নিতে হইলে ২৫% অগ্রিম মূল্যসহ বারাণসীতেই পত্র দিবেন।

পঞ্চদশ খণ্ডের নূতন প্রথম সংস্করণের নিবেদন

অখণ্ড-সংহিতা নবম খণ্ড প্রকাশের পর হইতে কাগজের এমন একটা দারুণ অবস্থা আসিয়াছিল যে, আমারা দশম খণ্ড হইতে পঞ্চদশ খণ্ড পর্য্যন্ত অর্দ্ধাকারে বাহির করিতে বাধ্য হই। দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপিবার কালে আমারা সেই ত্রুটির সংশোধন করিয়া লইয়াছি।

পূর্ব্বে স্বল্পায়তনে যে চতুর্দ্দশ খণ্ড বাহির হইয়াছিল, তাহা দ্বিতীয় সংস্করণের দ্বাদশখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বতন স্বল্পায়তন পঞ্চদশ খণ্ডও ঐ দ্বাদশখণ্ডের অবয়ব-বর্দ্ধন করিয়াছে। সুতরাং বর্ত্তমান পঞ্চদশ খণ্ড সম্পূর্ণই নূতন গ্রন্থ। এই জন্য ইহাকে নূতন প্রথম সংস্করণ আখ্যা দেওয়া হইল।

"প্রতিধ্বনি" পত্রিকার বর্ত্তমানে এগার বারো হাজার গ্রাহক। "প্রতিধ্বনি"'র পাঠক-সংখ্যা কম পক্ষে এক লক্ষ হইবে। ইহা এক খানা-সর্ব্বজন-শ্রদ্ধিত মাসিক পত্রিকা। এজন্য "অখণ্ড-সংহিতা"'র মূল্যবান্ উপদেশ-সমূহ যাহাতে প্রতিধ্বনি"'র পাঠকেরা পড়িতে সুযোগ পান, তদুদ্দেশ্যে এই গ্রন্থের অজস্র উপদেশের মধ্য হইতে দুই চারিটী উপদেশ "অখণ্ড-বাণী"-রূপে আমরা আমাদের মাসিক পত্রিকা "প্রতিধ্বনি"'র মাধ্যমে প্রচার করিয়া যাইতেছি। বলা বাহুল্য,

"অখণ্ড-বাণী"-সমূহ পাঠের জন্য পাঠক-পাঠিকারা অনেকেই আগ্রহী ও উদ্‌গ্রীব থাকেন বলিয়াই ইহা করা হইয়াছে। সর্ব্বত্র "অখণ্ড-বাণী"র অশেষ প্রশংসা শুনা যাইতেছে। সুতরাং আমারা প্রত্যাশা করিতে পারি যে "অখণ্ড-বাণী"র আকর-গ্রন্থ "অখণ্ড-সংহিতা" নিশ্চয়ই জনসমাজে সমাদর লাভ করিবে। অখণ্ড-সংহিতা নূতন জাতির নূতন বেদ, দেশের নবজাগরণের মহামন্ত্রমঞ্জুষা, মানবে মানবে, দেশে দেশে সম্প্রীতির বন্ধন সৃষ্টিকারী প্রেমসূত্র। ইতি—পৌষ, ১৩৭৭

অযাচক আশ্রম	নিবেদক
স্বরূপানন্দ স্ট্রীট	ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী
বারাণসী-১০	ব্রহ্মচারী স্নেহময়

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

ঠিক ১৩ বৎসর পরে পঞ্চদশ খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইল। প্রথম সংস্করণ পৌষ ১৩৭৭ সনে এক হাজার ছাপা হইয়াছিল। প্রথম সংস্করণে প্রকাশিত অখণ্ড-সংহিতা পঞ্চদশ খণ্ডের ইহা হুবহু পুনর্মুদ্রণ মাত্র। দ্বিতীয় সংস্করণে ইহা পাঁচ হাজার মুদ্রিত হইল। দুই হাজারখানা বিক্রয়ের জন্য রাখিয়া বাকী তিন হাজারখানা বিতরণের জন্য রাখা হইল।

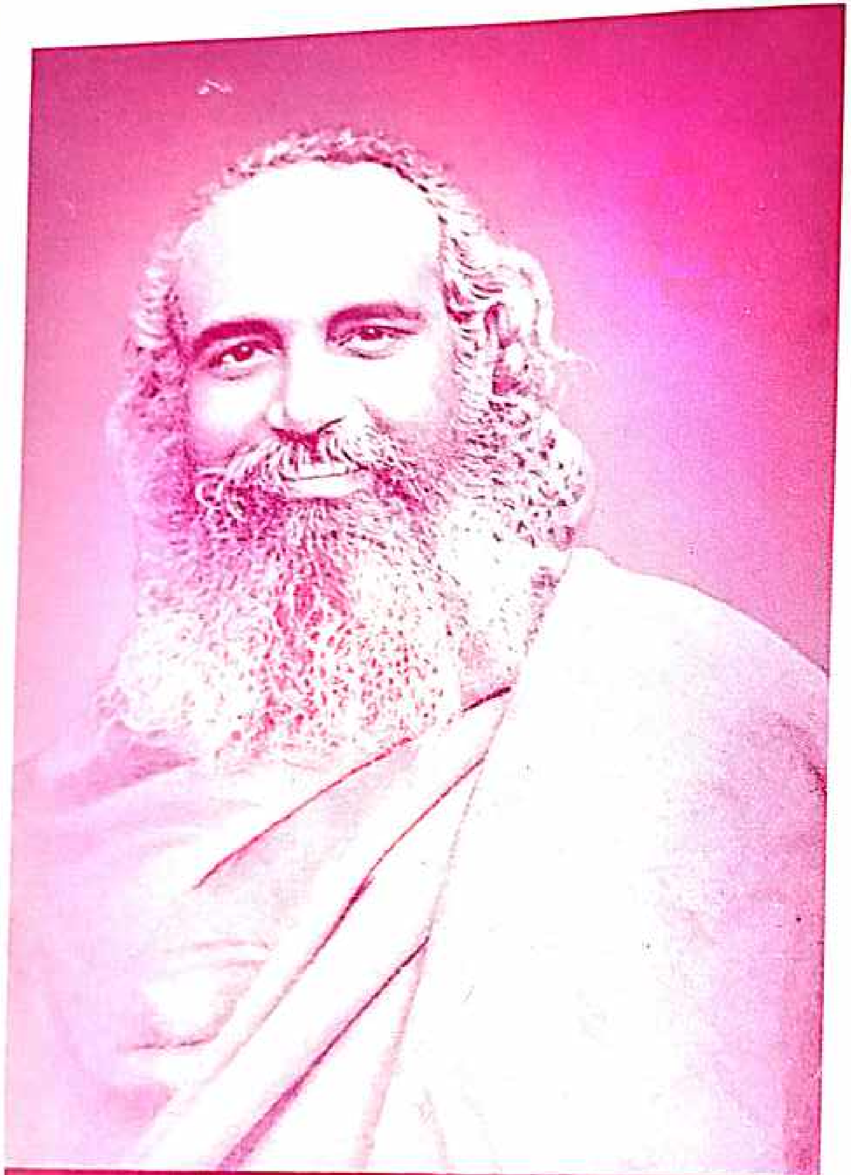
একলক্ষ অখণ্ড-সংহিতা বিনা মূল্যে বিতরণের মহৎ প্রকল্প সংসাধনের জন্য যাঁহারা নিঃস্বার্থ-ভাবে দান করিতেছেন, সেই সকল মহানুভব দাতাদের দানের পরিমাণ ও নামের তালিকা "প্রতিধ্বনি" মাসিক পত্রিকায় নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে এবং হইতেছে।

অখণ্ড-সংহিতার বাণী-সমূহকে গ্রামে গ্রামে গৃহে গৃহে বহন করিয়া নিবার জন্য আমাদের প্রকাশিত "প্রতিধ্বনি" মাসিক পত্রিকা বিগত বত্রিশ বৎসর যাবৎ "অখণ্ড-বাণী" নামে প্রকাশ করিয়া সাধ্যমত নিজ কাজ করিয়া যাইতেছে। ইতি—জ্যৈষ্ঠ ১৩৯০ বাংলা।

	নিবেদিকা
অযাচক আশ্রম,	ব্রহ্মচারিণী সংহিতা দেবী
স্বরূপানন্দ স্ট্রীট,	(মঙ্গলময়ী বন্দ্যোপাধ্যায়)
বারাণসী-১০	গ্রন্থ-স্বত্বাধিকারিণী

তৃতীয় সংস্করণের নিবেদন

অযাচক সন্ন্যাসী, ভক্তি, জ্ঞান ও কর্ম্মের অভিনব সমন্বয়কারী, স্বাবলম্বনের মূর্ত্ত বিগ্রহ, মহাকর্ম্মযোগী, সমদর্শী, স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে আচণ্ডাল ব্রাহ্মণে মহাওঁকার মন্ত্র ও ব্রহ্মগায়ত্রী মহামন্ত্রের অধিকার প্রদাতা, অসাম্প্রদায়িকতার



অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর
শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

ওঁ

অখণ্ড-সংহিতা

বা

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ
পরমহংসদেবের

উপদেশ-বাণী

(পঞ্চদশ খণ্ড)

—ঃ * ঃ—

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব শ্রীহট্ট সহরে এই বারই প্রথম আসিয়াছেন এবং আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সহরে পদার্পণের একটী দিন যাইতে না যাইতেই চতুর্দ্দিকে বিরাট আলোড়ন পড়িয়া গিয়াছে। অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীদুর্গেশ্বর শর্ম্মার গৃহে তিনি উঠিয়াছেন। সদ্ব্যবহার ও সজ্জনতার জন্য দুর্গেশ্বর বাবু সর্ব্বজনশ্রদ্ধেয়।

শ্রীহট্ট
শুক্রবার, ২৬শে পৌষ, ১৩৪১
(১১ই জানুয়ারী, ১৯৩৫)

আত্ম-গঠন বা ব্রহ্মচর্য্য-প্রসঙ্গ

বাংলা ১৩২৯ সালে শ্রীশ্রীবাবামণি ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত কমলাসাগর (কসবা) হাইস্কুলের একটী ছাত্রের নিকটে দুই চারি দিন ব্যবধানে ধারাবাহিক কতকগুলি পত্র লিখিয়াছিলেন। সেই সকল পত্রের কোনও অনুলিপি রক্ষিত হয় নাই। আকস্মিক ঝটিকার উৎপাতে উক্ত ছাত্রের গৃহ হইতে তন্মধ্যে অনেকগুলি মূল্যবান্ পত্র উৎক্ষিপ্ত ও বিনষ্ট হয়। ঝটিকান্তে দেখা গেল, প্রথম দিকের তিন খানা এবং শেষ দিকের আট দশ খানা পত্রের কোনও চিহ্ন মাত্রও নাই। যে ধ্বংসাবশেষ রহিল, তাহারই ব্যক্তিগত অংশগুলি বাদ দিয়া এবং দুই এক স্থলে আবশ্যকীয় সংযোজনা করিয়া ১৩৩১ সালে পত্রগুলি প্রবন্ধ-পরিচ্ছেদাকারে সঙ্কলিত হয়। ইহার পর এই দশ বৎসর ধরিয়া এই সঙ্কলনের কতকগুলি হস্ত-লিখিত অনুলিপি প্রস্তুত করিয়া উন্নতি-লিপ্সু ও আত্মগঠন-পরায়ণ যুবকদের মধ্যে ছড়ান হইতেছিল। সম্প্রতি তাহা "আত্মগঠন বা ব্রহ্মচর্য্য-প্রসঙ্গ" নামে ঢাকার কোনও প্রেসে ছাপিতে দেওয়া হইয়াছে। শ্রীশ্রীবাবামণি উক্ত গ্রন্থের একটী ফর্ম্মার প্রুফ দেখিতেছেন।

জিজ্ঞাসুর লক্ষণ

এমন সময়ে স্থানীয় একটী কলেজের ছাত্র আসিয়া শ্রীশ্রীবাবামণিকে নানা প্রশ্ন করিতে লাগিলেন।

প্রশ্নের উত্তর পাইলেই যুবক চলিয়া যাইবে মনে করিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি প্রুফ দেখার কাজ বন্ধ রাখিয়া তাহার প্রত্যেকটী প্রশ্নের জবাব দিয়া যাইতে লাগিলেন। কিন্তু যুবকের আর প্রশ্নের আদি-অন্ত নাই।

তখন শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—ওঃ, বুঝেছি, তুমি প্রশ্নের জবাব পাবার জন্য প্রশ্ন কচ্ছ না, তুমি শুধু আলাপ কত্তে এসেছ।

যুবক বলিল,—একথার মানে?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মানে এই যে, অন্তরে প্রকৃতই যখন প্রশ্ন জাগে, তখন তার জবাব পাওয়ার জন্য এমন ব্যগ্রতার উৎপত্তি হয় যে, যতক্ষণ সদুত্তর না মিলে, ততক্ষণ আর প্রাণে শান্তি থাকে না। কিন্তু উত্তর যাই এল, অমনি সহস্রশীর্ষ অবিশ্বাসের উদ্যত ফণা নত হ'য়ে গেল। মন বিনম্র নিষ্ঠায় ধ্যানে ব'সে গেল যে, এই সমাধানের ভিতরে কতখানি রস ও মধু আছে, তা' এখনই আস্বাদন কত্তে হবে। প্রকৃত জিজ্ঞাসুর মন বড়ই মৌনসুখী, সে চপলতা ভালবাসে না, চঞ্চলতাকে ভয় করে, বৃথা কোলাহলকে বর্জ্জন করে এবং নীরবতার ভিতর দিয়ে অন্তরের প্রশান্তি অর্জ্জন করে। প্রকৃত জিজ্ঞাসু হ'তে চেষ্টা কর বাছা।

মহাপুরুষ-সঙ্গের নিয়ম

যুবকটী বলিল,—আমি মহাপুরুষের সঙ্গ কত্তে এসেছি। আমার অন্য কোনও উদ্দেশ্য নেই।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সঙ্গ কত্তে হ'লেই কি বাবা ঝুড়ি ঝুড়ি প্রশ্ন কত্তে হবে? এক পাশে চুপ্‌টী ক'রে ব'সে থাক, মনকে একাগ্র ক'রে তোমার যে নাম অতি প্রিয়, ভগবানের সেই নামটী স্নিগ্ধ মনে জপ কত্তে থাক। দেখ্‌বে এতেই প্রকৃত মহাপুরুষ-সঙ্গ হবে। সাধুর ভিতরে যদি কোনো সদ্‌বস্তু থাকে, তবে এতেই তা' তোমার ভিতরে সংক্রামিত হবে। সাধু-সন্তের কাছে গেলে কথার ফোয়ারা ছুটিও না। তাঁরা নিজেরা যদি কৃপাবশে কোনো উপদেশ দেন, তবে তা শ্রদ্ধার সঙ্গে শুন্‌বে, আর যদি কোনো উপদেশ না দেন, তাহ'লে নিজের মনে নিজ ইষ্টনাম জপ্‌বে।

সাধু-সঙ্গ ও তর্কযুদ্ধ

যুবক বলিল,—সাধুরা যা' বল্‌বেন, তাই বিনা তর্কে মেনে নিতে হবে? তিনি কি ভুল বল্‌তে পারেন না?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তাঁরা যা বল্‌বেন, তাই মান্‌তে হবে, তা নয়। তাঁদের প্রদত্ত উপদেশের মধ্যে যেটুকু তোমার পক্ষে গ্রহণ সম্ভব, তাই গ্রহণ কর্ব্বে, যা' অসম্ভব, তা' গ্রহণ কর্ব্বে না। কিন্তু তর্ক-যুদ্ধে অবতীর্ণ হ'য়ো না। সাধুরা ডিবেটিং-

ক্লাব নন, তাঁরা দ্বিধাক্লিষ্ট মনের চিকিৎসক, তাঁরা অশান্ত হৃদয়ে শান্তির পরিবেশক। যাঁর কাছ থেকে যতটুকু পার, শান্তি কুড়িয়ে নাও,—যুদ্ধ ক'রে অশান্তি বাড়িয়ো না।

আশ্রম-বাসীর কর্ত্তব্য

অদ্য পুপুন্‌কী-আশ্রম-বাসী জনৈক কর্ম্মীকে শ্রীশ্রীবাবামণি পত্র লিখিলেন,—

"জ্ঞানী হও কিন্তু জ্ঞানের গর্ব্ব করিও না কিম্বা জ্ঞানের অকারণ প্রদর্শনী খুলিও না। লব্ধ জ্ঞানকে জীবনের কর্ম্মে নিয়োজিত কর, তাহাকে জাহির করিয়া লোকের চখে তাক্ লাগাইবার চেষ্টা করিও না। ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর, কিন্তু নিজের জন্য কিছু চাহিও না। পৃথিবী জুড়িয়া সহস্র সহস্র লোক রহিয়াছে, যাহারা প্রার্থনা করিতে জানে না, হৃদয় উজাড় করিয়া ভগবানের চরণে ঢালিতে শিখে নাই। প্রার্থনা কর তাহাদের জন্য। ভগবানের কাছে সুখ-সমৃদ্ধি চাহিলে দোষ নাই, কিন্তু তোমার নিজের জন্য চাহিও না, চাহিও লক্ষ লক্ষ মূক মূর্খ দরিদ্র সাধারণের জন্য। কলহপরায়ণ দুই উগ্র প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যখানে গিয়া দাঁড়াইও না, কেননা তদ্রূপ কার্য্যে অনেক সময়ে বৃথা শক্তিক্ষয় ঘটে। বিশেষতঃ উত্তেজিত প্রতিদ্বন্দ্বী-দ্বয় অযাচিত মধ্যবর্ত্তীর উপস্থিতিকে প্রীতির চক্ষে দেখে না বলিয়া বরং অধিকতর উত্তেজিত হইয়া থাকে। কিন্তু যেখানে পার রজঃ প্রবৃত্তির সকল মানুষের সঙ্গ

কর, তাহাদের ভিতর হইতে অবৈধ-প্রতিদ্বন্দ্বিতা দূর করিয়া দিবার জন্য তাহাদিগকে চিত্তের সাত্ত্বিক সঙ্গ দান কর, ক্ষণিকের অভ্যুদয়কে শাশ্বত অভ্যুদয়ে পরিণত করিয়া লইতে তাহাদিগকে উৎসাহ প্রদান কর। শাস্ত্রের অক্ষরগুলি অপেক্ষা শাস্ত্রের মর্ম্মকে অধিকতর উপলব্ধি করিতে চেষ্টা কর এবং সেই উপলব্ধিকে হৃদয়োত্থ সহজ ভাষায় গ্রাম-প্রচলিত সহজ উপমায় সকলের কাছে ব্যাখ্যা কর। ইহাতে তোমার হইবে নিষ্ঠাবৃদ্ধি, লোকের হইবে কুশলবৃদ্ধি। আশ্রম-বাসী সেবক-বৃন্দের চিত্ত ও চরিত্র এইরূপই হওয়া আবশ্যক। আশ্রমের মত আশ্রম আমি একটাও গড়িতে পারি নাই এবং যুগপৎ সহস্র দিকের সহস্র কর্ম্ম লইয়া কেহ তাহা করিয়া উঠিতে সম্ভবতঃ পারেও না। কিন্তু তোমরা যে কয়জন জ্ঞানান্বেষী হইয়া আমার সমীপস্থ হইয়াছ, তাহাদিগকে যে কয়টী কথা কহিয়া গেলাম, সেগুলি তোমাদের সত্যিকার কাজে আনিতে সমর্থ হও। আমি হিতকথা বলিলেই তাহা তোমাদের কাজে আসিবে না, যদি তাহা কাজে আনিবার জন্য তোমাদেরও না থাকে উদগ্র, একাগ্র, ব্যগ্র আকাঙ্ক্ষা। হেলায় খেলায় কোনও প্রকারে জীবন কাটাইয়া দিবার তামসিকতা যাহাদের নাই, ব্যগ্র আকাঙ্ক্ষা ত' বাছা একমাত্র তাহাদেরই মধ্যে সম্ভব।

সরলতা ও কর্ম্মশক্তি

"চরিত্রের সরলতা এবং অসাধারণ কর্ম্মশক্তি এই দুইটী

জিনিষকে আমি তোমাদের কাহারও ভিতরেই যুগপৎ দেখিতে পাইতেছি না বলিয়া মনে মনে অনেক সময়ে সন্তাপ ভোগ করিয়া থাকি। যাহার চরিত্রের সরলতা আছে, সে প্রতিষ্ঠানের শান্তিরক্ষক হইয়া থাকে। যাহার কর্ম্মশক্তি অপরিসীম, সে প্রতিষ্ঠানের শ্রীবৃদ্ধি-সাধক হইয়া থাকে। কিন্তু যে সরল, অকপট ও কুটিলতা-বর্জ্জিত, তারও যদি কর্ম্মশক্তি না থাকে, তাহা হইলে সে প্রতিষ্ঠানের ঘাড়ের বোঝায় পরিণত হয়। যে কর্ম্মশক্তিশালী, অধ্যবসায়ী ও বীর্য্যবান্, সেও কুটিল ও অসরল হইলে প্রতিষ্ঠানের মূষলে পরিণত হয়। মহাভারতে নিশ্চয়ই পড়িয়াছ যে, যদুকুলের মূষল সমগ্র বংশের ধ্বংসের কারণ হইয়াছিল। আশ্রমে তোমরা সরল চিত্ত লইয়া অনেকেই আসিয়াছ, কিন্তু কর্ম্মশক্তির পূঁজি তোমাদের অত্যল্প বলিয়া তোমাদের ভার আমার স্কন্ধে চাপিয়াছে এবং তাহার ফলে প্রতিষ্ঠানের দ্বারা অপরাপর ব্যাপক জনহিতের ব্যবস্থা করিতে পারিবার আগে তোমাদের জঠরানল-নিবৃত্তির দাবী পূরণের জন্য আমার বারো আনা সময় এবং শ্রম অপব্যয়িত হইয়া যাইতেছে। কোনও অভিযোগ করিবার জন্য একথা বলিতেছি না। কর্ম্মশক্তি-বর্দ্ধনের প্রয়োজনীয়তার দিকে তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই একথা কহিতে হইতেছে। ভবিষ্যতে যদি কখনও প্রতিষ্ঠানের হিতৈষী বা বাহিরের জনসাধারণ এই প্রশ্ন করে যে, এই প্রতিষ্ঠান জন-সাধারণের জন্য এতদিনে কি করিয়াছে, তাহা হইলে তোমাদের কয়েকজনের অন্ন-

সংস্থানের অতিরিক্ত কিছু করিয়াছে বলিয়া আমি হয়ত বলিতে পারিব না। আমি যে দেশের পর দেশ ঘুরিয়া শত শত হতাশের প্রাণে আশা জাগাইয়াছি, আমি যে অপরিসীম পর্য্যটন-ক্লেশ সহ্য করিয়া সহস্র ঘুমন্তের ঘুম ভাঙ্গাইয়াছি, আমি যে বহু স্থানে বহু ভাবে নব নব কর্ম্মোদ্দীপনা সৃষ্টি করিয়া বহু নবতর প্রতিষ্ঠান সমূহের সৃষ্টি বা পুষ্টির সহায়ক হইয়াছি, এই কথার প্রমাণ হয়ত তখন তোমাদের ঐ আশ্রমটার মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। তথাপি আমাকে তোমাদেরই জন্য শ্রম করিয়া আয়ুঃক্ষয় করিতে হইতেছে এই প্রত্যাশায় যে, চরিত্রের সরলতা লইয়া আনুগত্য-যুক্ত থাকিলে পাঁচটী সাধারণ কর্ম্মীর সঙ্ঘই জগতে অসাধারণ কর্ম্মসাধনা করিয়া যাইতে পারে। পরন্তু তোমাদের মধ্যে যাহারা কর্ম্মশক্তিবর্জ্জিত, তাহারা যদি সরলতাহীন ও আনুগত্য-বঞ্চিত হও, তবে এ প্রতিষ্ঠান আমার কায়া ছাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে বাতাসে মিশিয়া যাইবে, এমন কি আমি ইহার সংশ্রব ছাড়িয়া ভগবন্নামের সেবায় কখনো বসিয়া গেলে তোমরা ইহার জড় প্রস্তরখণ্ড-গুলিকেও নিজেদের আয়ত্তে রাখিতে সমর্থ হইবে না। তোমরা প্রত্যেকেই জান, সর্ব্বকর্ম্ম পরিহার করিয়া, সকল বৈষয়িক দায়িত্ব হইতে পরিপূর্ণ অবসর লইয়া একমাত্র প্রাণারাম নামের সাধনে ডুবিয়া যাইবার আগ্রহ এক এক সময়ে আমার কত প্রবল হয় এবং অপরাপর সময়েও সেই আগ্রহটী আমার সমগ্র অস্তিত্ব বেড়িয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায় আমার

পার্থিব দেহের অবসানের বহু পূর্ব্বেই আমার রচিত বা কল্পিত আশ্রমগুলি তোমাদের পরিচালনে আসিবার প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী।

আজ্ঞানুবর্ত্তিতা

"কর্ত্তৃত্ববুদ্ধিসম্পন্ন দুই জন লোকও দীর্ঘকাল একত্র মিলিয়া চলিতে পারে না। মিলন সম্ভব সেবাবুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তিদের ভিতরে। সেবাবুদ্ধি আর আনুগত্য পরস্পর হাত ধরিয়া চলে। আজ্ঞানুবর্ত্তিতা মাত্র তাহার মধ্যেই সম্ভব হয়, যাহার ভিতরে নির্ভর আছে, যাহার অহং-চেতনা প্রবল নহে। আজ্ঞানুবর্ত্তিতা অপরের পক্ষে সম্ভব নহে। আমি তোমাদের একজনকেও কখনও আজ্ঞানুবর্ত্তী হইবার উপদেশ দেই নাই। নিজেকে এবং নিজ কর্ত্তৃত্বকে সম্পূর্ণ-রূপে নেপথ্যে রাখিয়া তোমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীন মতামতের পরিপূর্ণ সম্মান অটুট রাখিয়া আমি আমার আশ্রমীয় শ্রম-পরম্পরা পরিচালন করিতেছি। ইহা আমার অপেক্ষা তোমরা অধিক উপলব্ধি করিতে পারিবে। প্রতি পরদিন প্রত্যূষ কাল হইতে যে কাজগুলি হইবে বা না হইবে, তাহার কর্ম্মসূচী প্রতি আগের-দিন সন্ধ্যার পর আমি তোমাদের লইয়া প্রস্তুত করিয়া আসিতেছি। তোমাদের মত, রুচি ও শক্তি প্রয়োগের আকাঙ্ক্ষাকে অনুসরণ করিয়া আমি আমার মত, রুচি ও আকাঙ্ক্ষাকে তোমাদের নিকটে উন্মুক্ত করিয়াছি। যে ক্ষেত্রে

তোমরা নিতান্তই বিভ্রান্ত এবং কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণে অক্ষম, মাত্র সেই ক্ষেত্রে আমি আমার অলঙ্ঘনীয় আদেশ লইয়া আবির্ভূত হইয়াছি। তোমাদের জীবনের অতীব বিরল কতিপয় অবসরে ছাড়া তোমরা আমার আদেশদাতার মূর্ত্তি দর্শন কর নাই। কিন্তু তথাপি প্রতিষ্ঠানের কুশলের দিক্ হইতে এই কথা চির সত্য জানিবে যে, তোমাদের মধ্যে আজ্ঞাবহতার পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠা ব্যতীত প্রতিষ্ঠান তাহার নিজ লক্ষ্যে, পূর্ণ বেগে চলিতে পারিবে না। তোমাদের অন্ন আমাকেই অর্জ্জন করিয়া দিতে হয় বলিয়া তোমাদের এই বিষয়ে দায়িত্ব আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে। আমি তোমাদের অন্নদাতা বলিয়া নহে, তোমাদের অন্ন অর্জ্জনে আমার অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হইয়া যাইতেছে বলিয়াই আমার প্রত্যক্ষ সেবা এই প্রতিষ্ঠান অল্পই পাইতেছে। যে সেবা আমি একনিষ্ঠ প্রযত্নে এই লোকহিতকর প্রতিষ্ঠানটীকে প্রদান করিতে পারিতাম, তাহা একমাত্র তোমাদের মত অল্প-কর্ম্মশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদেরই পোষণের পশ্চাতে প্রযুক্ত হইতেছে বলিয়া তোমাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠানের আসল সেবা হইবার প্রয়োজন অত্যধিক বাড়িয়াছে। সেই আসল সেবা তোমাদের আজ্ঞানুবর্ত্তিতা ও ঐক্যের ভিতর দিয়াই সংসাধিত হওয়া সম্ভব। আজ্ঞাবহ ও ঐক্যবদ্ধ নিকৃষ্ট ব্যক্তিরাও জগতে অসাধ্য সাধন করিতে পারে। আশ্রমে বসিয়া তোমরা কে কি করিতেছ, তাহা ভাবিয়া দেখ। পার্শ্ববর্ত্তী পল্লীগুলিতে যাইয়া তোমরা দিব্য জীবনের বাণী

ছড়াইতেছ কি? না, কঠোর শ্রম-পূর্ণ দেশ-পর্য্যটন সমাপ্ত করিয়া আশ্রমে ফিরিবার পরক্ষণে আবার আমাকেই মানভূমের গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া পল্লীবাসীদের সেবা করিতে হইবে? সেবা করিতে আমার অরুচি নাই, এবং তাহা ত' করিয়াও আসিতেছি। কিন্তু তোমরা কি করিতেছ? ব্যক্তিগত সাধন-ভজনের দিকে তোমাদের লক্ষ্য আকৃষ্ট হইতেছে, ইহা উত্তম কথা। কিন্তু শুধু নিজ নিজ সাধন-ভজন লইয়াই মগ্ন হইয়া থাকিবে, জনসেবার পবিত্র ব্রতের কোনও পরোয়া রাখিবে না, ইহাই যাহাদের লক্ষ্য হইবে, তাহারা এই অযাচকের আশ্রমে কেন আসিবে? তাহাদের জন্য উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা হৃষীকেশে বাবা কালীকম্বলীওয়ালার সত্রে রহিয়াছে। তাহারা শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া মাধুকরী করিয়া সাধন-ভজন করিবে। অনেক জগৎপূজ্য সাধক-মহাত্মা হৃষীকেশ বা বৃন্দাবনে ইহা করিয়া থাকেন। তোমরা অযাচকের আশ্রমটী পরিত্যাগ করিয়া সেই স্থানে কেন যাও নাই? আমার অযাচকত্ব যদি শুধু তোমাদের বসিয়া বসিয়া ধ্যান-ভজনের আনুকূল্য সম্পাদনের জন্যই হইয়াছে বলিয়া মনে কর, তবে ইহা তোমাদের বিষম ভুল। এই ভুল তোমরা সংশোধন কর। আমি নিজের ভজন, সাধন, আরাধনা রেলে, ষ্টীমারে নৌকায় বসিয়া চালাইতেছি। সমগ্র দিবসব্যাপী জনতার-বেষ্টনী হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া ফাঁকে ফাঁকে ভগবানের পবিত্র নামের সহিত নিজেকে যুক্ত করিয়া যাইতেছি। অনেকেই আমাকে জপ, তপ, সাধনা

করিতে দেখে না। বাক্যমুখরিত বক্তৃতা-মঞ্চ হইতে নামিয়া আমি বিশ্রাম স্থানে ফিরিবার মুখে গাড়ীতে বসিয়া আমার পরমপ্রাণারাম প্রেমময় প্রভুর চরণের সাথে নিজের সংযোগ সাধন করিতেছি, আবার বিশ্রাম-স্থানে পৌছিবার পরক্ষণেই বিশ্রাম গ্রহণের পরিবর্ত্তে জিজ্ঞাসু সজ্জনগণের প্রশ্নের উত্তর দানে, সমস্যার সমাধানে, শঙ্কা-বিমোচনে কিম্বা জগজ্জোড়া হাজার পত্র-লেখকের পত্রোত্তর প্রদানে কাটাইতেছি। যাচিবার নিয়ম নাই, যাচিবার রুচি নাই, কিন্তু অযাচিত ভাবে যখন যেখান হইতে দুই টুকরা রুটি আসিয়া যাইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের নিকটে পাঠাইতেছি। তোমরা এক অন্নহীন বস্ত্রহীন বন-প্রান্তরে বসিয়া বসিয়া আশ্রমের সেবা কর, আর আমি দূরদূরান্তর হইতে তোমাদের নানা বাস্তব ও কল্পিত অভাব-অনটনের কথা ভাবিয়া তাহার কোন্‌টার প্রতীকার বা প্রতিষেধ কত দ্রুত করা যায়, সেই বিষয়ে তড়িদ্‌গতিতে ব্যবস্থা-পরায়ণ হই। এমতাবস্থায় তোমরা চিন্তা করিয়া দেখিও যে, আশ্রমের প্রতি তোমাদের কর্ত্তব্য কত মহৎ, কত গভীর, কত বিরাট, কত আশু। কিন্তু সেই কর্ত্তব্য কি আজ্ঞানুবর্ত্তিতা ছাড়া প্রতিপালন সম্ভব হইবে?

অহঙ্কারের বিসর্জ্জন

"আমি ত' কেবলই স্বপ্ন দেখিতেছি যে, আমার আপ্রাণ শ্রমের বিনিময়ে আশ্রমের প্রস্তর-কঙ্করের দন্ত বিদূরিত হইবে,

উচ্চাবচ প্রস্তর-কঠিন মৃত্তিকা কর্ষিত ও খণ্ডিত হইয়া শ্যামল শস্যক্ষেত্রের শোভন রূপ ধরিবে, ফুল ফুটিবে, ফসল উঠিবে, ভিক্ষা ব্যতীত তোমাদের মুখে দুই বেলা দুই মুঠা পবিত্র অন্ন ঐ ভূমি হইতেই আসিবে এবং সেই অন্নমুঠির সেবা করিয়া যে বল, যে স্বাস্থ্য, যে আয়ু তোমরা অর্জ্জন করিবে, তাহা ঐকান্তিকী নিষ্ঠা-সহকারে দেশের, দশের, জগতের সেবায় সম্যগ্‌রূপে নিয়োগ করিয়া তোমরা কৃতকৃতার্থ হইবে। কিন্তু অসন্তুষ্ট চিত্তের দ্রোহ-গুঞ্জন যেন অশরীরী ভাষায় আমার কাণে আসিয়া পৌছিতেছে। তোমাদের কাহারও কাহারও ব্যক্তিগত কর্ত্তৃত্বলিপ্সা যেন এক অভাবনীয় ষড়যন্ত্রের সৃষ্টিপথ খুঁজিতেছে এবং ব্যক্তিগত লিপ্সার যূপকাষ্ঠে অপর অল্পবুদ্ধি সহকর্ম্মীদের সুকৌশলে বলি দিয়া নিজের জিদ্ বজায় রাখিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। হয়ত ইহা অনুমান, হয়ত ইহা অসত্য। আমি চাহি, ইহা অসত্য হউক, কিন্তু সময়ের উপযোগী বলিয়াই তোমাদের বলিয়া রাখিতেছি যে, গৃহ ছাড়িয়া আশ্রমে আসিয়াছ বলিয়াই এই কথা মনে করিও না যে, তোমরা আমার অতিথি এবং তোমাদিগকে আতিথ্যদানই আমার পরম কর্ত্তব্য, পরন্তু এই আশ্রমের অন্তেবাসীরূপে আশ্রমের প্রতি বা জন-সাধারণের প্রতি তোমাদের কর্ত্তব্য কিছুই নাই; যেহেতু তোমরা মা-বাপ ছাড়িয়া আশ্রমে আসিয়াছ, সেই হেতুই ভাবিতে বসিও না যে, তোমাদের রোগে চূড়ান্ত সুচিকিৎসার দায়িত্ব আমার, কিন্তু আশ্রমের

প্রতি বা জন-সাধারণের প্রতি তোমাদের দায়িত্ব কিছুই নাই। তোমাদের ব্যক্তিত্বের সম্মান চিরকাল আমি করিয়াছি কিন্তু ব্যক্তিত্ববুদ্ধির একটা অতীব অস্বাস্থ্যকর মূর্ত্তি তোমাদের ভিতরে যেন ফুটিয়া উঠিতে চাহিতেছে। কাহার কোথায় কোন্ অসুবিধাটুকু হইল, কে অসুখের সময়ে দুই ফোঁটা দুধ কম পাইল, পরিবেশন-কালে পরিবেশনকারী কাহাকে কোন্ ব্যঞ্জনটী কম বা বেশী দিয়া ফেলিল, কোন্ কাজে কোন্ কর্ম্মী একটু বেশী খাটিল বা কম খাটিল, এই সকলের হিসাব লইতে তোমাদের মধ্যে যেন একটা অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি সৃষ্ট হইয়া উঠিতেছে। ইহা অতীব বিপজ্জনক। ইহা প্রতিষ্ঠানের ধ্বংসকেই শুধু আনয়ন করে। তোমাদিগকে যখন যে অন্ন জোগাড় করিয়া দিতেছি, তোমরা যেন তাহাতে সন্তুষ্ট নহ, 'আরো চাই, আরো দাও',—এই জাতীয় মনোভঙ্গীর যেন তোমরা অত্যধিক অনুশীলন করিতে সুরু করিয়াছ। এই সকল লক্ষণ কোনও সৎপ্রতিষ্ঠানেরই পক্ষে আশার সঞ্চারক নহে বরং আশঙ্কা-বর্দ্ধক। অহং মাথা চাড়া দিয়া উঠিলে, নানা নাম এবং নানা রূপের ভিতর দিয়া এই সকল অবাঞ্ছনীয় ভাব আত্ম-প্রকাশ করে। যে পার, দ্রুত অহংকে বিনাশ কর। যে না পার, তাহাকে প্রতিষ্ঠান ছাড়িতে হইবে। আর, দুইই যদি অসম্ভব হয়, প্রতিষ্ঠান উঠিয়া যাইবে। প্রতিষ্ঠান গড়িয়া জনসমাজের সেবা করিব, জনসমাজের নিকটে এমন কোনও নাকে খত আমি দেই নাই। তথাপি আমি সেবার চেষ্টা

করিতেছি। কিন্তু যদি প্রতিষ্ঠানের ভিতরে শিবের পূজার নাম করিয়া বানর-নাচন সুরু হয়, তাহা হইলে অকুণ্ঠিত চিত্তে বিনা দ্বিধায় আমি প্রতিষ্ঠান তুলিয়া দিব। তোমরা তোমাদের ভবিষ্যৎ ভাব। সকলে মিলিয়া ভাব, প্রত্যেকে একাকী ভাব, নিরহঙ্কার চিত্ত নিয়া জীবসেবার পবিত্র ব্রত উদ্‌যাপনের জন্যই এ প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করিবে, না ভাল ভাল বুলি ও ভাল ভাল ব্যাখ্যা দ্বারা অন্তরের সুপ্ত অহমিকা লুকাইয়া রাখিয়া কিছুদিন পরে পরে অহমিকার এক একটা খেলা সুরু করিয়া জীবন-জোড়া অশান্তি এবং অশুভের অনুশীলন করিবে? নিরহঙ্কার আত্ম-সমর্পণ ব্যতীত কোনও প্রতিষ্ঠানীরা শান্তি পায় না। অহং কলহ সৃষ্টি করিবেই করিবে। নিজেকে না আড়াল করিলে ভগবানের সৌম্য-সুন্দর প্রেমময় মূর্ত্তি কাহারও গোচরীভূত হয় না। নিজেকে যতই প্রধান করিবে, ভগবান্ তত দূরে সরিয়া যাইবেন। সেই শান্তি-স্বরূপ প্রেমদাতা একমাত্র প্রেমিকের হৃদয়েই আসিয়া থাকেন। অহং-বোধ-প্রবুদ্ধ অহং-মদ-প্রমত্ত মানব-রূপী দানবের চিত্ত-ক্ষেত্রে তিনি তাঁহার ভজনের মন্দির নির্ম্মিত হইতে বা সাধনের সিংহাসন রচিত হইতে দেন না। একথা বুঝিয়া, যাহার যত আছে উদ্দাম অহমিকা, সব নিয়া দামোদরের বালুকা-বিস্তারে গভীর গহবর খনন করিয়া সমাধি দাও। অহঙ্কারের পূর্ণ নিমজ্জনের ভিতর দিয়া পরিপূর্ণ শান্তির সুখময় স্বরাজ্য স্থাপিত হউক।

আত্মবলির কৌশল

"নিজেকে বলি দেওয়া সহজ কথা নহে। নিজেকে যতটা প্রিয় মনে কর, তাহা অপেক্ষা অধিক প্রিয় বলিয়া যদি জগতে কিছুই খুঁজিয়া না পাও, তবে আর নিজেকে বলি দিবে কি করিয়া? খুঁজিয়া দেখ, এজগতে তোমার নিজের অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় কি আছে বা কে আছে? এই অন্বেষণের কাজে সমগ্র মনকে এমন ভাবে লাগাইয়া দাও, যেন উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অন্য কোনও কাজে বা অন্য কোনও ব্যাপারে মন রুচি অনুভব না করে। নির্ব্বাসিত দেশপ্রেমিক গহন অরণ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াও যেমন দেশোদ্ধারের কল্পনা পরিহার করেন না, শ্বাপদকুলের মধ্যে বাস করিয়াই নিজের গৃহীত ব্রতের শেষ উদ্‌যাপনের প্রয়াসে উদ্যোগী হন, তদ্রূপ কর। আত্মবলিতেই জীবনের পূর্ণ সার্থকতা, আত্মপূজায় নহে। নিজেকে ভূপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত করিয়া দিয়া তোমার প্রাণ-প্রিয়তমের পূজাকে জগতে প্রতিষ্ঠিত কর। নিজের হস্তে নিজের মস্তক ছিন্ন করিয়া জীবন-দেবতার চরণে উপঢৌকন দাও। নিজেকে ডালে-মূলে উপাড়িয়া ফেল, জীবনের পরম-প্রভুকেই একমাত্র এবং অদ্বিতীয় রূপে বিরাজিত হইতে দাও। শক্তি জাগিবে ইহারই ভিতর দিয়া, শান্তিও আসিবে ইহারই ভিতর দিয়া। কূট ষড়যন্ত্র আর দলাদলি-প্রিয়তা, গোপন কৌশল আর জিদের মারামারি,—এ সকলের ভিতর

দিয়া শক্তি আসিবে না, শান্তিও আসিবে না। নীচ কার্য্যকে মহদুদ্দেশ্য বলিয়া বর্ণনা করতঃ যাহারা হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়, তাহাদের ঐক্য দুদিনের জন্য।"

শ্রীহট্ট

শনিবার, ২৭শে পৌষ, ১৩৪১

(১২ই জানুয়ারী, ১৯৩৫)

অদ্য অপরাহ্নে ষ্ট্যাণ্ডার্ড ঠিক চারি ঘটিকার সময়ে রাজা গিরিশ চন্দ্র হাইস্কুলের হলে বক্তৃতার আয়োজন হইয়াছে। ক্লাশগুলির মধ্যবর্ত্তী পার্টিশন খুলিয়া নিয়া স্থান সঙ্কুলানের ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু বিশ পঁচিশ মিনিট বক্তৃতার পরেই দেখা গেল যে, হলে আর তিল-ধারণের স্থান নাই, হলের বাহিরে বিশাল জনতা বক্তৃতা শ্রবণের জন্য এতই ব্যাকুল হইয়াছেন যে, এই দিন মাত্র এক ঘন্টা কাল বক্তৃতা দানের পরেই শ্রীশ্রীবাবামণি সভাভঙ্গ করিলেন।

শশাঙ্কমোহন রায়

বক্তৃতান্তে শ্রীযুক্ত দুর্গেশ্বর শর্ম্মার গৃহে ফিরিয়া আসিলে রহিমপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত শশাঙ্ক মোহন রায় বলিলেন,—স্বামীজীর নাম শুনেই শ্রীহট্টের লোক পাগলের মত হয়েছে। কালকের বক্তৃতা বাইরের মাঠেই কত্তে হবে। আমি আগেই হেডমাষ্টার মশায়কে বারংবার জেদাজেদি ক'রে বলছিলাম যে, আপনারা হলের ভিতরে যাবেন না, যাবেন না। কিন্তু

তাঁরা আমার কথা মোটেই আমলে আনলেন না। এখন দেখুন ত' আপনার কি মহিমা।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—মহিমা ত' বাবা আমার নয়, মহিমা হচ্ছে তোমার। লোকে অবশ্য শুনেছে যে কে একজন বক্তা নাকি বক্তৃতা দিবেন। কিন্তু লোককে সে কথা শুনাল কে? ঘরে ঘরে গিয়ে সে খবর দিল কে? গলিতে গলিতে সে বিজ্ঞাপন ছড়াল কে? এসব কি তুমিই কর নি? তোমার শ্রান্তিহীন ক্লান্তিহীন কুণ্ঠা-দ্বিধা-হীন পরিশ্রমের ফলে যা হ'ল, তার জন্য আমার মহিমাকে প্রশংসা করা ভুল।

ভক্ত ও ভগবান্

তারপরেই শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দেখ শশাঙ্ক, ভক্ত এবং ভগবান্ সম্পর্কেও ব্যাপারটা কতকটা এই রকম। ভক্তেরা ভগবান্‌কে প্রচার করেন। তাই ভক্তেরা সর্ব্বজীবের নমস্য। ভগবান্ তাঁর নিজ মহিমাতেই নিজে প্রচারিত হচ্ছেন এবং হ'তে পারেন, তবু ভক্তেরা তাঁকে প্রচার করাকেই জীবনের ব্রত ব'লে জ্ঞান ক'রে থাকেন। এই কাজে তাঁরা নিজেদিগকে এমন ভাবে নিয়োজিত করেন যে, নিজেদের ব্যক্তিগত সুখের বা হিতের চিন্তা করারও তাঁদের রুচি, শক্তি বা অবসর থাকে না। ভগবানের জন্য এই যে আত্ম-বিলোপ, তারই বলে তাঁরা জগতের অকল্পনীয় হিতসাধন ক'রে থাকেন। এই জন্যই কথায় বলে, 'ভগবানের চেয়ে ভক্ত বড়।'

শান্তির মূল

অতঃপর বক্তৃতাস্থল হইতে আগত আরও দুই একজন ভদ্রলোক আসিয়া আলোচনাতে যোগ দিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জীবনে যদি শান্তি কিছুতে থাকে, তবে তা' হচ্ছে অবিরাম ঈশ্বর-স্মরণে, ঈশ্বর-মননে, ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণে। নদী সমুদ্রের বুকে গিয়ে শান্তি পায়, শিশু মায়ের কোলে গিয়ে শান্তি পায়। ভগবানের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ এই প্রকারেরই। তিনি আমাদের পরম প্রেমের বিগ্রহ, তাঁর বুকে নিজেকে লুপ্ত ক'রে দিয়েই আমাদের অপার অসীম অনবদ্য শান্তি।

ভদ্রলোকেরা চলিয়া গেলে শ্রীশ্রীবাবামণি নিজ সান্ধ্য উপাসনা সমাপন করিলেন এবং আহারান্তে বিশ্রামরত হইলেন।

শ্রীহট্ট

রবিবার, ২৮শে পৌষ, ১৩৪১

(১৩ই জানুয়ারী, ১৯৩৫)

শেষ রাত্রে উঠিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি পত্র লিখিতে বসিলেন।

পাঠিকা-মণ্ডল

শ্রীশ্রীবাবামণি চট্টগ্রাম-নিবাসিনী তাঁহার জনৈকা শিষ্যাকে লিখিলেন,—

'পল্লীতে পল্লীতে পাঠিকা-মণ্ডল স্থাপন সম্পর্কে কি কোনও

চিন্তা করিয়াছ? সহরের মেয়েরা প্রায় সকলেই দ্বিপ্রহর-কালে অবসর থাকেন। স্বামী এবং পুত্রেরা উপার্জ্জনের জন্য বাহিরে থাকেন, মহিলারা খাওয়া দাওয়া সারিয়া গল্পে বসেন বা পড়িয়া ঘুমান। এই সময়টাকে কাজে আনিবার একটা ব্যবস্থার বিষয় ভাবিয়া দেখিবে কি? সপ্তাহে এক দিন করিয়া এক এক বাড়ীতে গিয়া নিজেদের হাতে একখানা করিয়া সদ্‌গ্রন্থ বিতরণ করিয়া আসিবে, পরের সপ্তাহে বহিখানা ফেরৎ আনিবে। গ্রন্থ দিয়া আসিবার কালে গ্রন্থের অংশ-বিশেষ হইতে দুই-দশ লাইন পাঠ করিয়া গৃহবাসিনীদিগকে গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় সম্পর্কে আগেই একটা ধারণ দিয়া রাখিতে হইবে এবং শুধু ধারণা দিতে পারিলেই কাজ হইল বলিয়া মনে করিলে চলিবে না, পরন্তু এমন ভাবে ধারণাটা দিতে হইবে যেন গ্রন্থখানা আদ্যোপান্ত পড়িয়া ফেলিবার জন্য গৃহবাসিনীদের একটা অকপট আগ্রহ জন্মিয়া যায়। পড়িবার নেশা একটা মস্ত নেশা, সিনেমা দেখা বা গাঁজা খাওয়ার নেশা অপেক্ষা ইহা বড় কম নহে, যদি চেষ্টা করিয়া যত্ন করিয়া নেশাটা একবার সৃষ্টি করিয়া লওয়া যায়। প্রথম প্রথম দেখিবে, মহিলারা যে বইই রাখেন, পড়েন না, সাতটা দিন তাকের উপরে অনাদরে পড়িয়া থাকিয়া বা বালিশের নীচে সমাদরে ঘুমাইয়া বহিখানার পরমায়ু কিছু কমে, আর কোনও লভ্যই ওঠে না, শুধু বাড়ী বাড়ী যাতায়াতের শ্রম আর পায়ের তলার চামড়ার ক্ষয় মাত্র হয়। কিন্তু তবু যাইতে

হয়, তবু সপ্তাহে সপ্তাহে বহি বদল করিয়া দিতে হয়, যে বহিখানা গত সপ্তাহে এই গৃহ ছাড়িয়া অন্য গৃহে গিয়াছে, তাহা সেখানে যাইয়া কিরূপ সমাদর, সম্বর্দ্ধনা ও প্রশংসা পাইয়াছে, তার ফিরিস্তি দাখিল করিতে হয়, আগ্রা সহরের ফেরীওয়ালা যেমন করিয়া নিজের আতরের সুগন্ধের গুণ শত কণ্ঠে সহস্র ঢংয়ের কীর্ত্তন করে, তেমন করিয়া গ্রন্থগুলির গুণপ্রশংসা করিতে হয় এবং এ ভাবে মাসের পর মাস বছরের পর বছর ধারাবাহিক চেষ্টার দ্বারা পাঠিকার মনকে আকৃষ্ট করিতে হয়। তারপরে একবার নেশা ধরিয়া গেলে আর চিন্তা নাই।

ব্যাপক চেষ্টার আবশ্যকতা কেন

"পুরুষদের মধ্যে জ্ঞান প্রচারের জন্য নানা পন্থাই ত' নানা জনে অবলম্বন করিতেছেন। মেয়েদের মধ্যে এই জাতীয় একটা চেষ্টা করিয়া দেখা সম্পর্কে কিরূপ ভাবিতেছ, জানাইও। ব্যাপকভাবে করিতে গেলে অর্থবল প্রয়োজন, একথা স্বীকার করি। আর অনেকগুলি সৎকাজই আছে, যাহা ব্যাপকভাবে না করিতে পারিলে ছিটা-ফোঁটা কাজের দ্বারা দেশের বিশেষ কিছু হিত হয় না। একই গ্রাম বা শহরকে ধরিয়া তাহার অন্ততঃ শতকরা পঁচাত্তর জন মহিলার কাছে তোমার এই সেবা যদি পৌছাইতে না পার, তাহা হইলে এ কাজে হাত দেওয়া একটা খেলা মাত্র হইবে। তুমি পঁচাত্তর

জনের কাছে পৌছিবার যে চেষ্টা করিবে, সমাজ-সংশ্রবের স্বাভাবিক ধর্ম্মে সেই চেষ্টার কথঞ্চিৎ ফল বাকী পঁচিশ জনের মধ্যে গিয়া নিজের স্পর্শ প্রদান করিবেই। কিন্তু যদি শতকরা মাত্র পাঁচ বা দশজনকে নিয়াই একাজ ধরিতে যাও, কোনও কারণে তোমার কর্ম্ম বন্ধ হইয়া যাইবার পরে ইহাদের মধ্যে এক জন কি দুই জনেও হয়ত সুফলটুকু নিজের মধ্যে বজায় রাখিতে সফল বা সযত্ন হইবে না। কাজ তোমার ক্ষুদ্র স্থানেই হউক, কিন্তু প্রায় প্রত্যেককে স্পর্শ করিয়া হউক। ইহাতে একের সংশ্রব অপরকে বলীয়ান্ করে, নতুবা একাকিত্বের পীড়নে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত সদ্বুদ্ধি দুদিন পরে মিলাইয়া যায়। যেমন ধর, কলেরার সূচীভেদ। পাড়ার সকল লোককে জোর করিয়া ধরিয়া যদি সূঁচ না চালাইতে পার, তবে মধ্য হইতে দুই চারি জনকে ইনজেক্শান দিয়া গেলে তাহা দ্বারা মহামারী নিবারিত হয় না। অজ্ঞানতার মহামারী চলিতেছে। আমরা বুঝিয়াও তাহা বুঝি না। কিন্তু বুঝিবার দিন সম্মুখে আসিতেছে এবং চখের জলে বুক ভাসাইয়া একদিন তাহা বুঝিতেও হইবে। কিন্তু চোর গেলে বুদ্ধি বাড়িবার চাইতে আগেই সতর্ক হওয়া ভাল। আমাদের অজ্ঞানতার সুযোগে পার্থিব সর্ব্বস্ব ইতিমধ্যেই দস্যুতে লুণ্ঠন করিয়াছে, কিন্তু অতি অদূর-ভবিষ্যতে ততোধিক শক্তিশালী দস্যু আমাদের আধ্যাত্মিক ভবিষ্যৎও হরণ করিয়া নিবে।

সুতরাং কাজ ধরিতে হইলে ধরার মতই ধরা সঙ্গত, কাছাঢিলা চেষ্টায় ফল অল্পই হইবে।"

উপযুক্ত সাহিত্যের অভাব

"অবশ্য, উপযুক্ত সাহিত্যের যে অভাব, একথা স্বীকার করিতেই হইবে। একদল শক্তিশালী সাহিত্যিককে লইয়া একটা সঙ্ঘ গঠন করিয়া একটী নির্দ্দিষ্ট আদর্শের অনুগত করিয়া আনুমানিক এক সহস্র গ্রন্থ প্রণয়নের প্রয়োজন আমি অনুভব করিতেছি। এই এক সহস্র গ্রন্থের ভিতরে জানিবার মত, বুঝিবার মত, শিখিবার মত জগতের সকল বিষয়ের সহজবোধ্য আলোচনা থাকিবে, একটা দীর্ঘ-পদানত দেশের নারীপুরুষের পক্ষে আসন্ন স্বাধীনতার প্রয়োজনে যাহা যাহা সঙ্গত ভাবে জানা প্রয়োজন, একটা আত্মচেতনাহীন, নির্ব্বীর্য্য জাতির আত্মশক্তির উদ্বোধনের জন্য যাহা যাহা শিখা প্রয়োজন, একটা ধর্ম্মচ্যুত, নীতিভ্রষ্ট, আদর্শ-বিভ্রান্ত, স্বার্থপর, পরানুকারী জাতির নিজ নিজ গরীয়ান্ অতীতের পরম সম্পদে সমৃদ্ধ হইবার জন্য যাহা যাহা প্রয়োজন, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার ভিতরে দেব-জীবন-যাপনের জন্য আধ্যাত্মিকতার প্রত্যক্ষ অনুশীলনের সৌকর্য্যার্থে যাহা যাহা প্রয়োজন, কুমার, কুমারী, সধবা, বিধবা, সভার্য্য, বিপত্নীক, উপার্জ্জনরত, অবসরপ্রাপ্ত সকল ব্যক্তির সর্ব্ববিধ-প্রয়োজনকে উল্লিখিত প্রয়োজন-সমূহের অধীন করিয়া একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ সাহিত্য-সম্ভারের বিশেষ

আবশ্যকতা আমি অনুভব করিতেছি। বর্ত্তমানে এক এক গ্রন্থকার এক এক উদ্দেশ্যে গ্রন্থ লিখিতেছেন। কে কি উদ্দেশ্যে লিখিতেছেন, তাহা বর্ণনা করিয়া পত্র দীর্ঘ করিব না। কিন্তু উদ্দেশ্যের এই বিভিন্নতার দরুণ ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ-কারের বহু গ্রন্থ পাঠ করিয়া পাঠকেরা পল্লবগ্রাহী মাত্র হইতেছেন। গ্রন্থ-রচয়িতাদের উদ্দেশ্যের একতানতা থাকিলে পল্লবগ্রাহিতার মধ্য দিয়াও একটা সরল মেরুদণ্ড গড়িয়া তুলিবার উপাদান পাঠকেরা পাইতেন। এই কথাটা আমি সর্ব্বদাই চিন্তা করিতেছি। গ্রন্থ অনেকই বাহির হইতেছে, কিন্তু জাতি-গঠনের উপযুক্ত বস্তু কোথায়? তবে, যদি পাঠিকা-মণ্ডল গঠনের কাজে হাত দিতে চাহ, তাহা হইলে বাজারে আপাততঃ কাজের যোগ্য বহি যে দু-দশ খানা পাওয়া যাইবে, তাহা কিনিয়া কাজ আরম্ভ করিতে হয়। মনে রাখিতে হইবে যে, গ্রন্থের সংখ্যা কম হইলে যত ক্ষতি, বাজে গ্রন্থ নির্ব্বাচিত হইলে, তাহা অপেক্ষা বেশী ক্ষতি।

নূতন দল গঠনে আপত্তি

"তুমি যেখানে আছ, সে স্থানে একদল যুবক সহরের পাঠিকাদের ভিতরে দেশের মনীষীদের নানাবিধ চিন্তা পরিবেশনের একটা চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া শুনিতেছি। ইহার পশ্চাতে তাঁহাদের সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য কি, তাহা আমি জানিতে সমর্থ হই নাই। কিন্তু একটী গ্রামে বা শহরে এই

জাতীয় কাজ করিবার জন্য একটী প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান থাকিলে তাহার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য আর একটী প্রতিষ্ঠান স্থাপনের আমি বিরোধী। প্রতিষ্ঠানসমূহের সুস্পষ্ট উদ্দেশ্যের মধ্যে কোনও গুরুতর পার্থক্য না থাকিলে দশের শক্তি মিলিয়া একটী প্রতিষ্ঠানকেই সাফল্য অর্জ্জনে সাহায্য করুক, ইহাই আমি কাম্য জ্ঞান করি। দশটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংবদ্ধ প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা একটী বৃহৎ এবং সুসংবদ্ধ প্রতিষ্ঠান দেশের বেশী সেবা করিতে পারে। এই কারণে নিত্য নূতন দলের আবির্ভাবকে আমি কখনও অভিনন্দনের দৃষ্টিতে দেখি নাই। তোমার কর্ম্মক্ষেত্রে যদি পাঠিকা-মণ্ডল জাতীয় অনুষ্ঠান চালু থাকিয়া থাকে, তবে নিজে সেই মণ্ডলভুক্তা হইয়া তাহার মধ্য দিয়াই যতটা কাজ করা যায়, সেই চেষ্টা করিবে। কিন্তু উক্ত প্রতিষ্ঠানের অব্যক্ত বা সুস্পষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ ভাল ভাবে না জানিয়া নিজেকে তাহার সহিত মিলাইয়া দিতে পার না।

সাহিত্যের সৃষ্টি

"কিন্তু আসল কথাই হইতেছে, উপযুক্ত সাহিত্যের সৃষ্টি। একই আদর্শে অনুপ্রাণিত একদল শক্তিশালী সাহিত্যিক কি করিলে আবির্ভূত হইবেন, এই বিষয়ে আমি বিগত বিংশ বর্ষের অধিক কাল প্রত্যক্ষ পরিশ্রম করিয়া আসিতেছি। অতি অল্পমাত্র সাহিত্যিক-আভাস কাহারও লেখনীতে দেখিলে সেই অপটু অক্ষম আতুর লেখনীর পশ্চাতে বৎসরের পর বৎসর

শ্রম ঢালিয়াছি বা ঢালিতেছি। কিন্তু নিজস্ব প্রতিভা কিছু না থাকিলে হাতুড়ী পিটিয়া সাহিত্যিক সৃষ্টি করা যায় না। হাতুড়ী পিটিয়া কোদাল, কুড়াল হয়। কতকগুলি শব্দ আর তার ঝঙ্কার শিখাইয়াও সাহিত্যিক সৃষ্টি করা যায় না। সাহিত্য শুধু ভাষার মধ্যেই নয়, সাহিত্য প্রাণের স্পন্দনে। প্রাণের তারে মরিচা ধরিয়া থাকিলে শুধু ভাষার কসরতে সাহিত্য-সৃষ্টি হয় না। ভাষা যে ভাবের বাহন মাত্র, একথা কয়জনকে বুঝাইতে পারিলাম? শব্দের টঙ্কারে কাহারও মর্ম্মভেদ হয় না, মর্ম্মভেদ করিবার জন্য সরল একাগ্র তীক্ষ্ণ ভাব চাই। ভাবের আড়ষ্টতা ইহাদের অধিকাংশের সাহিত্যিক সাধনাকে বিফল করিয়া দিতেছে। নিজেরাই যাহা স্পষ্ট করিয়া বোঝে না, অপরকে তাহা বুঝাইবার কালে অনর্থক বাগাড়ম্বর করিয়া পাঠকের সময় নষ্ট করা ছাড়া সাহিত্যিকের আর কি গতি আছে? আর, দুঃখ-বিধ্বস্ত দেশের অগণিত নরনারীকে দুঃখবিমুক্ত হইয়া একটী দিনের জন্যও সুখের হাসি হাসিবার সামর্থ্য সঞ্চয়ের দিকে অগ্রগামী করিয়া দিবার চেষ্টাও সত্যই কাহারও নাই। তোমার লেখা আবর্জ্জনাগুলি ছাপার হরফে বাহির হইল কি না, ইহাই যদি তোমার একমাত্র লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে সাহিত্য-সৃষ্টি হইবে কি করিয়া? কি তুমি বলিতে চাহ, সেই বিষয়ে যদি তোমার না থাকে সুস্পষ্ট প্রত্যয়, তবে এক কথা বলিতে আর এক কথাই বা কেন বলিয়া বসিবে না? ফলে, আমি এখনও

পর্য্যন্ত একটা সাহিত্যিকও গড়িতে পারি নাই, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এক এক জনের পিছনে অপরিসীম পরিশ্রম দিয়া যাইতেছি। কিন্তু পরহিততরে যদি অন্তরের কোনও অকপট প্রার্থনা থাকে, তবে তাহা ব্যর্থ হয় না। এই কারণেই আমি হতাশ হই নাই।

পূর্ণ মানবী

"নারী কুসুম-কোমলা, পেলবাঙ্গী, কবিকুলের কল্পনার আধার-স্বরূপা। এই জন্যই নারীকে কেবল নভেল পড়িতে হইবে, ইহা অতিশয় কুযুক্তি। কোমলে এবং কঠোরে, নারীর পরিপূর্ণ মূর্ত্তি। তার জীবন যেরূপ অনুধ্যানে পরিপূর্ণতা পায়, তাহাকে সাহিত্য পরিবেশন করিতে হইবে তদ্রূপ। ভারত অপূর্ণ মানবী চাহে না। ভারতের আজ প্রয়োজন শ্রীরাম-দয়িতা সীতার সহিত শিব-প্রণয়িণী শ্রীদুর্গার সমন্বয়। একথা ভুলিলে চলিবে না।"

জীবন শুধুই নয় হাহাকার

অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"হতাশ কেন হইবে? দুঃখের মধ্য হইতে সুখ-স্বরূপ পরমেশ্বরের প্রেমময় মুখখানা চিনিয়া লও।

"জীবন শুধুই নয় হাহাকার,
নয়রে শুধুই বন্দিশালা,

শ্রম ঢালিয়াছি বা ঢালিতেছি। কিন্তু নিজস্ব প্রতিভা কিছু না থাকিলে হাতুড়ী পিটিয়া সাহিত্যিক সৃষ্টি করা যায় না। হাতুড়ী পিটিয়া কোদাল, কুড়াল হয়। কতকগুলি শব্দ আর তার ঝঙ্কার শিখাইয়াও সাহিত্যিক সৃষ্টি করা যায় না। সাহিত্য শুধু ভাষার মধ্যেই নয়, সাহিত্য প্রাণের স্পন্দনে। প্রাণের তারে মরিচা ধরিয়া থাকিলে শুধু ভাষার কসরতে সাহিত্য-সৃষ্টি হয় না। ভাষা যে ভাবের বাহন মাত্র, একথা কয়জনকে বুঝাইতে পারিলাম? শব্দের টঙ্কারে কাহারও মর্ম্মভেদ হয় না, মর্ম্মভেদ করিবার জন্য সরল একাগ্র তীক্ষ্ণ ভাব চাই। ভাবের আড়ষ্টতা ইহাদের অধিকাংশের সাহিত্যিক সাধনাকে বিফল করিয়া দিতেছে। নিজেরাই যাহা স্পষ্ট করিয়া বোঝে না, অপরকে তাহা বুঝাইবার কালে অনর্থক বাগাড়ম্বর করিয়া পাঠকের সময় নষ্ট করা ছাড়া সাহিত্যিকের আর কি গতি আছে? আর, দুঃখ-বিধ্বস্ত দেশের অগণিত নরনারীকে দুঃখবিমুক্ত হইয়া একটী দিনের জন্যও সুখের হাসি হাসিবার সামর্থ্য সঞ্চয়ের দিকে অগ্রগামী করিয়া দিবার চেষ্টাও সত্যই কাহারও নাই। তোমার লেখা আবর্জ্জনাগুলি ছাপার হরফে বাহির হইল কি না, ইহাই যদি তোমার একমাত্র লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে সাহিত্য-সৃষ্টি হইবে কি করিয়া? কি তুমি বলিতে চাহ, সেই বিষয়ে যদি তোমার না থাকে সুস্পষ্ট প্রত্যয়, তবে এক কথা বলিতে আর এক কথাই বা কেন বলিয়া বসিবে না? ফলে, আমি এখনও

পর্য্যন্ত একটা সাহিত্যিকও গড়িতে পারি নাই, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এক এক জনের পিছনে অপরিসীম পরিশ্রম দিয়া যাইতেছি। কিন্তু পরহিততরে যদি অন্তরের কোনও অকপট প্রার্থনা থাকে, তবে তাহা ব্যর্থ হয় না। এই কারণেই আমি হতাশ হই নাই।

পূর্ণ মানবী

"নারী কুসুম-কোমলা, পেলবাঙ্গী, কবিকুলের কল্পনার আধার-স্বরূপা। এই জন্যই নারীকে কেবল নভেল পড়িতে হইবে, ইহা অতিশয় কুযুক্তি। কোমলে এবং কঠোরে, নারীর পরিপূর্ণ মূর্ত্তি। তার জীবন যেরূপ অনুধ্যানে পরিপূর্ণতা পায়, তাহাকে সাহিত্য পরিবেশন করিতে হইবে তদ্রূপ। ভারত অপূর্ণ মানবী চাহে না। ভারতের আজ প্রয়োজন শ্রীরাম-দয়িতা সীতার সহিত শিব-প্রণয়িণী শ্রীদুর্গার সমন্বয়। একথা ভুলিলে চলিবে না।"

জীবন শুধুই নয় হাহাকার

অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"হতাশ কেন হইবে? দুঃখের মধ্য হইতে সুখ-স্বরূপ পরমেশ্বরের প্রেমময় মুখখানা চিনিয়া লও।

"জীবন শুধুই নয় হাহাকার,
নয়রে শুধুই বন্দিশালা,

নয়রে শুধুই বিছার কামড়,
নয়রে শুধুই বিষের জ্বালা।।
"অকৃতজ্ঞ অবিশ্বাসীর
কাণ্ড দেখে হস্‌নে অধীর,
আপন জনার ভালোবাসা
নয় সকলি কাঁটার মালা।।
"মিথ্যা, অবিচারের পাছে
পরমপ্রভুর দয়াই আছে,
সকল অত্যাচারের মাঝে
তাঁর করুণাই হৃদয়-ঢালা।।

"মানুষ যে অন্যায় করিয়াছে, তাহার ফলাফল লইয়া তাহাকে থাকিতে দাও। তুমি তোমার সমগ্র মনকে মানুষের উপর হইতে তুলিয়া লও, তাহাকে তোমার হৃদয়-দেবতার চরণে সমর্পণ কর।

"অত্যাচার ও অপমানে জর্জ্জরিত হইয়া বহু দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়াছ। এখন সে সব ভুলিয়া যাও। একমাত্র পরমেশ্বরকে সম্বল কর। তাহাকে লইয়াই তোমার চিত্তের সকল ভাবের আদান-প্রদান হউক। জগতের আর কাহারো নিকটে তোমার কোনও পাওনা বা দেনা আছে, ইহা বিস্মৃত হও। দেনা-পাওনা একমাত্র তাঁহার সঙ্গে।

"তাঁহার সঙ্গে পূর্ণ সম্বন্ধ স্থাপন কর। জগতে অন্য

কিছুর সহিত যদি কোনও সম্বন্ধ তোমার হয়, হউক তাহা এই নিত্যসম্বন্ধের অধীন হইয়া। ভগবানকে আপন না ভাবিয়া এই জগৎকে যে আপন ভাবে, সেই ত' নাস্তিক! জীবন তাহার পক্ষেই হাহাকার,—তোমার পক্ষে নহে।

"তাঁহার চরণে বিশ্বাস স্থাপন কর, জীবনের বিষ অমৃতে রূপান্তরিত হইবে, ক্রূর ভুজঙ্গম নির্বিষ হইবে, প্রকৃত তৃপ্তি, প্রকৃত আনন্দ তোমার আনন ছাইয়া ফেলিবে।

"অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু চির-বিশ্বসিত সুহৃৎ তোমাকে পিছন হইতে ছুরিকার আঘাত করিয়াছে ত'? ম্রিয়মাণ হইও না। আসল বন্ধু যে কে, তাহা চিনিতে পার নাই, তাই ইহা হইয়াছে। ভগবান্ তোমাকে তাঁহার স্নেহের কোলে টানিয়া নিবার জন্য কৃত্রিম বন্ধুর অসারতা প্রদর্শন করিলেন মাত্র। তিনি তোমাকে তাঁহার নিজের বুকে ধরিতে চাহেন। এই সময়ে তুমি আগুয়ান হইয়া ছুটিয়া তাঁহার সম্মুখে যাও। লাজে, কুণ্ঠায়, সঙ্কোচে, দুর্ব্বলতায়, সংশয়ে, অসরলতায় এই সময়ে তুমি পিছনে ফিরিয়া থাকিও না।

"দুঃখ ও অসম্মান কেবলই দুর্য্যোগ নহে। ইহা জীবনের সুযোগ। বহির্ম্মুখ মনকে অন্তর্ম্মুখ করিয়া লইবার ইহা অমোঘ আদেশ-বাণী। আদেশ আসিয়া গিয়াছে, এখন তাহা পালন কর। আদেশ যে তিনি পাঠাইয়াছেন, এজন্য কৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ ধন্যপ্রশস্তি জানাও।"

কিঙ্কর্ত্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় নামের সেবা

অপর এক ভক্তের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"চতুর্দ্দিকের অপ্রত্যাশিত চাপে কিঙ্কর্ত্তব্যবিমূঢ় অবস্থা আসিলে কর্ত্তব্য নির্ণয়ের চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়া পরমমঙ্গলময় নামে লাগিয়া যাইবে। শ্বাসে-প্রশ্বাসে অবিরাম নাম করিতে থাকিবে এবং অভিসন্ধিবর্জ্জিত বুদ্ধিতে প্রত্যেকটী নামোচ্চারণের সহিত পরমেশ্বরের সুনিশ্চিত উপস্থিতি চিন্তা করিবে। শ্বাস-বায়ু তোমার অন্তরের সেই অবিমিশ্র আধ্যাত্মিক ভাবের বাহন হইয়া তোমার ও পরমেশ্বরের মধ্যে দৌত্য-কার্য্য যেন সম্পাদন করিতে রত হইতে বাধ্য হয়। সমস্যার সমাধানও চাহিও না, সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত মন লইয়া নামে লাগিয়া থাকিও। দেখিবে, কিছুকাল পরে রাহু-গ্রাস-মুক্ত পূর্ণ-চন্দ্রমার ন্যায় সমস্যার সমাধান আপনি সমুদিত হইবে। শ্বাস ও প্রশ্বাসকে নামের সেবায় নিয়োজিত করিলে যে কি আশ্চর্য্য ভাবে আকাশের মেঘমালা কাটিয়া যায়, তাহা দেখিয়া চমৎকৃত হইবে।"

চরিত্র ও প্রতিভা

অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তোমার ব্যক্তিগত প্রতিভার সহিত যখন চরিত্রের মহত্ত্ব সংযোজিত হইবে, তখন তুমি জগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অপরাজেয়। পৃথক্ ভাবে চরিত্রের মহত্ত্ব এবং অসামান্য প্রতিভা অনেক ব্যক্তির মধ্যেই পরিদৃষ্ট হইলেও এই দুইটীর যুগপৎ সমাবেশ একই পাত্রের ভিতরে অতি অল্পই দেখা যায়। ভগবদ্দত্ত প্রতিভার কিঞ্চিৎ স্ফুরণ যদি নিজের মধ্যে উপলব্ধি করিয়া থাক, তাহা হইলে অবিলম্বে তুমি নিজেকে লইয়া সাবধান হও। প্রতিভা তোমার এক মূল্যবান্ মূলধন। ইহাকে অনুশীলনের দ্বারা যত ইচ্ছা বর্দ্ধিত কর না কেন, রক্ষা করিতে হইবে চারিত্রিক মহত্ত্বের লৌহ-সিন্ধুকে। প্রতিভাবান্ ব্যক্তিদের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা সাধারণতঃ অত্যধিক দেখা যায়। জাজ্জ্বল্যমান প্রতিভার ভাস্বর দীপ্তির সমক্ষে মানুষের চক্ষু হঠাৎ ঝল্‌সিয়া গেলেও মস্তক তাহাদের অবনত হয় না। মস্তক নত হয় চরিত্রের কাছে! অনবদ্য চরিত্র, অকলঙ্ক জীবন, অপযশ-লেশ-বর্জ্জিত আচরণ, সর্ব্বজীবে-সমদর্শিতা-প্রেরিত উদ্যম এবং সর্ব্বভূতে পরমাত্মার উপস্থিতি-বুদ্ধি-যুক্ত প্রসন্ন দৃষ্টি,—ইহারা পরম গৌরব। প্রতিভা যখন এই গৌরবের সহকৃত হয়, তখন জগতে তাহার সমাদরেরও তুলনা নাই, প্রভাবেরও তুলনা নাই।

কালিদাস ও বাল্মীকি

"ক্ষুদ্র একটী বালকের ভিতরেও অতি সামান্য একটু

প্রতিভার প্রকাশ লক্ষ্য করিলে আমি তাহার প্রতি অত্যধিক আকৃষ্ট হইয়া পড়ি। আমার অন্তরে তখন একমাত্র প্রার্থনা ইহাই জাগিতে থাকে যে, এই শিশুর প্রতিভা বিশ্বপ্রসারিণী হউক, পরন্তু জীবনের কর্ম্মমহত্ত্ব, ধর্ম্মমহত্ত্ব, শান্তি, ক্ষান্তি ও স্বস্তির মধ্য দিয়া তাহার বিশ্বব্যাপী বিস্তার যেন হয়, একটা খালে ডুবিয়া, একটা ডোবায় মজিয়া, একটা পঙ্কময় কূপে পড়িয়া ইহা যেন অপপ্রযুক্ত না হয়। বাল্মীকিও কবি, কালিদাসও কবি, কিন্তু একজনের জীবন ঋষির জীবন, অপরের জীবন সামান্য নাগরিকের জীবন। দুই মহাকবির জীবনের পার্থক্যে তাঁহাদের কাব্যের প্রভাবেও পার্থক্য সৃষ্ট হইয়াছে। কবি কালিদাসের মোহন-বংশীধ্বনিতে চিত্তের কোমল কল্পনার যমুনা-জলে বান ডাকিয়াছে, আর কবি গুরু বাল্মীকির মধুর সঙ্গীত রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, ভরত, হনুমান ও সীতার আদর্শে মানুষের আমূল পরিবর্ত্তন আনিয়াছে। তোমরা কালিদাস হইও না, বাল্মীকি হও।

বুদ্ধ ও যীশু

"বুদ্ধ ও যীশু কাব্য লিখিয়া যান নাই। তবু তাঁহাদিগকে জগতের লোক প্রতিভা-বর্জ্জিত বলিয়া অভিহিত করিতে সাহস পাইবে না। তাঁহাদের জীবন কত শত সহস্র প্রতিভাবানের জীবনের পরমরসায়ন ও জীবনের একমাত্র উপজীব্য হইয়া রহিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দ

"বাংলার দুই মহামনীষী প্রতিভার দীপ্তিতে জগৎ আলোকিত করিয়াছেন। একজন রবীন্দ্রনাথ, অপর জন শ্রীঅরবিন্দ। প্রতিভার হিসাবে এই দুই জনের মধ্যে কে বড়, ইহা নিয়া তর্ক চলে না। ইহাদের একজনের অপেক্ষা অপর জনকে কম প্রতিভাবান্ বলিতে বোধ হয় কেহই সাহস করিবে না। কিন্তু উভয়েই ঋষি বলিয়া সহস্র সহস্র ভক্তের দ্বারা অর্চ্চিত হইলেও ব্যক্তি হিসাবে কে বড় আর কে ছোট, এই বিষয়ে প্রত্যেকেই একটা না একটা মত প্রকাশ করিতে সমর্থ। সেই মতামতের নির্ণায়ক হইতেছে দুই জনের দুই পৃথক্ ধারার জীবন।"

স্বভাবের ধর্ম্ম

অত্যধিক কার্য্যব্যস্ততা-নিবন্ধন অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি কাহারও সহিত সাক্ষাতে একেবারেই অভিলাষী ছিলেন না। কিন্তু বেলা আট ঘটিকার সময়ে শ্রীহট্ট সহরের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রীশ্রীবাবামণির চরণ-দর্শনে আসিলেন। তন্মধ্যে দুই তিন জন সরকারী উপাধিধারী ব্যক্তি।

একজন বলিলেন,—কল্যকার আপনার বক্তৃতা এতই মধুর হয়েছে যে, আমরা ঠিক্ করেছি, আজ যেখানে যাকে দেখ্‌তে পাব, তাকেই ধ'রে সভাস্থলে নিয়ে যাব।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—দার্শনিক মার্টিন্যুকে নাকি কে একজন ব'লেছিলেন যে, আইন ক'রে প্রত্যেক লোককে রবিবাসরীয় উপাসনার জন্য ভজনালয়ে যেতে বাধ্য করা উচিত। তাতে নাকি মার্টিন্যু বলেছিলেন,—বাধ্যকর ধর্ম্ম ধর্ম্মই নয়। জোর ক'রে যদি মানুষ নিতে থাকেন, তাহা হ'লে ওটা আর সভাস্থল থাক্‌বে না, হবে অন্য কিছু।

অপর জনৈক সজ্জন বলিলেন,—কেন, মানুষ স্বভাবের ধর্ম্মেই যে যাবে।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—স্বভাবের ধর্ম্মই প্রকৃত ধর্ম্ম। নিজের অন্তরের সহজাত আকর্ষণে যে ধর্ম্মাচরণ, তাই প্রকৃত ধর্ম্ম-সাধনা।

অপর একজন প্রশ্ন করিলেন,—জোর ক'রে কি কিছুই শিক্ষা দিতে হয় না?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—হয়, কিন্তু তারও উদ্দেশ্য স্বভাবের সহজাত ধর্ম্মকে জাগিয়ে তোলাই।

ধূলির মর্য্যাদা

অপরাহ্ণ চারি ঘটিকায় রাজা গিরিশ হাইস্কুলের দ্বিতীয় সভার অধিবেশন হইল। অদ্য আর হলে সভা নহে, মাঠের মধ্যে সভা সুরু হইল। প্রচুর জনতা হইয়াছে। স্ত্রী-পুরুষে, যুবক-বৃদ্ধে মাঠ ভরিয়া গিয়াছে। স্কুলের ক্লাশ হইতে যতগুলি সম্ভব বেঞ্চি আনিয়া বাহিরে দেওয়া হইয়াছে এবং যাহারা

আগে আসিয়াছেন, তাঁহারাই সেইগুলি অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন। অপরেরা দাঁড়াইয়া। মাটীতে তৃণের উপরে বসিতে সকলেই কুণ্ঠা বোধ করিতেছেন।

ঠিক্ ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় সভাস্থলে উপনীত হইয়া শ্রীশ্রীবাবামণি এই দৃশ্য দেখিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই বক্তৃতারম্ভ হইল। প্রথমেই শ্রীশ্রীবাবামণি যুবকগণকে বেঞ্চি ছাড়িয়া দিয়া মাটিতে আসিয়া বসিতে অনুরোধ করিলেন।

কিন্তু এই অনুরোধ রক্ষা করিবার আগ্রহ কাহারও মধ্যে দেখা গেল না।

বাগ্মীর কণ্ঠ যেন ভৈরব-গর্জ্জনে গর্জ্জিয়া উঠিল। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—শ্রীহট্টের অধিবাসীরা শ্রীগৌরাঙ্গের দেশের লোক। শ্রীভূমির এটী পরম গৌরব যে, এই দেশের এক পরমপুণ্যবান্ জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। যে শ্রীগৌরাঙ্গ হরিনামের পবিত্র আলোড়নে পথের ধূলিকে স্বর্ণরেণুর চেয়ে অধিক মর্য্যাদা দান করেছিলেন, আজ সেই শ্রীগৌরাঙ্গের সগোত্রেরা মাটিতে বস্‌তে দ্বিধা কচ্ছ?

নিমেষের মধ্যে সকলের দ্বিধা দূর হইয়া গেল। প্রতিষ্ঠাবান্ সম্মানী ব্যক্তি অপ্রতিষ্ঠ মানহীন ব্যক্তির পাশে, কে কার আগে মাটিতে বসিতে পারেন ভাবিয়া, ব্যস্ততার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে করিতে ধূলি-আসনে উপবেশন করিলেন। এই অপূর্ব্ব

দৃশ্য দেখিয়া পুলকিত অন্তঃকরণে শ্রীশ্রীবাবামণি তাঁহার মূল বক্তব্য বিষয় ধরিলেন।

দুঃখের বিষয়, অপরাপর বহু স্থানের বক্তৃতাসমূহের ন্যায় শ্রীহট্টেরও অধিকাংশ বক্তৃতারই কোনও সারাংশ পাওয়া যায় নাই। একটা জাতি ধীরে ধীরে নিজের ভিতরে চারিত্রিক এবং প্রতিভার সম্পদ বাড়াইতে বাড়াইতে দুই এক শতাব্দী পরে কি করিয়া জগতের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় হইতে পারে, ইহাই অদ্যকার বক্তব্য বিষয় ছিল।

গভীর নিঃস্তব্ধতার মধ্যে পূর্ণ আড়াই ঘণ্টা বক্তৃতার পরে শ্রীশ্রীবাবামণি সভাভঙ্গ করিলেন।

শ্রীহট্ট

সোমবার, ২৯শে পৌষ, ১৩৪১

(১৪ই জানুয়ারী, ১৯৩৫)

প্রাতে আট ঘটিকায় বহু জিজ্ঞাসু ব্যক্তি নানা উপদেশের প্রত্যাশায় সমবেত হইয়াছেন।

পুত্র-মাংসভোজী রাজার গল্প

একজন প্রশ্ন করিলেন,—সংসারের প্রতি বৈরাগ্য আসার উপায় কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এক রাজা অত্যন্ত মাংস-প্রিয় ছিলেন। মাংস ছাড়া তাঁর আহারই হ'ত না। তাঁর অনেক দাস-দাসী ছিল এবং প্রত্যেক দাস-দাসীর উপরেই ভার থাক্‌ত

নিত্য নূতন ধরণের মাংস পরিবেশন কর্ব্বার। দাস-দাসীরা নিজ নিজ প্রাণ রক্ষার ভয়ে সমগ্র রাজ্যময় ঘুরে বেড়াত যে, কোথায় কোন্ নূতন ধরণের মাংস পাওয়া যায়। রাজ্য-জোড়া হাঁস, কবুতর, ছাগল, ভেড়া, হরিণ-শিশু আর শশক সব শেষ হ'য়ে গেল, তবু রাজার মাংস-পিপাসা মেটে না। একদিন দাসেরা পরস্পরের মধ্যে ষড়যন্ত্র ক'রে এক কাণ্ড কর্‌ল। সোণার থালায় সাজিয়ে কতগুলি অতিশয় কচি মাংসপিণ্ড নিয়ে এসে রাজাকে বল্ল,—"মহারাজ আজ এমন জিনিষ এনেছি, যা' জীবনে কখনো খান নি।" রাজা বল্লেন,—"কিসের মাংস বল ত?" দাসেরা বল্ল,—"মহারাজ, আগে খেয়ে দেখুন, কেমন জিনিষ,—নাম পরে বল্‌ব।" রাজা ত' নূতন জিনিষ আস্বাদন কর্ব্বেন মনে ক'রে লোভে লোভে কালহরণ কত্তে লাগ্‌লেন। মাংস রান্না হ'য়ে গেলে যখন পরিবেশন হ'তে লাগ্‌ল, তখন রাজা সেই সুস্বাদু মাংস খেয়ে এতই তারিফ কত্তে লাগ্‌লেন যে, বল্‌বার নয়। রাজা যতই প্রশাংসা করেন, পরিবেশকরা আরো তত বেশী বেশী ক'রে দেন। যখন আকণ্ঠ পূর্ণ ক'রে ভোজন সমাপ্ত হয়েছে, তখন রাজা জিজ্ঞাসা কর্ল্লেন,—"ওহে সূপকার, এই পরমসুস্বাদু মাংস কিসের?" সূপকার বল্লেন,—"মহারাজ, এই মাংস আপনার একমাত্র বালক-পুত্র যুবরাজের। দুনিয়ার সকলের পুত্রদের মাংস খেয়েও যখন আপনার মাংস-পিপাসা মিটে না

দেখ্ছি তখন আর উপায়ান্তর না দেখে বালক যুবরাজকে নিভৃত স্থানে ডেকে নিয়ে আমরা হত্যা করেছি, তার শরীরের চামড়া তুলে নিয়ে সেই কচি মাংস আপনাকে প্রদর্শন ক'রে আপনার লোভ-প্রবর্দ্ধন করেছি এবং তারপর অতিশয় যত্ন পূর্ব্বক নানা মশলা-সহযোগে উত্তমরূপে রন্ধন করেছি। নিজের চাইতে প্রিয় ত' জগতে কিছু নেই মহারাজ! এই জন্যই নিজ পুত্রের মাংস আপনার এত সুস্বাদু জ্ঞান হয়েছে।" এ কথা শুনেই রাজা শোকে অধীর হ'য়ে উঠ্লেন, কখনো ক্রুদ্ধ হ'য়ে যান দাসীদের হত্যা কত্তে, কখনো রাগের মাথায় নিজের চুল ছেঁড়েন, দাড়ি ছেঁড়েন, কখনো দরবিগলিত-ধারে কেবলি অশ্রু-বিসর্জ্জন করেন। এমন সময়ে রাণী এলেন খাবার-ঘরে। রাণী বল্লেন,—"মহারাজ, আপনি উন্মাদ-রোগীর মতন এমন অপ্রকৃতিস্থ হয়েছেন কেন"? রাজা বল্লেন,—"রাণী, আমার কদর্য্য মাংস-সেবন-লালসা আজ আমাকে দিয়ে স্বপুত্র-মাংস ভক্ষণ করিয়ে নিলে।" রাণী বল্লেন, —"স্বপুত্র-মাংসের মানে?" রাজা বল্লেন,—"আমার মাংস-ভক্ষণের স্পৃহা এমনই মাত্রা ছাড়িয়েছিল যে, দাস-দাসীরা ষড়যন্ত্র ক'রে আমার একমাত্র নয়নের মণিকে হত্যা ক'রে তার মাংস রেঁধে আমাকে খাইয়েছে।" রাণী হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"মহারাজ, এ যে আপনার দারুণ ভ্রম। এই যে আমি ফুল-বাগানে ছেলের সঙ্গে এতক্ষণ ধ'রে খেলা কচ্ছিলাম।" এই কথা ব'লেই

রাণী পুস্পোদ্যানের দিকে ছুট্লেন। আর রাজা,—"কৈ আমার পুত্র, কৈ আমার জীবন"—বল্তে বল্তে রাণীর পশ্চাদ্ধাবন কর্ল্লেন। রাজপুত্র নিবিষ্ট মনে গোলাপ ফুলের তোড়া আর মল্লিকা-ফুলের মালা গাঁথছিলেন, রাজা গিয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে কাঁদতে লাগ্লেন এবং প্রতিজ্ঞা কর্ল্লেন যে-আর জীবনে মাংস খাবেন না। পরমাংস-ভক্ষণে রসনার সুখ আছে সত্য, কিন্তু তার ফলে নিজ পুত্রের মাংস-ভক্ষণও আশ্চর্য্য নয় জেনে মাংসের প্রতি রাজার বৈরাগ্য এল।

বৈরাগ্য আসার উপায়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—গল্পের রাজা যেমন মাংস ভালবাস্তেন, এই সংসারে আমরাও তেমন বহু জিনিষ ভালবাসি। আমাদের আসক্তির জিনিষের অন্ত নেই। জগতের সবগুলি বস্তুকে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির সুখসম্পাদনের জন্য কি ক'রে ব্যবহার করা যায়, সেই দিকেই আমাদের প্রখর লক্ষ্য। কিন্তু ইন্দ্রিয়াসক্তির প্ররোচনায় অন্ধ হ'য়ে নিজেদের সবচেয়ে বড় সুখকে যে বলি দিচ্ছি, সবচেয়ে প্রিয় সুখ থেকে যে বঞ্চিত হচ্ছি, সবচেয়ে বেশী প্রার্থনীয় বস্তুকে নিজের হাতে নষ্ট কচ্ছি, ধ্বংস কচ্ছি, এই খেয়াল এলেই আসক্তি দূর হয়, বৈরাগ্য আসে।

প্রশ্ন।—এই খেয়াল আনবার উপায় কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—সাধুসঙ্গ, মহজ্জীবন অধ্যয়ন ও ভগবচ্চরণে নিরন্তর কৃপাপ্রার্থনা।

জীবন-নাট্যশালা

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জীবনকে নাট্যের সহিত তুলনা করা হয়েছে ত'? বাস্তবিকই জীবনটা একটা নাটক। নাট্যের অভিনেতাকে যেমন যে ভূমিকায় অভিনয় কত্তে দেওয়া হয়েছে, সেই ভূমিকাই নিখুঁত ভাবে তাকে অভিনয় কত্তে হবে, আমাদের জীবনও জান্‌বে তাই। কেউ রাজা সেজে, কেউ প্রজা সেজে, কেউ পিতা সেজে, কেউ পুত্র সেজে, কেউ গুরু সেজে, কেউ শিষ্য সেজে অভিনয় ক'রে যাচ্ছি। কিন্তু অভিনয় নিখুঁত হওয়া চাই। পরন্তু এ জীবন যে শুধু অভিনয় মাত্র, পিছন থেকে সূত্রধরই যে প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদিগকে চালাচ্ছেন, তাঁর ইচ্ছার ইঙ্গিতেই যে আমাদের চল্‌তে হবে, একথাও মনে রাখ্‌তে হবে। আমাদের স্বাধীনতা শুধু অভিনয়-মঞ্চের উপরে।

প্রভুর অভিনয়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জীবন-নাট্য-শালায় ভৃত্যের অভিনয়ও অভিনয়, প্রভুর অভিনয়ও অভিনয়। শাসনের ভয়ে বা চাবুকের চোটে ভৃত্যের অভিনয়টা আমরা প্রায় সকলে ভালই করি কিন্তু প্রভুরূপে যদি অভিনয় কত্তে হয়, তাহ'লে

আমরা প্রায় সকলেই মাত্রাজ্ঞান হারিয়ে ফেলি। ভুলে যাই, এ প্রভুত্ব দুদিনের। এমন প্রভু আমরা হ'তে পারি নাই, যাতে ভৃত্যের অভিনয়কারী-মানবমানবী, পশু বা পক্ষীগুলি অন্তরে অন্তরে অনুভব কত্তে পারে যে, আমাদের ভিতর দিয়ে সেই পরমপ্রভুরই স্নেহের পরশ তারা পাচ্ছে, আমাদের সেবা ক'রে সেই পরমপ্রভুকেই তারা সেবা যোগাচ্ছে। এইখানেই আমাদের অভিনয়ের এক বিরাট ব্যর্থতা। মনিব শুধু মনিবই নয়, সে পিতাও বটে। ভৃত্যের উপরে মনিবের যেমন দাবী খাটে, পুত্রের প্রতি পিতার তেমন স্নেহের কর্ত্তব্য রয়েছে। অহংবুদ্ধির ভ্রান্তিদোষে সে কথা আমরা ভুলে যাই।

জাগতিক কর্ত্তৃত্ব ও ভগবদ্দাসত্ব

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভগবচ্চরণের নিত্য-দাস হও, দেখ্‌বে তোমার প্রভুর অভিনয় চমৎকার উত্‌রে যাচ্ছে। দেখ্‌বে তখন আর অভিনয়ে কোথাও এক কণা খুঁত খুঁজে পাওয়া যাবে না। ভগবচ্চরণের দাস হও, জগতের সকল সেবকেরা তোমার ভিতর দিয়ে ভগবৎ-সেবার পথ পেয়েছে দেখে তৃপ্ত হবে, কৃতকৃত্য হবে, কৃতার্থম্মন্য হবে। এই অনিত্য জগতের অভিনয়কেও সার্থক কত্তে হ'লে নিত্য-প্রভুর শরণাপন্ন হ'তে হবে। তোমার দর্প, দম্ভ, অহমিকাকে তাঁর ইচ্ছার দাস কর, তোমার শাসন, শোষণ, রক্তচক্ষুকে তাঁর দৃষ্টির অধীন কর, নিজেকে ষোল আনা তাঁর স্নেহের

তত্ত্বাবধানে ছেড়ে দিয়ে জগতের যত কর্ত্তালি আর সর্দ্দারী ক'রে বেড়াও, দেখ্‌বে, শত জটিল শত কুটিল কর্ম্মগ্রন্থির মাঝে প'ড়েও তুমি কোনো প্রকারেই বাঁধা পড় না, তুমি নির্ভয়, তুমি নিরঙ্কুশ, তুমি নির্ব্বিবাদ। মানুষ, পশু, পক্ষী বা অপরাপর জীবজন্তু সকলের উপরে বিজ্ঞান তোমাকে প্রভুত্ব দিয়েছে বটে কিন্তু তুমি যে অনুক্ষণ ভগবানেরই দাস, এই সত্যের উপরে যতক্ষণ না দাঁড়াতে পাচ্ছ, ততক্ষণ তুমি ত' তোমার দাসদেরই দাস—প্রভু বা মনিব তুমি কারো নও।

জীবনের শেষ দিন

অপর প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মৃত্যু যে কোনো দিন হ'তে পারে, যে কোনও মুহূর্ত্তে হ'তে পারে। মৃত্যু তোমার ইচ্ছার অধীন নয়। তুমি তোমার ভিটার দালান গেঁথে শেষ কত্তে পার নি ব'লে মৃত্যু দাঁড়িয়ে থাক্‌বে না। তুমি তোমার পাওনা গণ্ডা পূরাপূরি আদায় কত্তে পারনি ব'লে মৃত্যু তজ্জন্য অপেক্ষা কর্ব্বে না। তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় নি ব'লে সে তোমাকে সময় দেবে না। তোমার পুণ্যের পরিধি প্রার্থনানুযায়ী বিস্তারিত হয় নি ব'লে সে তোমাকে নূতন মেয়াদ দেবে না। তার সময়মত সে এসে যাবে এবং তোমার প্রাণ হরণ কর্ব্বে। সুতরাং প্রত্যেকটা দিনকেই তোমার মৃত্যুর দিন জ্ঞান ক'রে প্রস্তুত থাক। এমন ভাবে প্রস্তুত থাক যেন, যে-কোনও সময়ে ম'রে গেলেও

অন্তরে আফশোষ না থাকে। আরও কিছুকাল বেঁচে থাক্‌ব, জনহিত কর্ব্ব, আত্মোৎকর্ষ কর্ব্ব, ভগবৎ-সাধনা কর্ব্ব, এরূপ আকাঙ্ক্ষা থাকা দোষের নয়। বরং এখনি ম'রে যাব, বেঁচে থেকে আর লাভ কি, যে-কোনো উপায়ে দ্রুত মর্‌তে পারলেই বাঁচি,—এই জাতীয় মনোভাব থাকা দোষের। দীর্ঘায়ু প্রার্থনায় দোষ নেই, কেননা আয়ু পেলে আত্ম-সংশোধন, আত্মোৎকর্ষ সাধন এবং ভগবৎ-প্রীতি সম্পাদনের জন্য অবসর ও সুযোগ পাওয়া যাবে। সুতরাং দীর্ঘায়ু প্রার্থনায় বরং গুণ আছে। কিন্তু তবু জেনে রাখ্‌তে হবে, জীবন নশ্বর, অচিরস্থায়ী, ক্ষণভঙ্গুর এবং একান্তই অনিশ্চিত। এমন জীবন যাপন কর, যেন আজই যদি ম'রে যাও, তবু তোমার জীবনকে অপূর্ণ ব'লে মনে করার কারণ না থাকে। এমন জীবন-যাপন কর যেন প্রত্যেকটা দিনই যে তোমার শেষ দিন, এই কথাটা ভাবতে অনুতাপ, বেদনা, শঙ্কা বা অস্বস্তি না আসে, যে-কোনও মুহূর্ত্তে অক্লেশে মৃত্যুকে বরণ কত্তে যেন দ্বিধা না আসে।

কে জানে ভাই চখ্‌ বুজিবার

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি স্বরচিত একটী সঙ্গীত আবৃত্তি করিলেন,—

কে জানে ভাই চ'খ বুজিবার
দিন্‌টী আজই কিনা।

হয়ত রে আজ বিদায়-বাজন
বাজ্‌বে জীবন-বীণা।
হয়ত রে তোর সুখের মেলা
ভাঙ্গবে আজই সাঁঝের বেলা,
হবে পরমায়ুর ভেলা
সাগর-জলে লীনা।

এতকালের গানের রেশ
হয়ত আজই হবে শেষ,
কোন্ সাহসে থাক্‌বি প্রভুর
চরণ-তরী বিনা,
দুঃসাহসী লতার মত
আশ্রয়-বিহীনা?

মৃত্যু ও নিশ্চিন্ত নির্ভর

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রচণ্ড ঝড় উঠেছে কিন্তু লতা বৃক্ষকে আশ্রয় করে নি। তার অবস্থা কেমন চিন্তা ক'রে দেখ। মানুষ তুমি নগণ্য হ'তে পার কিন্তু ভগবানকে আশ্রয় কর্ল্লে জীবন এবং মৃত্যু উভয়ের প্রভাব তোমার উপর থেকে চলে যায়, তখন তুমি মুক্ত, তখন তুমি শাশ্বত, সনাতন, অব্যয়, অবিচল, নিরঞ্জন, অক্ষয়, অপরিবর্ত্তনীয় এবং আনন্দময় পরমসত্তা। হঠাৎ একদিন জীবন পেয়েছ, হঠাৎ একদিন জীবন হারাতে পার, কিন্তু প্রেমময় পরম প্রভুকে সমগ্র হৃদয়,

মন, চিত্ত ও আত্মা দিয়ে আলিঙ্গন ক'রে ধর্‌লে মৃত্যু এসেও তোমার কি কত্তে পারে? নিয়মের অধীনে মৃত্যু আসে, কিন্তু মার্কণ্ডেয় মুনির মত যিনি বিশ্বেশ্বরের আশ্রয় নিয়েছেন, মৃত্যু তার দেহকে হরণ কত্তে পারে, কিন্তু পরমপ্রভুর আশ্রিত এই নিশ্চিন্ত নির্ভর কি ক'রে কেড়ে নেবে?

মৃত্যুজয়ের মানে

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পরমেশ্বরে নিশ্চিন্ত নির্ভরকেই জান্‌বে মৃত্যু-জয়। অনন্ত পরমায়ু লাভের নাম মৃত্যুজয় নয়। অনন্ত পরমায়ু কারো কাম্যও হ'তে পারে না। কেননা, অনন্ত পরমায়ু হয়ত তুমি পেতে পার, কিন্তু অনন্ত যৌবন ত' পাবে না। এই জড় দেহ নির্দ্দিষ্ট কালের পরে যৌবন-রিক্ত হবেই হবে। সুতরাং সেই দেহের অবসানকে অনন্ত কালের জন্য রোধ ক'রে রাখার ত' কোনো সার্থকতাই হয় না। দেহকে প্রয়োজন বিদেহী ভগবানকে আপন ব'লে চেনার, আপন ব'লে জানার সাধনার জন্য। দেহকে প্রয়োজন ভগবদ্‌ভক্তির অনুশীলনের সাহায্যের জন্য। ভক্তিলাভও হ'ল, দেহের প্রয়োজনও চুকে গেল। ভক্তির প্রবহমান অবস্থার নাম অনুরাগ, ভক্তির ক্ষীর-সম-ঘন স্রোতো হীন স্থির অবস্থার নাম নির্ভর। অনুরাগ ও নির্ভর ভক্তিরই তরুণ এবং প্রবীণ প্রকারভেদ মাত্র এবং পরিপূর্ণ নির্ভরই হচ্ছে প্রকৃত মৃত্যুজয়।

মৃত্যুতে ভয় কেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মৃত্যুকে সবাই ভয় পাই কেন? যেহেতু মৃত্যুর পরবর্ত্তী অবস্থা অজ্ঞাত। কিন্তু মৃত্যু যে আমারই পরমপ্রাণারাম হৃদয়-দয়িতের কোলে বসার নাম, একথা জান্‌লে মৃত্যুভয় থাকে না। মৃত্যু যে তাঁকেই প্রাণ ভরে আলিঙ্গন করার নাম, একথা জান্‌লে মৃত্যুভয় থাকে না। মৃত্যু হওয়া আর তাঁকে পাওয়া যে এক কথা, একথা জান্‌লে মৃত্যুভয় থাকে না। আলোর অভাবে জানা পথেও চল্‌তে গা ছম্‌ছম্ করে। অজানা পথেও আলো থাক্‌লে চল্‌তে ভয় আদৌ থাকে না। মৃত্যুকে ভয় করি আমরা অজ্ঞানতাবশতঃ। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা প্রভৃতি যেমন এক একটা অবস্থা, মৃত্যুও তেমন একটা অবস্থা মাত্র। একে ভয় পাওয়ার কিছু নাই। তবু আমরা ভয় পাই। কেন ভয় পাই? না, ভগবানকে আমরা ভালবাসি না। বাইরের আলোক জ্বল্ জ্বল্ ক'রে জ্বল্‌ছে ব'লে তাঁকে আমরা কম দেখ্‌তে পাই। মৃত্যুতে বাইরের আলোক নিবে যায়, ভিতরের আলোক জ্বলে ওঠে, তখন তাঁকে স্পষ্ট করে দেখা যায়, তাঁর বাণী স্পষ্ট ক'রে শোনা যায়, তাঁর স্পর্শ স্পষ্ট ক'রে পাওয়া যায়, তাঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ স্পষ্ট ক'রে উপলব্ধি কত্তে পারি, তিনি আমার কে, আমি তাঁর কে, একথা অভ্রান্ত-ভাবে অবগত হওয়া যায়। সুতরাং মৃত্যুতে তো ভয়ের কিছু নেই।

প্রেমিকের চক্ষে জীবন ও মৃত্যু

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জীবন অথবা মৃত্যু, এর কোনোটীর উপরের নিজের দাবী স্থাপন কত্তে যেও না। জীবন যে কয়দিন আছে থাকুক, এস তার সদ্ব্যবহার করি। মৃত্যু যে দিন আসার আসুক, এস তার জন্য প্রস্তুত হই। মৃত্যু যে আমার বাসর-শয্যা। আমার প্রাণের প্রিয়ের সাথে সেদিন যে আমি পুষ্পশয্যায় শয়ন কর্ব্ব। সেদিন যে আমার সাথে তাঁর কুণ্ঠাহীন প্রেমের চূড়ান্ত আদান প্রদান হবে। আবার জীবন যে আমার বিবাহের আয়োজন। যার গলে বরমাল্য দিব, তাঁকে সাজাবার ফুলদল যে জীবৎ-কালেই আহরণ কত্তে হবে, তাঁর গলায় পরাবার মালাটী যে জীবৎ-কালেই আমাকে গেঁথে ফেল্‌তে হবে। বিবাহের লগ্ন এলে তখন কি আর মালাগাঁথার সময় থাক্‌বে? একাজ যে আগেই সেরে রাখ্‌তে হয়। প্রেমিকের চ'খে জীবন এবং মৃত্যুর রূপ হচ্ছে এই। তোমরা প্রেমিক হও। দেখ্‌বে জীবন হবে পরম আস্বাদনের, মরণ হবে পরম পরিতৃপ্তির।

দ্বিপ্রহরে শ্রীশ্রীবাবামণি অনেকগুলি পত্র লিখিলেন।

সাপ্তাহিক উপাসনার দিনের কর্ত্তব্য

সমবেত উপাসনার প্রসার-কল্পে ভারপ্রাপ্ত জনৈক কর্ম্মীকে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তোমরা সাপ্তাহিক উপাসনার দিনটাকে যতটা পার সুন্দর ভাবে কাটাইতে চেষ্টা করিও। সৎকার্য্যে দান করিয়া, সেই দিন তোমরা প্রত্যেকে অল্পাধিক ত্যাগের চর্চ্চা করিও। নিজেদের অন্নমুষ্টিকে প্রতিবেশীদের সঙ্গে ভাগ করিয়া খাইতে চেষ্টা করিও। যতটা পার সুস্থ, স্বচ্ছন্দ ও সুশ্রী থাকিতে প্রয়াসী হইও। নিজেরা প্রত্যেকটী অবস্থার মধ্য দিয়া আনন্দ সংগ্রহের চেষ্টা করিও এবং অপরকে আনন্দ বিতরণের উদ্যোগ দেখিও। শুচি শুভ্র সুদর্শন মূর্ত্তিতে উপাসনার প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিও এবং অঞ্জলি দিবার জন্য যে পবিত্র ফুল-দল সঙ্গে করিয়া আনিবে, নিজেদের জীবনকে তদ্রূপ সুন্দর ও পবিত্র করিবার জন্য অন্তর জুড়িয়া প্রার্থনা জানাইও। জগতের যত মহনীয় চিন্তাকে পরস্পর পরস্পরের অধিগম্য করিবার জন্য যত্ন লইও এবং জগতের হিতবুদ্ধিতে শুভ-বাণী কেহ কিছু বিতরণ করিলে শ্রদ্ধাবিনম্র চিত্তে তাহা গ্রহণ করিও। সমগ্র সপ্তাহের নানাবিধ জটিল অবস্থার চাপ অন্তরে যে সকল মলিনতার সংশ্লেষ প্রদান করিয়াছে, এই একটী দিনের প্রীতিপূর্ণ আবহাওয়ায় প্রাণ ভরিয়া হাসিয়া তাহা দূর করিয়া দিও। জগতে তোমার শত্রু কেহ আছে কিম্বা থাকিতে পারে, এই কথাটী বিস্মৃত হইয়া যাইও এবং যে যতদূর অন্যায়ের অনুষ্ঠানই তোমার উপরে করিয়া থাকুক না কেন, অদ্যকার দিনে বিশেষতঃ উপাসনার অধিবেশনে, তাহাকেও অন্তরঙ্গ মিত্রবৎ জ্ঞান করিয়া মৃদুমধুর সরল ভাষণে আপ্যায়িত করিও।

ভেদবুদ্ধি ভুলিয়া যাইও এবং সপ্তাহের সাতটী দিনের মধ্যে অন্ততঃ এই একটী দিন নিজের দারিদ্র্য-জনিত অবনত অবস্থার ক্লেশ অথবা ধনসঞ্চয়-জনিত উন্নত পদবীর গৌরব বিস্মৃত হইও। বাক্যে, মনে, কার্য্যে শিষ্ট, সংযত ও শান্ত হইও এবং 'একের জন্যই দশের পুষ্টি, দশের জন্যই একের সৃষ্টি,' এই কথা কয়টী মনে রাখিয়া প্রতিটী পদবিক্ষেপকে নিয়ন্ত্রিত করিও। আমির এবং ফকিরের পার্থক্য বিস্মৃত হইও এবং ফকিরের ভিতরে আমিরকে, আমিরের ভিতরে ফকিরকে দর্শন করিতে চেষ্টা পাইও। দুঃখীকে তাহার অতীত কুকর্ম্মের জন্য গালি দিতে বিরত হইও, সুখীকে তাহার অতীত সৎকার্য্যের জন্য প্রশংসা করিতে পঞ্চমুখ হইও। বিগত ছয়টী দিন জীবনের মধ্যে যে আদর্শবাদ ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াও শতবার ব্যর্থকাম হইয়াছ, অন্ততঃ এই একটী দিন তাহাকে পরিপূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করিতে বাধ্য করিও।

সমবেত উপাসনার স্থান

"তোমাদের যে গ্রামে আশ্রম আছে, সেই গ্রামে সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনার নির্দ্দিষ্ট স্থানটী পারিলে আশ্রমেই করিবে, ব্যক্তি-বিশেষের গৃহে করিবে না। কেননা, ব্যক্তি-বিশেষের সহিত অপরাপর উপাসকের নানা বৈষয়িক বা সামাজিক সম্বন্ধ বা অসম্বন্ধের যোগাযোগ থাকে, যাহার স্মৃতি তাহারই গৃহে বসিয়া উপাসনা করিবার কালে সকলের মন হইতে

সহজে দূরীভূত নাও হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু যেখানে কোনও আশ্রম নাই, সেখানে সমবেত উপাসনা কোনও গৃহস্থের ঘরেই করিতে হইবে। যাহার গৃহে উপাসনার অনুষ্ঠান করিলে অধিকাংশ উপাসকের যোগদান করিবার সুবিধা, তাহার গৃহেই স্থান-নির্ব্বাচন সঙ্গত। কিন্তু যাহার গৃহেই অনুষ্ঠিত হউক, তোমাদের সমবেত উপাসনা ব্যক্তি-বিশেষের দায় নহে, ইহা যোগদানকারী প্রত্যেক উপাসকের দায়। ইহার সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরতা ও পরিপূর্ণ সৌষ্ঠব-বিধানকল্পে প্রত্যেক উপাসক ও উপাসিকার যথেষ্ট কর্ত্তব্য রহিয়াছে। পুষ্প, বিল্বপত্র, দুর্ব্বাদল, তুলসী, শ্বেতচন্দন বা ভোগ-নৈবেদ্য কেবল একটী লোকেরই দ্বারা সংগৃহীতব্য নহে, তোমাদের প্রত্যেককেই সংগ্রহ করিতে হইবে। যাহার সাধ্য অধিক, সে বেশী করিবে, যাহার সাধ্য কম সে কম করিবে, কিন্তু এই কর্ত্তব্যের দায় হইতে নিষ্কৃতি কাহারও নাই। রামের বাড়ীতে উপাসনা হইল বলিয়া ত্রুটী-বিচ্যুতির জন্য একা রামই দায়ী হইবে, তোমাদের সমবেত উপাসনার গোড়ার কথা তাহা নহে। শ্যাম, যদু, মধু প্রভৃতি প্রত্যেকেই ইহার জন্য দায়ী হইবে এবং যাহাতে কোনও দিক্ দিয়াই কোনও ত্রুটী এই অনুষ্ঠানটুকুর মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে, তজ্জন্য রাম, শ্যাম, যদু, মধু সকলকেই সমভাবে সতর্ক ও যত্নশীল হইতে হইবে। এই কারণেই, যে গ্রামে তোমাদের আশ্রম নাই, সেই গ্রামে প্রথম সপ্তাহের সমবেত উপাসনা একজন ধনীর গৃহে হইয়া দ্বিতীয়

সপ্তাহের সমবেত উপাসনা একজন দরিদ্রের গৃহে হইতে কোনও অসুবিধার কারণ নাই। ধনী একাই সম্পূর্ণ আয়োজনের দায়িত্ব নিতে সমর্থ বলিয়া বাহিরের সকলে আসিয়া সকল দিক হইতে সহযোগ প্রদান করিয়া অনুষ্ঠানের সম্পদ বৃদ্ধি করিলে সে নিজেকে অসম্মানিত জ্ঞান করিতে অধিকারী হইবে না, আবার দরিদ্রের পক্ষে একাকী এই অনুষ্ঠানের পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ অসম্ভব বলিয়া চতুর্দ্দিক হইতে তোমরা যাহারা নিজ নিজ শক্তি-সাধ্য-অনুযায়ী অল্প বা অধিক সহযোগ প্রদান করিয়া এই মহান্ প্রয়াসকে জয়যুক্ত করিয়া দিলে, তাহাদেরও মনে এইরূপ অশুচিভাব পোষণ করিবার বিন্দুমাত্র অধিকার নাই যে, দরিদ্র ভ্রাতাটীর দায় উদ্ধার করিয়া দিয়া তোমরা তাহার উপকার করিলে। ধন্য এবং উপকৃত হইয়াছ তোমরা প্রত্যেকে। সমবেত উপাসনায় যোগদান করা একটা মহৎ সৌভাগ্য, একটা মহান্ সুযোগ। ইহাতে যোগদান করিতে না পারা দুর্ভাগ্য এবং বিড়ম্বনা।

সমবেত উপাসনার শৃঙ্খলা

"সমবেত উপাসনার অনুষ্ঠানে সময় এবং কর্ম্মের শৃঙ্খলা অতীব আবশ্যকীয় ব্যাপার বলিয়া জ্ঞান করিবে। ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় উপাসনা সুরু হইবে এবং যাহার প্রতি আয়োজন-প্রয়োজনের যে অঙ্গ-সম্পাদনের দায়িত্ব অর্পিত থাকিবে, সে যন্ত্রের মত নিখুঁত ভাবে ঠিক্ নিরূপিত সময়টীতে

তাহার অনুষ্ঠান করিবে। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদলের বিশৃঙ্খলা যেমন অপরাধ, উপাসনা-ক্ষেত্রে উপাসকদের বিশৃঙ্খলাকেও তদ্রূপ জানিবে। তোমাদের উপাসনা হট্টগোলের বস্তু নহে, পৃথিবীর সকল কল-কোলাহল ও বিশৃঙ্খলাকে সংযত, সংহত, সুশাসিত করিয়া একটী মাত্র মহামন্ত্রে ডুবাইয়া দিয়া লক্ষ লক্ষ ভিন্ন রুচির ভিন্ন প্রকৃতির মানব-মানবীর অন্তরের মধ্যে আত্মনিবেদনের একত্ব-সম্পাদনই তোমাদের উপাসনার বিশেষত্ব। একদা তোমাদের এই উপাসনা লক্ষ লক্ষ লোকে একত্র মিলিয়া অনুষ্ঠান করিবে। আজ যদি তোমরা তোমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাবেশগুলিকে কঠোর শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্ত্তিতার ভিতর দিয়া সৌষ্ঠবযুক্ত করিতে সফল না হও, তাহা হইলে অনাগত কালে তোমাদের উপাসনা কতকগুলি কাণ্ডজ্ঞানবর্জ্জিত জনতার যথেচ্ছ উচ্চ চীৎকার-মাত্রে পর্য্যবসিত হইবে। এই সকল বিষয়ে বিশেষ বিশেষ নিয়ম ও শৃঙ্খলার বিষয়ে আমি পরে কখনও বিস্তারিত বলিব। যে-কোনও উপাসনা-অনুষ্ঠানে আমার সহিত যোগ দিয়া ইহার কতক কতক আভাষ গ্রহণ করিতে পার।

শ্বেতচন্দনের ফোঁটা

"শ্বেতচন্দনের ফোঁটাটীকে ভ্রূমধ্যে প্রদান করিবে, ললাটের যেখানে সেখানে নহে। সমস্ত কপাল জুড়িয়া চন্দন লেপন অন্য সময়ে অন্য উদ্দেশ্যের সিদ্ধিকর হইতে পারে, উপাসনা-

কালে মনঃসন্নিবেশনের পক্ষে তাহা হিতকর হইবে না। উপাসকেরা বিবাহের বরযাত্রী বা গয়া তীর্থের পাণ্ডা নহেন। সুতরাং তাঁহাদের চন্দন-তিলক একমাত্র-ভ্রূমধ্যেই হইবে, অন্যত্র নহে। বিশাল বিপুল স্থান জড়িয়া ইহার বিরাজমান হইবার প্রয়োজন নাই, অনামিকার অগ্রভাব কিম্বা একটী পুষ্প-বিশেষের পরাগ-স্তম্ভ দ্বারা যতটুকু গোলাকৃতি বিন্দু-বিকাশ সম্ভব, এই ফোঁটাটির আয়তন মাত্র তাহাই হইবে। কেন ইহা ঠিক্ এইরূপই হইবে, অন্যরূপ হইতে কেন দেওয়া হইবে না, একমাত্র ভ্রূমধ্যেই কেন ইহা পড়িবে, অন্যত্র ইহা কেন বিস্তারিত হইবে না, এই বিষয়ে প্রশ্ন তোলা নিষ্প্রয়োজন। যে পবিত্র উদ্দেশ্যে উপাসনায় বসিতে যাইতেছ, তাহা সম্পাদনের পক্ষে ভ্রূমধ্যে চন্দন-বিন্দুই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সহায়ক। ইহা যোগ-রহস্যের এক আশ্চর্য্য আবিষ্ক্রিয়া।

একত্বের সাধনা

"সকলে সরল মেরুদণ্ডে বসিবে এবং সর্ব্বাঙ্গ শ্বেত বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিবে। পদযুগল যত্নপূর্ব্বক ঢাকিয়া রাখিবে। যতটা সম্ভব, একের অঙ্গস্পর্শ হইতে অপরে বিরত রহিবে কিন্তু স্থানের অকুলান হেতু তাহা করিতে বাধ্য হইলে উপাসনার আসরে শত শত ব্যক্তির পৃথক্ উপস্থিতির কল্পনা পরিহার করিয়া লইবে। সকলে মিলিয়া এক আত্মা, এক প্রাণ, এক ভাষা, এক কণ্ঠ, এক দেহ, এক মূর্ত্তি হইয়া

গিয়াছে, এই বোধ ভিতরে জাগাইয়া লইবে। চক্ষু মুদিয়া বসিবে এবং স্তোত্র-কীর্ত্তনের মধুর ধ্বনিতে কণ্ঠকে সংযোজিত করিবে, সেই সুর-প্রবাহের মোহন তানে নিজেকে সম্যগ্‌রূপে ঢালিয়া দিবে। একার এ উপাসনা নহে, বহুকে লইয়া এক হইতে যাইতেছ, এক হইতে চাহিতেছ। তোমাদের প্রত্যেকের সাধনার ধন এক মহাবস্তু, তোমাদের প্রত্যেকের আনুগত্যের বস্তু একটী মাত্র মহানাম, তোমাদের প্রত্যেকের পরম লক্ষ্য সেই নামের ভিতর দিয়া নিজের সহিত নিখিল বিশ্বের একাত্মতা আস্বাদন করা। ভাবের দিক্ দিয়া এক হইলে দেহ বা কণ্ঠ সহজে ঐক্য মানিয়া চলে।

স্তোত্র-কীর্ত্তনের সুর-শিক্ষা

"কিন্তু তথাপি স্তোত্র-কীর্ত্তনগুলির শুদ্ধ সুর নিয়মিত প্রযত্নে শিক্ষা করিবার প্রয়োজন আছে। তুমি শুদ্ধ সুর শিখ নাই এবং কণ্ঠকে অনুগত করিবার অভ্যাস আয়ত্ত কর নাই, তবু তুমি ভাবের বশে প্রাণের আবেগে স্তোত্র-কীর্ত্তন গাহিয়া যাইতে পার। তাহাতে তোমার ব্যক্তিগত ক্ষতি কিছুই নাই কিন্তু অপর যে দশ জন উপাসনায় যোগ দিতে আসিয়াছেন, তাঁহাদের ভাব-ভঙ্গ হইবে। ইহাতে তুমি তাঁহাদের নিকটে অপরাধী হইবে। যথেচ্ছ কণ্ঠ-পরিচালনা করিয়া অপরের অভিনিবেশ নষ্ট করা তপস্যা নহে, উপদ্রব। সুতরাং স্তোত্র-কীর্ত্তনের বিশুদ্ধ সুর, মাত্রা ও উচ্চারণের শিক্ষা প্রত্যেকের

পক্ষে বাধ্যকর জানিবে। সাপ্তাহিক উপাসনার নির্দ্ধারিত দিনটীকে পরিপূর্ণ আনন্দের খনিরূপে পরিণত করিতে হইলে অবশিষ্ট ছয়টী দিনের কোনও অবসর সকলকে বিশুদ্ধ সুর, লয় ও উচ্চারণ শিখাইবার জন্য কাজে আনিতে হইবে। সঙ্গীত-শাস্ত্রে সুরকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। ইহাকে অতিশয়োক্তি বা কাব্যের অলঙ্কার বলিয়া জ্ঞান করিও না। সুরের মনোনিয়ামিকা শক্তি একমাত্র সুর-সাধনা হইতেই উপলব্ধ হইয়া থাকে। সমবেত উপাসনাকে একটা হাল-ফ্যাশানের অনুষ্ঠান জ্ঞান না করিয়া জীবনের সকল ক্ষুধা, সকল তৃষ্ণা, সকল প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণে পরমোৎকৃষ্ট আয়োজন বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে। নিঃশ্বাস-বায়ু গ্রহণ না করিলে যেমন প্রাণ আইঢাই করে, উপাসনা না করিলে তোমাদের তেমন অবস্থা হউক। মৎস্যকে যেমন জল হইতে তুলিয়া আনিলে সে ছট্‌ফট্ করে, উপাসনায় যোগদানে অপারগ হইলে তোমাদের তেমন ছট্‌ফটানি আসুক।

ধনাভিজাত ও কুলাভিজাত

"ধন-সম্পৎ-সম্পন্ন ব্যক্তিরা তোমাদের উপাসনায় যোগ না দিলে তোমরা তাহার জন্য নিরুৎসাহ হইও না। জগতের যত দরিদ্রদের লইয়াই তোমরা তোমাদের অনুষ্ঠান নিয়মিত প্রযত্নে এবং ক্রমবর্দ্ধমান উৎসাহে চালাইয়া যাইতে থাক। ক্রমে সম্পন্ন ব্যক্তিরা এই দিকে ঝুঁকিবেন। ধনীর ধনগর্ব্ব

তাঁহাকে অনেক সময়ে বিবেকের অনুমোদিত পথে যাইতে বাধা দেয়। গরীবদের সহিত একাসনে বসিয়া ধনীর দুলাল ভগবানকে ডাকিবেন কি করিয়া? তাঁহার অন্তরে সঞ্চিত বহুবর্ষের ধনাভিজাত্য তাঁহাকে পিছন হইতে ঘিরিয়া ধরে। উচ্চকুলের ব্যক্তিদের সম্পর্কেও এই কথা অনেক স্থলে সত্য হইবে। কিন্তু তোমরা তাঁহাদের প্রতীক্ষায় কালহরণ না করিয়া নিম্নকুলজাত ব্যক্তিদের লইয়া ভগবদ্‌ভক্তির এই অনুশীলনে ব্রতী হও। ভগবন্নামের অমোঘ আকর্ষণে ক্রমশঃ কুলাভিজাতেরাও আসিয়া অনভিজাতবর্গের মধ্যখানে নিজেদের আসন খুঁজিয়া নিবেন। কেহ আসেন নাই বলিয়া দ্বেষ করিও না, একদা সকলেই সুনিশ্চিত আসিবেন জানিয়া অন্তরে আশার পর আশা পোষণ কর। শুধু ধনাভিজাত হইতে পারিলেই মানুষের মন তৃপ্ত হয় না, কুলাভিজাত হইতে পারিলেও নহে। পরন্তু ভক্তি-সাধনায় অভিজাত হইবার জন্য প্রত্যেক জীবের অন্তরেই এক অজ্ঞাত আসক্তি অতি প্রবল প্রবণতাসমূহ লইয়া ঘুমন্ত সর্পের মত নিঃসাড়ে পড়িয়া আছে। তোমরা তোমাদের উপাসনা-লহরীতে বায়ুমণ্ডল আলোড়িত কর, একদা এক শুভ মুহূর্ত্তে ধনপতি কুবের নিজের ধনদম্ভ ভুলিয়া যাইবেন, গোষ্ঠীপতি কুলীন নিজের কুলগর্ব্ব পাসরিয়া যাইবেন, গভীর প্রেমের অনিবার্য্য টানে ঢুলী, মালী, তেলীর দলে আসিয়া বসিয়া পড়িবেন এবং সমান মন্ত্রে সমান কণ্ঠে গাহিতে সুরু করিবেন,—'শরণাগতোঽহং তব পাদপ্রান্তে,

যথাভিসন্ধং কুরু কল্যাণম্।' সেই শুভদিনের শুধু প্রতীক্ষা কর আর বীর-বিক্রমে নিজেদের উপাসনা চালাইয়া যাও।

উপাসনার শক্তি

"উপাসনার শক্তিতে বিশ্বাস কর। অঘটন ঘটাইবার শক্তি উপাসনার আছে। লম্পটকে জিতেন্দ্রিয় করিবার সামর্থ্য উপাসনার আছে। দুর্ব্বলকে সবল করিবার সামর্থ্য ইহার আছে। গর্ব্বিতকে বিনীত করিবার সামর্থ্য ইহার আছে। অবিশ্বাসীকে বিশ্বাসী করিবার সামর্থ্য ইহার আছে। কঞ্জুষকে দাতা করিবার সামর্থ্য ইহার আছে। স্বার্থপরকে আত্মত্যাগী করিবার সামর্থ্য ইহার আছে। রুগ্নকে আরোগ্য দিবার সামর্থ্য ইহার আছে। ক্ষীণায়ুকে বর্দ্ধিতায়ু করিবার সামর্থ্য ইহার আছে। উপাসনার শক্তি অসীম ও অপরিমেয়। এই শক্তিতে পুনঃ পুনঃ বিশ্বাস কর, পুনঃ পুনঃ নির্ভর কর।"

নিজের অন্ন নিজে অর্জ্জন

অপর এক জিজ্ঞাসুর পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"বিষয়ের সংস্রবে গেলে আধ্যাত্মিক রুচি যে কক্ষভ্রষ্ট হইতে চাহে, একথা সত্য। শুধু কক্ষভ্রষ্ট হইতেই চাহে, তাহা নহে, কক্ষভ্রষ্ট হইয়াও যায়। কিন্তু এই যুক্তিতে বিষয়ের

সংশ্রব পরিহার করিয়া তুমি এই যুগে সরিয়া দাঁড়াইবে কোথায়? তুমি ত্যাগীই হও আর যতিই হও, তোমার অন্ন অর্জ্জন করিয়া দিতে কে রাজি হইবে? যদি কেহ রাজি হয়, তবে সে তোমার মত কয়জনের অন্ন অর্জ্জন করিয়া দিতে সমর্থ হইবে? কিম্বা এইরূপ সম্মত ব্যক্তি কয়জনই বা পাওয়া যাইবে? চুয়ান্ন লক্ষ সন্ন্যাসী গৃহীদের অর্জ্জিত অন্নে ভাগ বসাইয়া সমাজের হিত যে কিছুই করেন নাই, এইরূপ আন্দোলন কি তুমি নিজেও শুনিতে পাও নাই? তোমার অন্ন তোমাকেই অর্জ্জন করিতে হইবে। তোমার বস্ত্র তোমাকেই আহরণ করিতে হইবে। তোমার শীতাতপের আশ্রয়স্থান তোমাকেই নির্ম্মাণ করিতে হইবে। সাধারণতঃ ইহাই বর্ত্তমানের স্থিরীকৃত বিধান বলিয়া মানিয়া লও। যদি তোমার উপরে দুই চারিজন পুত্র-কন্যারূপী বা শিষ্য-শিষ্যারূপী পোষ্য থাকিয়া থাকে, তবে তাহারা যোগ্য হইয়া না উঠা পর্য্যন্ত তোমাকেই তাহাদের অন্ন অর্জ্জন করিয়া আনিতে হইবে, ইহাও নিজের উপরে বাধ্যকর কর্ত্তব্য বলিয়া ধরিয়া লও। সুতরাং বিষয়ের সংশ্রব ছাড়িবে কি করিয়া?

বিষয়-সংশ্রব ও বিষয়-লালসা

"বিষয়ের সংশ্রব তোমার ত্যজনীয় নহে। ত্যজনীয় হইতেছে বিষয়ের লালসা। তৈজসের পর তৈজস সঞ্চয় করিয়া, বস্তুর পর বস্তু গুদাম-জাত করিয়া তারপরেও কিন্তু

অনেকের দ্রব্য-সংগ্রহের পিপাসা মিটে না। এই পিপাসাকে দাবাইয়া রাখা বা দূরীভূত করাই হইতেছে তোমার কর্ত্তব্য। বস্তুর, অর্থের, খাদ্যের, বস্ত্রের, গৃহের, আশ্রয়ের, ঔষধের ও চিকিৎসার তোমার প্রয়োজন আছে। এ সকল জিনিসের প্রয়োজন পৃথিবীর ছোট-বড় ক্ষুদ্র-মহৎ প্রত্যেক ব্যক্তির হয়। কিন্তু প্রয়োজনও মিটিল, আসক্তিও চুকিল, এই অবস্থাটী হওয়া প্রয়োজন। সেই অবস্থাটীকে লাভের জন্য ব্যগ্র হও। বিষয়কে লাথি মারিয়া দূরে সরাইয়া দিবার চেষ্টায় কোনও সুফল হইবে না। কেননা, সেই চেষ্টাতেও প্রকারান্তরে বিষয়েরই হয়ত সহায়তা নিতে হইবে।

বিষয়ের বিষ-জারণ

"বিষয়ের বিষ আছে আবার বিষেও অমৃত আছে। যোগীশ্বরেরা বিষকেও অনায়াসে জীর্ণ করেন, কেহ কেহ বিষকে অমৃতে পরিণত করিয়া নেন। ইহা সম্ভব হয় ঐকান্তিকী ভগবন্নিষ্ঠার ফলে। ভগবানকে আপন বলিয়া জানিলে বিষেও শত্রুতা করিতে বিরত হয়! জগৎকল্যাণ লক্ষ্য লইয়া অথবা ভগবানের কাজের জন্য তনু-ধারণের উদ্দেশ্যে ধনোপার্জ্জনাদি বিষয়-সংশ্রবে আসিলে তোমার ভগবন্নিষ্ঠার মহিমা বিষয়ের বিষকে জারণ করিয়া লইবে। ভগবানের চরণে মতি রাখিয়া বিষয়ের যে সেবা করিতেছ, সেই সেবা ভগবানের পায়েই

গিয়া পৌছিবে। তাঁহার চরণে লক্ষ্য রাখ স্থির, অপলক এবং নির্ভুল।"

নারীনৃত্য

অপরাহ্ণ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ঠিক চারি ঘটিকায় রাজা গিরিশচন্দ্র হাইস্কুলের খোলা প্রাঙ্গণে শ্রীশ্রীবাবামণির তৃতীয় বক্তৃতা সুরু হইল। অদ্য সমগ্র প্রাঙ্গণে তিল-ধারণেরও স্থান ছিল না।

জাতি-গঠনের অন্তরায়-সমূহের আলোচনা করিতে যাইয়া প্রসঙ্গ-ক্রমে শ্রীশ্রীবাবামণি ভদ্রনারীদের নৃত্য-বিলাসের কথা তুলিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আর্টের নামেই করি আর শরীর-চর্চ্চার নাম ক'রেই করি, ভদ্রনারীদের নৃত্য-বিলাসের চর্চ্চা প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে জাতির নৈতিক মেরুদণ্ডকে দুর্ব্বল এবং নৈতিক মানদণ্ডকে ক্ষুদ্রতর কত্তে বাধ্য হবে। এই নৃত্য-বিলাসের প্রতিবাদ যারা করে না, তারা নিজেদের অন্তরের প্রচ্ছন্ন লোলুপতার দিকে তাকিয়েই হয়ত অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রতিবাদে বিরত হয়। কলা হিসাবে নৃত্যের মূল্যবান্ স্থান আছে, একথা কে না স্বীকার করে? কিন্তু যে রমণীকে মাতা-রূপে সংসারে সন্তানকে লালন, পালন, পোষণ ক'রে মানুষ কত্তে হবে অথবা যে রমণীকে দেশরক্ষিকা সৈনিকারূপে প্রত্যক্ষ রণক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়্তে হবে নৃত্যের চপল বিলাসে প্রমত্ত হবার তার অধিকারই বা কোথায়, অবসরই বা

কোথায়? "খাও, দাও, আর মজা লোটো,"—এ কখনো একটা জাতির মূলমন্ত্র হ'তে পারে না।

আড়াই ঘন্টা বক্তৃতার পরে সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীহট্ট
মঙ্গলবার, ১লা মাঘ, ১৩৪১
(১৫ই জানুয়ারী, ১৯৩৫)

গুরুর প্রতি সংশয়

প্রাতঃকালীন উপদেশ-প্রার্থী ব্যক্তিদের মধ্যে একজন প্রশ্ন করিলেন,—গুরুর প্রতি শিষ্যদের সংশয় আসে কেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সাধন না করার ফলে। অবিরাম অবিশ্রাম সাধন ক'রে যাও, তাতেই ক্রমশঃ তোমার চিত্তের সংশয়িত ভাব ও সদা-সন্দিগ্ধতা দূরীভূত হ'য়ে যাবে। তুমি যদি আমার শিষ্য হ'তে, তাহ'লে তোমাকে আমি সোজা রাস্তা দেখিয়ে দিতুম বিদ্রোহের। অর্থাৎ বল্তুম যে, আমাকে ছেঁড়া চটিজুতার মত ত্যাগ কর এবং বৃহত্তর, মহত্তর, উন্নততর সিদ্ধ-সাধকের আশ্রয় নিয়ে নূতন জীবন পত্তন কর। ভাগ্যে তুমি আমার শিষ্য নও, তাই তোমার জন্য উপদেশ অন্যরূপ। তোমার প্রতি আমার অনুরোধ এই যে, গুরুদেবের হাজার ত্রুটী খুঁজে খুঁজে নিজেকে হয়রাণীতে না ফেলে বাইরের সর্ব্বাবস্থার প্রতি উদাসীন দৃষ্টি নিয়ে আসক্তি রক্ষা কর একমাত্র পরমপবিত্র ভগবন্নামে এবং সেই

নামের সেবাতে জীবন একান্তভাবে উৎসর্গীকৃত কর। ক্রমে এতেই সকল দ্বিধা, সংশয়, দুর্ব্বলতা ও অস্থির-চিত্ততা দূর হবে। নামে নির্ভর কর, নামের সেবা ক'রে কৃতকৃতার্থ হও।

লোকমুখে গুরুনিন্দা শ্রবণে কর্ত্তব্য

প্রশ্ন।—কিন্তু বাজারে যে গুরুদেবের বড়ই নিন্দা। লোকে তাঁকে নিন্দা করে, তাঁর আচরণের সহস্র কদর্থ করে, আর আমার প্রাণ কেবলি সন্দেহ-দোলায় দোদুল্যমান হয়। এ ক্ষেত্রে আমার কর্ত্তব্য কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—তুমি যদি আমার শিষ্য হ'তে আমি তোমাকে নিশ্চয়ই উপদেশ দিতাম যে, আমাকে বর্জ্জন কর এবং অনিন্দিত-চরিত্র কোনও মহাপুরুষের চরণাশ্রয় নিয়ে তার শীতল ছায়ায় প্রাণ জুড়াও। কিন্তু তোমাকে সে উপদেশ দিতে পার্ব্ব না। তোমার জন্য উপদেশ হচ্ছে,—"যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়ী-বাড়ী যায়, তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়"—বৈষ্ণবদের ভিতরে এইরূপ গুরুনিষ্ঠা দেখ্‌তে পাওয়া যায়। তোমার জন্যও আমার উপদেশ তাই। বাইরের লোকে সোণাকে পিতল বল্লে কি আর সোণা পিতল হ'য়ে যায়? বাইরের লোকে হীরাকে কাচ ব'লে প্রচার কল্লেই কি কখনো হীরার দাম কমে, না ধার কমে? তুমি গুরুদত্ত সাধন ক'রে

ক'রে নিজে সেই সাধন-লব্ধ প্রজ্ঞা দিয়ে বিচার ক'রে দেখ না কেন যে, তোমার গুরু তোমার বন্দনীয়, না বর্জ্জনীয়? গুরুকে ওজন করার মত পরিমাপ-যন্ত্র তোমার হাতে কিছু আছে কি? ম্যাট্রিক ক্লাশের ছাত্র এম-এ পাশ করা বিদ্বানের বিদ্যার বিচার কি কর্ব্বে? আর তুমি গুরু ক'রেছ কি তোমার লৌকিক প্রতিপত্তি বর্দ্ধনের জন্য? লোকে যেমন মেয়ে বিয়ে দেয় উচ্চকুলে, ছেলের বৌ উচ্চতর বংশ থেকে আনে শুধু নিজের বংশের কৌলীন্য বর্দ্ধনের উদ্দেশ্যে, তোমার গুরু-দীক্ষা গ্রহণেরও কি তদ্রূপ কোনও উদ্দেশ্য ছিল? দীক্ষা-গ্রহণ সাধন করার জন্য। সাধন তুমি অবিরাম অবিশ্রাম ক'রে যাও।

বিপথগামী গুরুর সংশোধন

প্রশ্ন ঃ—গুরু যদি বিপথগামী হ'ন, তবে কি তার সংশোধনের চেষ্টা কর্ব্ব না?

শ্রীশ্রীবাবামণি ঃ—আমি যদি তোমার গুরু হ'তাম, তবে অবশ্যই বল্‌তাম যে,—হাঁ, গুরুকে সংশোধন কর্ব্বে, সাহস নিয়ে, পৌরুষ নিয়ে, উদ্যম নিয়ে। কিন্তু তুমি অপরের শিষ্য, তাই তোমাদের জন্য সেই উপদেশ নয়। তোমার জন্য আমার উপদেশ এই যে,—শিষ্য যদি দেখেও যে গুরু বিপথে যাচ্ছেন, তাহ'লে শিষ্যের কি ক্ষমতা আছে যে,

গুরুর অন্তরের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝ্তে পারে? তাহ'লে শিষ্যের এমন কি ক্ষমতাই বা আছে যে, গুরুকে সংশোধন কত্তে পারে? যখনি তুমি কাউকে সংশোধন কত্তে যাবে, তখন যে আবার নিজেই গুরু হ'য়ে বস্লে। শিষ্য তার শিষ্যত্বকে বিসর্জ্জন ক'রে, গুরুর উপর গুরুগিরি কত্তে পারে না। তবে শিষ্য যদি প্রকৃত শিষ্য হয়, তাহ'লে তার বিনীত মন ঔদ্ধত্য বর্জ্জিত আবেদন, প্রেমময় আকিঞ্চন এবং আন্তরিক প্রার্থনা দ্বারা গুরুর প্রত্যক্ষ অশান্তি উৎপাদন না ক'রেই গুরুর কল্যাণ কত্তে পারে। গল্পে আছে, শঙ্করাচার্য্য রাজ-মহিষীদের নিকট কামকলা শিক্ষার জন্য মৃত রাজদেহে প্রবেশ ক'রে দিনপাত কচ্ছিলেন। শিষ্যেরা শঙ্করাচার্য্যকে নিজ দেহে ফিরিয়ে আনার জন্য কৌশল অবলম্বন কর্ল্লেন। রাজ অন্তঃপুরে প্রবেশ ক'রে তাঁরা শঙ্কর-রচিত মোহ-মুদ্গর আবৃত্তি কত্তে লাগ্লেন। তখন শঙ্করের মনে পড়ল যে, নিজ দেহকে তিনি সমাধিস্থ অবস্থায় গুহামধ্যে রেখে এসেছেন। এ কার্য্যে ষড়যন্ত্র, অপপ্রচার, গুরুর অপ্রীতিকর কার্য্য-সাধন, অশান্তি-বর্দ্ধন বা জুগুপ্সিত নীচতার আশ্রয় প্রয়োজন হ'ল না। শিষ্যের ব্যক্তিত্ব-বোধ যখন উগ্র হয়, গুরুকে শাসন ক'রে সংশোধন করার চেষ্টা হয় তখন। সেই ক্ষেত্রে শিষ্য নিজ আধ্যাত্মিক কুশল থেকে নিশ্চিতই ভ্রষ্ট হয়। এই ঔদ্ধত্য তার জন্য নিদারুণ বিপদ ডেকে আনে।

বিবাহ একনিষ্ঠার প্রতিজ্ঞা-গ্রহণ

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,— বিবাহ কথাটার মানেই হ'ল একনিষ্ঠার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ,— ভালবাসার, দৈহিক আদান-প্রদানে, নৈতিক মনোভাবে। বিবাহটা একটা Licensed prostitution (সম্মতি-প্রাপ্ত-ব্যভিচার) নয়, এটা হচ্ছে Controlled license (শৃঙ্খলিত ও সংযত সর্ব্বাধিকার-সম্মতি) License (অবাধ অনাচার) কে Control (শাসন) এর ভিতরে এনে তাকে সদাচারে পরিণত করার হচ্ছে এটা সামাজিক কৌশল। এর আদর্শ হচ্ছে পরিপূর্ণ একনিষ্ঠা। ভালবাস্তে চাও, ঐ একজনকেই ভালবাস্বে। রক্ত-মাংসের ক্ষুধা, চখের তৃপ্তি, লালসার তৃষ্ণা মিটাতে চাও,—ঐ একজনকে নিয়েই সব কর। নিত্য-নূতনের মোহে দশ দিকে না ঘুরে এই একজনের ভিতরেই নিত্য-নূতনকে কি ক'রে আস্বাদন করা যায়, প্রাণপণে এবং সকল বুদ্ধি-প্রতিভা নিয়োজিত ক'রে সেই পথ বে'র কর। মনকে ভিন্ন নারী বা ভিন্ন পুরুষের প্রতি ধাবিত হ'তে না দিয়ে শক্ত হ'য়ে জেদ ক'রে ঐ একজনের মধ্যে সন্নিবদ্ধ রাখ। এই হচ্ছে বিবাহের তাৎপর্য্য। সসীম একটা দেহে তোমার অসীম ক্ষুধা মেটে না, অফুরন্ত তৃষ্ণা নির্ব্বাপিত হয় না, ত' তুমি সসীমের ভিতরে অসীমকে দেখ্বার, বুঝবার, পাবার উপায়

অবলম্বন কর। ভোগে সুখ সর্ব্বত্রই সমান, সহস্র নারীতেও যা, একটী নারীতেও তা, সহস্র পুরুষে যা, একটী পুরুষেও তা'। তবে, একই ভোগ সহস্র স্থানে সহস্রবার হল এই পর্য্যন্ত। চখে কাউকে একটু বেশী ভাল লাগে, মনে কাউকে একটু বেশী পছন্দ হয়, এই পর্য্যন্ত। কিন্তু ভোগ সকল স্থানেই এবং সর্ব্বাবস্থাতেই অন্তঃসার-শূন্য। অথচ জীব এই অন্তঃসারশূন্য বস্তুর পশ্চাতেই ঘুরে মর্‌ছে এবং বৃথাই জীবনকে কাটিয়ে দিচ্ছে। তারই জন্য পার্থিব ভালবাসাকে, দৈহিক আদান-প্রদানকে এবং নৈতিক মনোভাবকে একনিষ্ঠ করার জন্য স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের সম্মতিক্রমে, সমাজের শাসক ও শাসিত উভয়ের সম্মতিক্রমে বিবাহ-প্রথার পত্তন হয়েছে।

বিবাহ-সম্পর্কে আত্মিক দৃষ্টি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যে সাহিত্য, চিত্র, দর্শন বা আন্দোলন বিবাহিত জীবনের ভিতর থেকে এই একনিষ্ঠার সাধনাকে নির্ব্বাসিত করার চেষ্টা করে, তাকে সমগ্র মানব-সভ্যতার শত্রু ব'লে বিবেচনা কর্ব্বে। বিবাহকে নিতান্তই যেখানে জড় দৃষ্টিতে দেখা হয়, সেখানে রক্ত-মাংস চর্ম্ম ছাড়া আর অন্য কথা আস্‌বে কি ক'রে? তাই সেখানে একনিষ্ঠার হানিজনক দর্শন-শাস্ত্রের আমদানি অত্যাবশ্যক হ'য়ে পড়ে। কিন্তু দেহের ভিতরে যে মন আছে, আর সেই মনের

উপরে যে আত্মা আছে, সেই আত্মার দৃষ্টিতে দেখা সুরু কর্লেই এসব প্রেত-লোকের অট্টহাস্য দূরে পালিয়ে যায়। ব্রহ্মাণ্ডের সকল-কিছু আত্মার দৃষ্টিতে দেখ। তখন দেখ্‌বে যে, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর আর স্বামীর প্রতি স্ত্রীর একনিষ্ঠার সমর্থক যুক্তিরও অভাব হবে না, সমর্থনের উপায়েরও অভাব হবে না।

পরিণামে জয় তোমার

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কুকথা বলে আর অপকথা প্রচার ক'রে কেউ কাউকে ছোট কত্তে পারে? দলবদ্ধ জনতা সঙ্ঘশক্তির আশ্রয় নিয়ে এবং প্রচুর বিত্ত-বলে নির্ভর ক'রেও যদি কুৎসা-প্রচার সুরু করে, তবু জান্‌বে জগতের কোথাও না কোথাও কোনও না কোনও কালে তুমি নিজের সুযশ ও সুপ্রতিষ্ঠার পত্তন কত্তে পারবেই পার্‌বে। বিরুদ্ধ-পন্থীদের দল, বল, বিত্ত, একতা এবং উগ্রতা দেখে ভয় পাবার কিছুই নেই। কুৎসাই যার উপজীব্য, তার দল অচিরে ভাঙ্গবে, তার বল শীঘ্রই ক্ষয় পাবে, তার বিত্ত অপব্যয়িত হবে, তার ঐক্য থাক্‌বে না, তার উগ্রতা নিজেকেই নিজে ধ্বংস কর্ব্বে। কুৎসা শুনে ভয় পেও না, নিজের কর্ত্তব্য খুব সুস্থির চিত্তে ক'রে যেতে থাক। পরিণামে জয় তোমার।

নামজপের সাত্ত্বিক মনোভঙ্গী

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নামজপের একমাত্র উদ্দেশ্যই হওয়া উচিত, ভগবানের প্রীতি-সম্পাদন এবং ভগবৎ-প্রীত্যর্থে আত্ম-সমর্পণ। আমি ভগবানের সুখসম্পাদনের জন্যই ভগবানের পায়ে নিজেকে বিকাব এবং নিজেকে বিকাব ব'লেই অবিরাম তাঁর নাম কর্ব্ব। এই হ'ল নাপজপের সাত্ত্বিক মনোভঙ্গী।

নামজপের বিকৃত মনোভঙ্গী

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু নামজপের অনেক বিকৃত মনোভঙ্গীও আছে। যথা, তুমি মান চাও, এজন্য নামজপ কর। কিম্বা তুমি কারো প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ আছ, তার উপরে তোমার প্রতিহিংসা যেন সফল হয়, এই উদ্দেশ্যে নামজপ কর। অথবা তুমি কারো উপরে নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তি খাটাবার উদ্দেশ্যে, তাকে বশীকরণ করার মতলবে নামজপ কর। নামজপের এই সকল মনোভঙ্গী অতীব বিকৃত এবং অসুন্দর। সূক্ষ্মভাবে দেখ্‌তে গেলে, এসব উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত নাম-জপেরও গৌণ আধ্যাত্মিক সুফল আছেই আছে। কেননা, সৎ, অসৎ বা উদাসীন যে উদ্দেশ্যেই নাম-যজ্ঞের অনুষ্ঠান হোক্‌, ফলদাতা যজ্ঞেশ্বর পরমাত্মা তার ভিতর দিয়েই তাঁর প্রেমের পরমামৃত একদা না একদা দেবেনই

দেবেন। "যশো দেহি, দ্বিষো জহি—যশ দাও, শত্রুকে ধ্বংস কর",—এই প্রার্থনা কত্তে কত্তেও একদা প্রাণে বিমল ভগবৎ-প্রেমের আবির্ভাব হয়ই। কিন্তু বড় বিলম্বে, বড়ই ঘুরে ঘুরে, একেবারে পথশ্রান্ত শ্রমক্লান্ত ঘর্ম্মাক্তকলেবর হ'য়ে। বস্তু-বিশেষের প্রাপ্তি-লোভে যদি কেউ নামজপ করে, তাহ'লে নামের সঙ্গে আসক্তিকে যুক্ত করা হ'ল। প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্যে যদি কেউ নামজপ করে, তাহ'লে নামের সঙ্গে দ্বেষকে যুক্ত করা হ'ল। ইন্দ্রিয়-লালসার পরিতৃপ্তির উদ্দেশ্যে যদি কেউ নামজপ করে, তাহ'লে নামের সঙ্গে কামকে যুক্ত করা হ'ল। নাম নিষ্কলুষ নিষ্কলঙ্ক বস্তু,—এ সবে নামের কিছুই ক্ষতি হয় না বটে, কিন্তু নামকে অসদুদ্দেশ্যে বা হীন উদ্দেশ্যে নিয়োগ করার দরুণ আমার সাত্ত্বিক মনোভিনিবেশের ক্ষমতা ক্রমশঃ ক'মে যাবে। এটা আমার পক্ষে এক নিদারুণ ক্ষতি। নাম হচ্ছেন অবদান-কল্পতরু। নামের সেবা একনিষ্ঠ ভাবে কর্লে সাংসারিক বাসনাও পূর্ণ হয়—লোভীর লোভনীয় বস্তু, কামীর কামনীয় বস্তু নামের বলে পাওয়া যায়। উপার্জ্জনের জন্য শ্রম কর্লে যেমন অর্থ মিলে, শ্রম ছেড়ে দিয়ে শুধু নাম কর্লেও তেমন অর্থ মিলে। ঘটকের দ্বারা চেষ্টা করালে যেমন সুন্দরী পাত্রী বা সুরূপ সুকান্ত বর মিলে, ঐ জাতীয় চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে শুধু নাম ক'রে গেলেও তেমন তা' মিলে। পার্থিব এবং বাহ্যিক পরিশ্রমের ফলে যা' যা' জীবের মিলে, শুধু নামজপ ক'রে গেলেও তা' তা' মিলে। তবু এসব

প্রয়োজনে নাম-সেবারূপ পবিত্র কার্য্যের ব্যবহার উচিত নয়। কেননা, তাতে ভবিষ্যতে নামসেবাকে নামসেবার প্রকৃত উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করার পথে মানসিক কতকগুলি প্রবল বিরুদ্ধ সংস্কার সৃষ্ট হ'য়ে থাকে। এসব সংস্কারকে ক্ষয়িত ক'রে নিয়ে আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হ'তে অনেক সময়, অনেক শ্রম, অনেক অধ্যবসায় বৃথা ব্যয়িত কত্তে হয়। বিষ্ঠার ভাণ্ডের ভিতরেও যদি সোণার চাকতীকে ফেলে দাও, সোণা সোণাই থাকবে, কিন্তু তাকে তার প্রকৃত কাজে লাগাতে হ'লে আবার বিষ্ঠার চিহ্ন ও গন্ধ দূর করার জন্য খাট্‌তে হয়। এই কারণেই নাম-সেবাকে একমাত্র ভগবৎ-প্রীত্যর্থেই প্রয়োগ করা ভাল।

বিপদুদ্ধার-মানসে নামজপ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বিষম দুঃখে প'ড়ে দুঃখ বিদূরণের জন্য, বিষম লাঞ্ছনার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য, বিষম আতঙ্কে প'ড়ে নিরাতঙ্ক অভয় লাভ করার জন্য, পাপের পল্বলে ডুবে তা' থেকে নিজেকে উদ্ধার করার জন্য, নিদারুণ ষড়যন্ত্রে পড়ে নিজেকে তা' থেকে বাঁচাবার জন্য কেউ যদি অবিরাম নাম-জপ করে, তবে কি তা অন্যায় হবে? তা' নিশ্চয়ই অন্যায় হবে না এবং তা ছাড়া তোমার আমার মত সাধারণ জীবের উপায়ই বা কি আছে? পাপ-প্রবৃত্তির চরিতার্থতার উদ্দেশ্যে নামজপ করা নিশ্চয়ই জঘন্য

কিন্তু অতীত অভ্যাসের বশে পাপের হাতে যে জন ক্রীড়নক হ'য়ে পড়েছে, যার নিজ স্বাধীন সত্তা, স্বাধীন মত, স্বাধীন কর্ম্ম করার শক্তি, স্বাধীন রুচি, স্বাধীন প্রবৃত্তি, স্ববশ অবস্থা, আত্মস্থ দৃঢ়তা সম্যক্ নষ্ট হয়ে গেছে, তার পক্ষে পাপে আসক্ত থাকতে থাক্‌তেও তার সঙ্গে সঙ্গে নামজপ ক'রে ক'রে প্রাক্তনের অধিকার বিনষ্ট করার চেষ্টা ছাড়া সদুপায় জগতে কি আছে? ইচ্ছা কর সাধু হ'য়ে চল্‌তে, কিন্তু সুযোগটী সম্মুখে আসা মাত্র নিজের অজ্ঞাতে মায়ের কাণের সোণা পর্য্যন্ত চুরী ক'রে ফেল এমন দুর্গতি যদি তোমার হয়, তবে তুমি চুরী কত্তে কত্তেও নামই জপে যাবে এবং নামের কৃপায় কবে কি ভাবে তোমার চুরীর সুযোগ আপনি কম্‌তে থাক্‌বে, চুরীর স্বভাব আপনি বদলাতে থাক্‌বে, এই প্রতীক্ষা ছাড়া তোমার আর গত্যন্তর কি? বিপদুদ্ধার-মানসে যে নামজপ, তা' যদি কেউ প্রলোভনের দাসরূপেও ক'রে যায়, তবে তাকে জঘন্য বলা অন্যায়। বরং তাকে সমর্থন করা উচিত।

সর্ব্বাবস্থায় নাপজপ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নামকে সর্ব্বান্তর্য্যামী ভগবানের ধ্বনিময়ী মূর্ত্তি ব'লে গণনা কর্ব্বে। ভগবান্ যেমন বিষ্ঠায় ও চন্দনে, স্বর্গে ও নরকে, ভালতে ও মন্দে সব কিছুতে আছেন,

তোমার নৈতিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক কুশলের দিকে লক্ষ্য রেখে, তোমার পরমপদ লাভের উদ্দেশ্যকে সজাগ রেখে তেমনি তুমি তোমার সকল কিছু আচরণে, সকল পুণ্যে, সকল পাপে, সকল শুভে, সকল অমঙ্গলে, সকল অতৃপ্তিতে, সকল পরিতৃপ্তিতে, সকল সুখে, সকল দুঃখে, সকল নিশ্চিন্ততায়, সকল উদ্বেগে অবিরাম ভগবানের পরমপবিত্র নাম স্মরণ কত্তে থাক, প্রেমভরে বিশ্বাস সহকারে অনুক্ষণ নাম জ'পে যাও। এতে পরিণামে অবিমিশ্র কুশলই তোমার লাভ হবে।

নাম পতিত-পাবন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—লালসাতুর অবস্থাতেও অবিরাম যে নাম জপে যায়, সে নামের ফলে পুণ্যময়ী প্রজ্ঞা লাভ করে। যাকে সে পাপ ব'লে বুঝ্‌ত না, তাকে পাপ ব'লে ক্রমশঃ অনুভব কত্তে থাকে। পাপকে আগে জীব-মাত্রেরই স্বাভাবিক কার্য্য ব'লে মনে হ'ত, কিন্তু নাম-জপের ফলে পাপকে প্রকৃতই পাপ এবং সত্য সত্যই বর্জ্জনীয় ব'লে সে উপলব্ধি কত্তে থাকে। নামজপ অবিরাম এবং ধারাবাহিক ভাবে ক'রে যাওয়ার ফলে পাপকে পাপ ব'লে দৃঢ় হ'তে দৃঢ়তর প্রত্যয় তার জন্মে এবং এই প্রত্যয় থেকেই পাপ-দমনের সঙ্কল্প তার সৃষ্ট হয়। আরো নাম জ'পে যাও, এই

সঙ্কল্প প্রবল থেকে প্রবলতর হবে এবং ক্রমশঃ তোমাকে পাপ থেকে উদ্ধার ক'রে আন্‌বে। জান্‌বে, নাম পতিতপাবন মহাবস্তু।

নামের আস্বাদন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নামজপ যখন সাত্ত্বিক উদ্দেশ্যে সাত্ত্বিক ভঙ্গীতে চলে, তখন তার অপূর্ব্ব আস্বাদন অনুভবে আসে। নাম কত্তে কত্তে শ্বাস-প্রশ্বাস মধুময়, প্রীতিময়, স্বাদু বোধ হয়,—এমনকি রসনাতেও স্বাদুতা আসে। প্রথম যখন শ্বাস-প্রশ্বাসে নাম জপ কচ্ছ, তখন প্রায়শই হয় আসে বিরক্তি, নয় আসে অস্বস্তি, নয় আসে অবসাদ, নয় আসে ক্লান্তি, নয় আসে শ্বাস-ক্লেশ, নয় আসে অনিচ্ছা, অরুচি ও অপ্রবৃত্তি। কখনো মনে হয় যেন বুকের উপরে পাষাণ-ভার চাপান হয়েছে, শ্বাস টান্‌তে প্রশ্বাস ছাড়্‌তে যেন জান বেরিয়ে যেতে চায়। সে সব অবস্থায় শ্বাস-প্রশ্বাসের উপরে বলপ্রয়োগ না ক'রে খুব পরিমিত ভাবে অল্প অল্প সময় নির্দ্দিষ্ট লগ্নে নাম জপ অভ্যাস কত্তে হয়। কিন্তু নামের গুণেই ক্রমশঃ নামজপের বাধা দূর হ'য়ে যেতে থাকে এবং তখন অরুচি গিয়ে রুচি আসে। অস্বস্তি গিয়ে স্বস্তি আসে, অবসাদ গিয়ে উৎসাহ আসে, বিরক্তি গিয়ে আসক্তি আসে। কিন্তু তারও অগ্রবর্ত্তী অবস্থা হচ্ছে মধুস্বাদের অবস্থা। শ্বাসপ্রশ্বাসকে বাধা ব'লে

মনে না হ'য়ে মনে হয় বন্ধু ব'লে, এমন বন্ধু, যার সঙ্গ ছেড়ে থাক্‌তে প্রাণে মানে না, অবিরাম শ্বাসের সঙ্গই কেবল কত্তে ইচ্ছা হয়, ক্ষীরের মত স্বাদ, সরের মত স্বাদ, ননীর মত স্বাদ, ফুলের মত গন্ধ, ধূপের মত গন্ধ, চন্দনের মত গন্ধ যেন অনুভূত হয়। যত তখন নাম কর্ব্বে, ততই কেবল নাম কত্তে মন চাইবে, ক্লান্তি নেই, শান্তি নেই, ভ্রান্তি নেই। জীব নাম ভুলে যায় কেন জানো? ভালো লাগে না ব'লে। যে জিনিব মিষ্টি লাগে, তাকে কি মানুষ ভুলে থাক্‌তে পারে? এই সময়ে নাম লাগে বড়ই মিষ্টি, বড়ই মধুর এবং পরমলোভনীয়। এই অবস্থাটী এলেই বুঝ্‌বে যে এতদিনে তোমার সাধন সুরু হ'ল, এতদিনে গুরুকৃপা এল।

গুরু-কৃপা

প্রশ্নকর্ত্তা জিজ্ঞাসা কল্লেন,—দীক্ষামাত্রই কি গুরুকৃপা হয় না?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—হয় এবং তার জন্যই ত' বলেছি "গুরুকৃপা এল"। "গুরুকৃপা হ'ল",—একথা ত' বলিনি। দীক্ষা পর্য্যন্তও অপেক্ষা নেই বাবা, গুরুর স্নেহের দৃষ্টি পড়া মাত্রেই গুরুকৃপা সুরু হ'ল। কিন্তু তুমি যদি সাধন না কর, গুরুকৃপা এসে তোমার কাছে পৌঁছে কি ক'রে? নানারূপ প্রচ্ছন্ন সংস্কারে তোমার দেহমনের চতুর্দ্দিকে যোজন-

ব্যাপী জঞ্জাল জমিয়ে রেখে দিয়েছ। সেই জঞ্জাল অপসারিত না হ'লে তুমিও উপলব্ধি কর্ব্বে কি করে? গুরু শাশ্বত সনাতন, তাঁর কৃপাও শাশ্বত সনাতন। সেই কৃপা একবার হ'লে তার আর ক্ষয় নেই। গুরুকৃপা ধ্বংসহীন, অবিনশ্বর বস্তু। কিন্তু বটগাছটার চতুর্দ্দিকে যদি ধোঁয়া জমিয়ে রাখ, এমন প্রখর সূর্য্যটার আলোও কি কিছুক্ষণ থম্‌কে দাঁড়ায় না? গুরুকৃপার অবস্থাও কতকটা তাই। তুমি যদি অবিরাম নাম জ'পে যাও, পলকহীন নেত্রে যদি দাও নামের পানে লক্ষ্য, অভিনিবিষ্ট শ্রবণে যদি দাও নামের ধ্বনিতে মন, তাহ'লে শত-শতাব্দী-সঞ্চিত সংস্কারের জঞ্জাল, সহস্র-জন্ম-অর্জ্জিত সংস্কারের বিপত্তি, সব দূর হ'য়ে গিয়ে নামের আস্বাদকে তোমার অভিগম্য ক'রে দেবে, গুরুকৃপা দেহে-মনে-প্রাণে আবির্ভূত হবে।

নামে লগ্ন রহ

দ্বিপ্রহরে বসিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি প্রায় কুড়ি পঁচিশ খানা পত্র লিখিলেন। পাণ্ডুলিপির কীটদষ্ট অবস্থা হেতু আমরা তাহার পাঠোদ্ধার করিতে পারি নাই।

একখানা পত্রে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা এবং দৃঢ়তার সহিত প্রতীক্ষা কর। নামে নির্ভর কর। নামের শক্তি জীবনের উপরে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য অবিশ্রাম নামে লগ্ন রহ।"

বিগ্রহের জাগরণ

বেলা দুই ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবামণি আসাম ব্যবস্থা-পরিষদের প্রেসিডেন্ট রায়বাহাদুর নলিনীনাথ রায় দস্তিদারের ভবনে আনীত হইলেন। শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ রায় দস্তিদার নিজেদের কুলদেবতার বিগ্রহ প্রদর্শন করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, এই বিগ্রহ জাগ্রত কি না।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বিগ্রহ জাগেন ভক্তের একাগ্রতায়। নইলে ত' বিগ্রহকে ইট, কাঠ, পাথর ছাড়া আর কিছুই মনে করা যায় না। যিনি যেখানে ভক্তি সমর্পণ করেছেন, তিনি সেখানে সমগ্রটুকু অস্তিত্বকে ডুবিয়ে দিন, মনে প্রাণে অনন্যশরণ হোন্। তখন দেখিবেন, সত্যই এ বিগ্রহ জাগ্রত, নিদ্রিত নন।

সংসার-সুখ আলুনি লাগে না কেন

অপরাহ্ণ তিন ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবামণি মুরারিচাঁদ গবর্ণমেন্ট কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র সেনগুপ্তের ভবনে শুভাগমন করিলেন।

সুরেশবাবু বলিলেন,—অতি দীর্ঘকাল ধ'রে সংসারের সুখ আস্বাদন ক'রেও সংসার আলুনি লাগে না কেন, আসক্তি কমে না কেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সংসারের সুখ যে নিতান্ত অনিত্য, একথা জানেন না, বুঝেন না ব'লেই এই অকিঞ্চিৎকর সুখেও এত আসক্তি। সংসারকে অতিবৃদ্ধা জরতী নারীর মত প্রত্যাসন্ন-মৃত্যু ব'লে অনুক্ষণ চিন্তা করুন। আসক্তি ক'মে যাবে। যাকে দিয়ে যার আকর্ষণ, তাকে দিয়ে যে তার ধ্বংস, বেদনা ও মনস্তাপ, একথা স্মরণ রাখুন। আসক্তি ক'মে যাবে।

অপরাহ্ণ ঠিক চারি ঘটিকায় রাজা গিরিশচন্দ্র হাইস্কুলে শ্রীশ্রীবাবামণির চতুর্থ বক্তৃতা সুরু হইল। বক্তৃতা দিতে উঠিবার কিছু পূর্ব্বে জনৈক বিশিষ্ট শ্রোতা শ্রীশ্রীবাবামণিকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, গত অপরাহ্ণে তিনি ভদ্রকন্যার নৃত্য-বিলাস সম্পর্কে যে মন্তব্য করিয়াছিলেন, তাহার যুক্তিসঙ্গত সমর্থন কি। শ্রীশ্রীবাবামণি সর্ব্বশাস্ত্র ও ইতিহাস উদ্ঘাটন করিয়া তাহার সমর্থন দেখাইতে লাগিলেন। এই ঐতিহাসিক বক্তৃতার পূর্ণ বিবরণ সঙ্গে সঙ্গেই লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু গ্রন্থ-মুদ্রণ-কাল পর্য্যন্ত তাহা আমরা অন্বেষণ করিয়া বাহির করিতে পারি নাই।

অদ্য বক্তৃতা দুই ঘণ্টা পয়তাল্লিশ মিনিট হইল। অদ্যকার বক্তৃতার ভাব, তথ্যসংগ্রহ এবং অনর্গলতা শ্রোতাদের শুধু মন্ত্রমুগ্ধই করে নাই, বিস্মিত এবং স্তম্ভিতও করিয়াছে।

শ্রীহট্ট

বুধবার, ২রা মাঘ, ১৩৪১

(১৬ই জানুয়ারী,১৯৩৫)

গতকল্য অপরাহ্ণে শ্রীশ্রীবাবামণি রাজা গিরিশ চন্দ্র হাইস্কুলে তাঁহার চতুর্থ বক্তৃতা দিয়াছেন। সনাতনী-ভাব-সম্পন্ন ব্যক্তিরা শতকরা একশত জনে শ্রীশ্রীবাবামণির প্রতিটি বাক্য মনে প্রাণে সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু প্রগতি-বাদী কেহ কেহ মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছেন। অদ্য প্রাতঃকালে শ্রীহট্ট কলেজের জনৈক অধ্যাপক প্রগতি-বাদী ভদ্রলোকদের তীব্র আপত্তিপূর্ণ মনোভাবের কথা জ্ঞাপন করিলেন।

প্রগতি ও অধোগতি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রগতির মানে প্রকৃষ্ট গতি, উন্নতির দিকে অগ্রগমন, কিন্তু ইহমুখ চিত্ত নিয়ে বর্ত্তমান যুবক-যুবতীরা যা-কিছু কচ্ছেন, তার সবই যে প্রকৃষ্ট গতি নিচ্ছে, তা' নয়, তার মধ্যে অনেক কিছু অধোগতির প্ররোচক হয়েছে এবং হচ্ছে। এঁরা পছন্দ করুন আর না করুন, অধোগতির প্রতিবাদ আমাদের কত্তেই হবে।

প্রশ্ন।—প্রগতি হচ্ছে, না অধোগতি হচ্ছে, তা বুঝব কি ক'রে?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—অন্তরের সুনির্ম্মল আত্মপ্রসাদ দিয়ে,

হৃদয়ের নিষ্কলুষ প্রসন্নতা দিয়ে। যে অনুষ্ঠান আত্ম-প্রসাদ আর প্রসন্নতা দেয় না, তা কখনও প্রগতিবর্দ্ধক হবে না। হুজুগ আর প্রগতি এক কথা নয়।

ভক্তের নৃত্য এবং কামুকের নৃত্য

অধ্যাপক মহাশয় প্রস্থান করিলে কতিপয় ছাত্র নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

একজন বলিলেন,—বিদ্যা হিসাবে নৃত্য কি অপরাধ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অপরাধ নয়, কিন্তু ভগবদ্‌ভক্ত প্রেমিকের হরিনাম-কীর্ত্তন-কালীন নৃত্যের যা' প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ফল, রঙ্গমঞ্চে লীলালাস্য-পরিবেশনোদ্দেশ্যকালীন নৃত্যের তা হবে না। নৃত্য হচ্ছে অন্তরের উচ্ছ্বসিত আনন্দের বহিঃপ্রকাশ। এ আনন্দ যখন ভগবৎ প্রেমোত্থ, তখন এর দ্বারা তপ্ত ধরণী শীতল হয়, দগ্ধ হৃদয় স্নিগ্ধ হয়। এ আনন্দ যখন ইন্দ্রিয় সুখ-লিপ্সার অন্ধ প্ররোচনায় জাগরিত, তখন এর দ্বারা চখের নেশা, চর্ম্মের নেশা, শ্রবণের নেশা, স্বাদের নেশা, জড় ইন্দ্রিয়ের ক্ষণিক সুখ-লোভাতুরতার পরিণাম-দুঃখদ অতি পামর ও কুরুচিগ্রস্ত নেশা জেগে ওঠে, শান্তিশীলকে সে অশান্ত করে, ধীরবুদ্ধিকে সে অধীর করে, তেজস্বীর সে তেজোহ্রাস করে, বলীয়ানের সে বলক্ষয় ঘটায়। মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমমধুর নৃত্যের সাথে তোমরা

ক্ষুদ্র সুখের পিপাসু, ক্ষুদ্র লোভের দাস, ক্ষুদ্র লোভের ক্রীড়নক কতকগুলি অগঠিত-জীবন ও উদ্দেশ্যহীন যুবক-যুবতীর নৃত্যকে তুলনা কত্তে যেও না। নৃত্য-বিলাস প্রদর্শনের দ্বারা বিপরীত-লিঙ্গী ব্যক্তিদের প্রশংসা আকর্ষনের যে চেষ্টা, সেটাও অধিকাংশ সময়েই এক প্রকারের প্রচ্ছন্ন কাম।

পল্লীর উন্নতি

অতঃপর পল্লীর উন্নতি সম্পর্কে কথা হইতেছিল।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পল্লীর উন্নতি-সাধন কথাটার প্রকৃত মানে হচ্ছে পল্লীর প্রত্যেকটী নরনারীর আত্মোৎকর্ষ বিধান করা। পল্লীর রাস্তাঘাট ভাল হ'ল, বিদ্যুতের আলো আর কলের জল হ'ল, এসব পল্লীর পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক, সন্দেহ নেই। কিন্তু এ সব বাইরের উন্নতিই পল্লীর প্রকৃত উন্নতি নয়। ধৌত ও পরিষ্কৃত জামা-চাদরের নীচেও অশুচি অপরিচ্ছন্ন শরীর ঘৃণাবর্দ্ধকই হয়। রাস্তা, ঘাট, দালান, পার্ক এসব হচ্ছে পল্লীর জামা-চাদর। পল্লীর মানুষগুলি হচ্ছে পল্লীর দেহ এবং প্রাণ। এই দেহ এবং প্রাণের উৎকর্ষ-সাধনই হচ্ছে প্রকৃত প্রস্তাবে পল্লীর উন্নতি।

পাঠ-চক্র ও আত্মোৎকর্ষ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বিদ্যালয় স্থাপন পল্লীর প্রকৃত

উন্নতির সহায়ক। কিন্তু সকলেই বিদ্যালয়ে যেতে পারে না বা সেই বয়স নেই। কারো বা প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে বিদ্যালয়ে যাওয়ার ফুরসুৎ হয় না। এজন্য প্রত্যেক পল্লীতে একটী ক'রে পাঠচক্র স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন। সমভাবে অনুপ্রাণিত গ্রন্থকর্ত্তাদের কতকগুলি গ্রন্থ আগে বেছে নিতে হবে এবং সেই গ্রন্থগুলিকে একটার পর একটা ক'রে প'ড়ে যেতে হবে। একজন সু-পাঠক সমস্ত মনঃপ্রাণ ঢেলে দিয়ে গ্রন্থ পাঠ কর্ব্বেন। অপরেরা মন দিয়ে তার মর্ম্ম গ্রহণ কত্তে চেষ্টা কর্ব্বেন। সপ্তাহে একটী নির্দ্দিষ্ট দিন বা দুই দিন এই পাঠের অনুষ্ঠান কত্তে হবে। দেবতার মন্দিরে প্রবেশ-কালে যেরূপ ভক্তি-বিনম্র ভাব নিয়ে ভক্তেরা প্রবেশ করেন এবং দেবতার পায়ে অঞ্জলি ঢেলে দেবার কালে প্রাণে যে-জাতীয় সাত্ত্বিক ভাব থাকে, পাঠ-চক্রে প্রবেশ-কালে এবং পাঠ-কালে বা শ্রবণ-কালে সেইরূপ ভাব অন্তরে পোষণ একান্ত কর্ত্তব্য হবে। কেননা, এর ফলে আত্মোৎকর্ষ-বিধান অতীব সহজ হবে। গভীর শ্রদ্ধা অন্তরের ভাবকে এমন মহিমায় মণ্ডিত করে যে, অল্প অনুশীলনেই দীর্ঘ অনুশীলনের ফল পাওয়া যায়। সুগভীর শ্রদ্ধা ভাবকে মজ্জাগত এবং স্বভাবভুক্ত ক'রে দেয়। এই জন্যই পাঠ-চক্রের অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধার গভীরতা এত আবশ্যক।

শ্রদ্ধার শক্তি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বই ত' অনেকেই পড়ে বা শোনে, কিন্তু জীবন ভ'রে কাজের মত কাজ করে কৈ? করার অক্ষমতা এর কারণ। শ্রদ্ধা হচ্ছে কর্ম্মের মেরুমজ্জা। ভাব কর্ম্মের প্রবর্ত্তক কিন্তু শ্রদ্ধা কর্ম্ম এবং ভাবের মধ্যে অভেদ-সম্বন্ধ স্থাপনের ব্যবস্থা করে। কাব্যের ভিতরে ভাব আছে, জীবনের ভিতরে কর্ম্ম আছে কিন্তু কার্য্য ও জীবনকে অভিন্ন বা ওতপ্রোতভাবে অবিচ্ছেদ্য ক'রে দেয় শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধার এই শক্তিকে অস্বীকার ক'রে জগতে কোনো বড় কাজ করা সম্ভব নয়।

বড় কাজ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আয়তনে বড় হ'লেই কোনও কাজ বড় হয় না, গভীরতায় বড় হ'লেই তা বড় হয়। বড় কাজের ফল সুদূরবিসর্পী। সুতরাং শ্রদ্ধাকে এনে আগে তোমাদের ভাবের ঘরে বসাতে হবে। একথা কোনও প্রকারেই বিস্মৃত হ'য়ো না।

কথার ধ্যান

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পাঠচক্রে যে বইখানা পড়বে, তার প্রত্যেকটী কথা সমগ্র অন্তর দিয়ে যাচাই ক'রে নিতে

চেষ্টা করবে এবং যেটুকু গ্রহণীয় ব'লে মনে হবে, তাকে নিজ জীবনে স্বীকার ক'রে নেওয়ার সময়ে ভাবের ঘরে এক কণাও ফাঁকি রাখবে না। ভাবে যার ফাঁকি থাকে, কর্ম্মেও তার ফাঁকি এসে যায়,—চাইলেও আসে, না চাইলেও আসে। অবিরুদ্ধবুদ্ধি সমভাবের ভাবুকেরা সব একত্র হবে এবং সদগ্রন্থ থেকে সদুপদেশ নিয়ে নিজ নিজ জীবনে তাকে প্রতিফলন দেবার জন্য চেষ্টা কর্ব্বে। সৎকথা শুনলেই শুধু হবে না, কথাকে ধ্যান কত্তে হবে। সৎকথা শুনে তার চিন্তা অনেকেই করে, কিন্তু ধ্যান কজনে করে? অবিচ্ছেদ-তৈল-ধারা-বৎ এক এক দিন এক একটা সৎকথাকে অবিরাম চিন্তা কত্তে থাকার নাম হচ্ছে সৎকথার ধ্যান। কথার ধ্যান থেকেই কর্ম্মের জন্ম হয় এবং এই ধ্যান যার যত সুনিবিষ্ট হয়, তার কর্ম্ম তত দৃঢ়, সুনির্দ্ধারিত ও উদ্দেশ্য-সাধক হয়।

জড় উন্নতি ও আত্মিক উন্নতি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পল্লীর প্রত্যেকটী নরনারী কথায়, কর্ম্মে, ভাবে অতুলন হৌক, এইটীই হবে তোমাদের প্রধান কামনা। পল্লীর পথ, ঘাট, জল, বিদ্যুৎ এসব যেন সেই প্রধান কামনারই সেবা করে। জড় উন্নতির প্রয়োজন আছে কিন্তু সেই উন্নতি নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির সেবিকা বা পদ-সংবাহিকা-রূপেই যেন আত্মপ্রকাশ করে।

ঐহিক উন্নতির মত্ততা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ঐহিক উন্নতির একটা অবাঞ্ছনীয় মত্ততা আছে। ধনবান্ দরিদ্রকে ঘৃণা করে, রূপবান্ রূপহীনকে অবজ্ঞা করে। ব্যক্তি সম্পর্কেও একথা খাটে, গ্রাম সম্পর্কেও খাটে। ধন-সমৃদ্ধ গ্রাম দরিদ্র পল্লীকে ঘৃণা করে, হর্ম্ম্যমালা-পরিশোভিত গ্রাম পর্ণকুটীরাকীর্ণ পল্লীকে অবজ্ঞা করে। ঐহিক উন্নতি নিতান্তই আত্ম-কেন্দ্রিক,—নিজেকে নিয়ে থাকা, নিজেকে নিয়ে ভাবা, একমাত্র নিজের জন্য করা, নিজের সুখ-সম্পদ, নিজের আমোদ-প্রমোদ, নিজের খেলাধূলা ছাড়া অপরের কথা না ভাবা ঐহিক উন্নতির এক বিষসঙ্কুল পরিণাম। কেবল নিজেরই সুখ বাড়াও, অপরের দিকে তাকিও না, যদিও আর সম্পদের প্রয়োজন নেই, তবু সহস্র জনকে লুণ্ঠন ক'রে আরো সম্পদ নিজের কুক্ষিভুক্ত কর, এই হচ্ছে ঐহিক উন্নতির এক নিদারুণ চরিত্র।

আত্মিক উন্নতির ধর্ম্ম

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু আত্মিক উন্নতির ধর্ম্ম এর ঠিক বিপরীত। আত্মিক উন্নতি দীন ও ধনীর ভিতরে সামঞ্জস্য স্থাপন করে, পশুরাজ আর সারমেয়ে বন্ধুত্ব স্থাপন করায়। এর স্বভাবই হচ্ছে পর-কেন্দ্রিক। নিজের সুখের চাইতেও পরের সুখের কথা বেশী ভাবা হচ্ছে আত্মিক

উন্নতির প্রধান লক্ষণ। আত্মিক উন্নতিরও মত্ততা আছে, কিন্তু সে মত্ততা কেবল নিজের সমৃদ্ধি বাড়াবার দিকে নয়, সেই মত্ততা জগতের সকলের সুখ, সম্পদ, সমৃদ্ধি ও শান্তি-বর্দ্ধনের দিকে।

পূর্ণ মানুষের বসতি

পরিশেষে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ঐহিক উন্নতির সাথে আত্মিক উন্নতির সামঞ্জস্য যেখানে স্থাপিত হয়েছে, বর্ত্তমান যুগের দৃষ্টিভঙ্গীতে সেইখানেই পূর্ণ মানুষের বাস। প্রত্যেকটী পল্লীকে পূর্ণ মানুষে পরিপূর্ণ কর। তাতেই হবে পল্লীর উন্নতি।

মৃত্যুর পর

অপরাহ্ণ সাড়ে তিন ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবামণি পাবনার অবসর-প্রাপ্ত জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট রায়-বাহাদুর রমণীমোহন দাশের বাড়ীতে আসিলেন। একজন প্রশ্ন করিলেন,—মৃত্যুর পরে মানুষের কি অবস্থা হয়?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মৃত্যুর মানে দেহের পতন। আত্মার ত' মৃত্যু নেই। আত্মা অজর অমর। দেহ-পতনের পরে নিজ নিজ কর্ম্ম সংস্কারগুলিকে নিয়ে অনেক ক্ষেত্রে আত্মা বিব্রত হ'য়ে পড়েন। যাঁর সংস্কারসমূহর শুভ, যিনি দেহাবস্থানকালীন নিজেকে আর দেহকে এক ব'লে ভ্রম

করেন নি, যিনি দেহকে বিহিত কর্ত্তব্যে নিয়োজিত ক'রে দিয়ে আত্মাকে সব-কিছুতে অনাসক্ত দেখেছেন, তিনি মৃত্যুর পরেও নির্ব্বিকার শান্তি আস্বাদন করেন। আর যিনি দেহকেই আত্মা ভেবে দেহের পরিতৃপ্তির জন্য লালসায় অন্ধ হ'য়ে নানা কল্পিত সুখের পশ্চাদ-ধাবন ক'রে বেড়িয়েছেন, তিনি দেহ-পতনের পরেই দেহ-বাস-সুলভ সংস্কার-সমূহকে আত্মার গায়ে আঠার মত লগ্ন দেখ্‌তে পান এবং ক্ষুধা, তৃষ্ণা, লোভ, লালসা প্রভৃতির কারণ বিদ্যমান না থাকা সত্ত্বেও এই সকল সংস্কারের জ্বালায় অনুক্ষণ জ্বলে মরেন।

প্রশ্ন।—এ থেকে পরিত্রাণের উপায়?

শ্রীশ্রীবাবামণি—কাল সর্ব্বদুঃখহারী। জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে আপনি সব সংস্কার যথাকালে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

প্রশ্ন।—পুনরায় জন্মগ্রহণের পূর্ব্বেই কি তা ক্ষয় পায়?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—ঈশ্বরেচ্ছায় কি না সম্ভব হয়? কারো পায়, কারো পায় না। যাদের সংস্কার ক্ষয় পায় না, তাদের সংস্কারের ক্ষয় হয় এসে পরবর্ত্তী জন্মে দুঃখ ভুগে।

দেহ আর তুমি এক নও

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু মৃত্যুর পরে কি হয় না হয়, তার দুশ্চিন্তা না ক'রে, দেহ থাকতে থাক্‌তেই নিজের কাজ কামাল ক'রে নাও। নিজেকে দেহের সঙ্গে এক

ভেবেই ত' যত বিপদ আমরা করি। অবিরাম চিন্তা কর, দেহ আর তুমি এক নও। অবিরাম চিন্তা কর, দেহ ঈশ্বরের পবিত্র আদেশ-সমূহ পালনের জন্য সৃষ্ট। এই চিন্তা যতই গভীর হবে, দেহ ততই ঈশ্বর-মুখী হবে, দেহ ততই তোমার আত্মিক কুশলের বন্ধু হবে। যতক্ষণ দেহ আছে, ততক্ষণ দেহকে লালসাহীন দৃষ্টিতে দেখ আর মনকে ঈশ্বরের পায়ে সঁপ। নিজেকে তাঁর পায়ে সঁপে দিলে তোমার ইহকাল আর তোমার পরকাল সব তিনিই দেখ্‌বেন।

আত্মসমর্পণ কঠিন ও সহজ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণ বড়ই কঠিন। কিন্তু আবার বড়ই সোজা। নিজের জ্ঞান, বিচার, বুদ্ধি ও অহমিকার গর্ব্ব যতক্ষণ আছে, কঠিন ততক্ষণ। নিজেকে তৃণাদপি তৃণ জেনে, জগতের সকল আশ্রয় থেকে বিচ্যুত একান্ত অশরণ জেনে নিজের দিকে তাকাতে গেলেই আবার অতি সহজ।

এখনি আত্মসমর্পণ কর

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু সহজ হোক আর কঠিন হোক্, আত্মসমর্পণই আমাদের পরমা গতি। একদিন না একদিন তাঁর চরণে শরণাগত হ'তেই হবে। সুতরাং অনির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যতের জন্য প্রতীক্ষা না ক'রে আজই এই মুহূর্ত্তেই

করেন নি, যিনি দেহকে বিহিত কর্ত্তব্যে নিয়োজিত ক'রে দিয়ে আত্মাকে সব-কিছুতে অনাসক্ত দেখেছেন, তিনি মৃত্যুর পরেও নির্ব্বিকার শান্তি আস্বাদন করেন। আর যিনি দেহকেই আত্মা ভেবে দেহের পরিতৃপ্তির জন্য লালসায় অন্ধ হ'য়ে নানা কল্পিত সুখের পশ্চাদ-ধাবন ক'রে বেড়িয়েছেন, তিনি দেহ-পতনের পরেই দেহ-বাস-সুলভ সংস্কার-সমূহকে আত্মার গায়ে আঠার মত লগ্ন দেখ্‌তে পান এবং ক্ষুধা, তৃষ্ণা, লোভ, লালসা প্রভৃতির কারণ বিদ্যমান না থাকা সত্ত্বেও এই সকল সংস্কারের জ্বালায় অনুক্ষণ জ্বলে মরেন।

প্রশ্ন।—এ থেকে পরিত্রাণের উপায়?

শ্রীশ্রীবাবামণি—কাল সর্ব্বদুঃখহারী। জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে আপনি সব সংস্কার যথাকালে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

প্রশ্ন।—পুনরায় জন্মগ্রহণের পূর্ব্বেই কি তা ক্ষয় পায়?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—ঈশ্বরেচ্ছায় কি না সম্ভব হয়? কারো পায়, কারো পায় না। যাদের সংস্কার ক্ষয় পায় না, তাদের সংস্কারের ক্ষয় হয় এসে পরবর্ত্তী জন্মে দুঃখ ভুগে।

দেহ আর তুমি এক নও

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু মৃত্যুর পরে কি হয় না হয়, তার দুশ্চিন্তা না ক'রে, দেহ থাকতে থাক্‌তেই নিজের কাজ কামাল ক'রে নাও। নিজেকে দেহের সঙ্গে এক

ভেবেই ত' যত বিপদ আমরা করি। অবিরাম চিন্তা কর, দেহ আর তুমি এক নও। অবিরাম চিন্তা কর, দেহ ঈশ্বরের পবিত্র আদেশ-সমূহ পালনের জন্য সৃষ্ট। এই চিন্তা যতই গভীর হবে, দেহ ততই ঈশ্বর-মুখী হবে, দেহ ততই তোমার আত্মিক কুশলের বন্ধু হবে। যতক্ষণ দেহ আছে, ততক্ষণ দেহকে লালসাহীন দৃষ্টিতে দেখ আর মনকে ঈশ্বরের পায়ে সঁপ। নিজেকে তাঁর পায়ে সঁপে দিলে তোমার ইহকাল আর তোমার পরকাল সব তিনিই দেখ্‌বেন।

আত্মসমর্পণ কঠিন ও সহজ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণ বড়ই কঠিন। কিন্তু আবার বড়ই সোজা। নিজের জ্ঞান, বিচার, বুদ্ধি ও অহমিকার গর্ব্ব যতক্ষণ আছে, কঠিন ততক্ষণ। নিজেকে তৃণাদপি তৃণ জেনে, জগতের সকল আশ্রয় থেকে বিচ্যুত একান্ত অশরণ জেনে নিজের দিকে তাকাতে গেলেই আবার অতি সহজ।

এখনি আত্মসমর্পণ কর

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু সহজ হোক আর কঠিন হোক্, আত্মসমর্পণই আমাদের পরমা গতি। একদিন না একদিন তাঁর চরণে শরণাগত হ'তেই হবে। সুতরাং অনির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যতের জন্য প্রতীক্ষা না ক'রে আজই এই মুহূর্ত্তেই

আত্মসমর্পণ কর। দেরী ক'রে যখন কোনো লাভ নেই, তখন একটী পলকও প্রতীক্ষা ক'রো না।

মনঃসমীক্ষা ও বৈষ্ণব দর্শন

অপরাহ্ণ সাড়ে চারি ঘটিকায় রাজা গিরিশ চন্দ্র হাইস্কুলে পুনরায় বক্তৃতা আরম্ভ হইল। গতকল্য নারীনৃত্যের বিরুদ্ধে সুতীব্র যুক্তিপূর্ণ কঠোর বক্তৃতা হইলেও অদ্যকার বক্তৃতার বিষয় অতীব মধুর হইল। মানুষের প্রতি মানুষের প্রেম কেন জন্মে, কেন লোপ পায়, জীবের প্রতি জীবের যে প্রেম, সেই প্রেমকে ভগবানের প্রতি প্রেমে কি ভাবে রূপান্তরিত করা যায়, ইহাই প্রধান বক্তব্য।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পাশ্চাত্যের মনঃসমীক্ষক পণ্ডিতেরা ফতোয়া দিয়েছেন যে, জগতের যত প্রেম, সবই কাম থেকে উদ্ভূত হ'য়েছে, জীবের যৌন-বোধ ও যৌন-তাড়না গিয়ে মাতৃ-ভক্তি, পিতৃ-ভক্তি, সন্তান-বাৎসল্য, বন্ধুপ্রীতি সখী-সোহাগ প্রভৃতিতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু এই যে দর্শন, এ হচ্ছে দূরবীনের উল্টো দিক্ থেকে। আমাদের দেশের বৈষ্ণব-সাধকেরা জিনিবটাকে দূরবীনের ঠিক্ ঠিক্ দিক থেকে দেখেছেন। তাঁরা দেখেছেন যে, প্রণয়বল, প্রীতি বল, কাম বল, লালসা বল, পিপাসা বল, ক্ষুধা বল, সাধ বল, আকাঙ্ক্ষা বল, সব কিছুরই উৎপত্তি ভগবৎ-প্রেমে। এক ভগবৎ-প্রেমই আধার-ভেদে রূপান্তর পেয়ে এই সকল বিভিন্ন

নাম পেয়েছে। এদের চরম পরিণতি সেই ভগবৎ-প্রেম। যেই উৎস থেকে এরা বেরিয়ে এসেছে, একদা সেই ভগবৎ-প্রেম-রূপ উৎসেই গিয়ে এদের পৌঁছুতে হবে। এই হ'ল ভারতীয়ের দৃষ্টি।

পচা ডিম

অদ্যকার বক্তৃতা এতই মধুর ও মর্ম্মস্পর্শী হইল যে বলিবার নহে। তাহার একটী কৌতুকোদ্দীপক প্রমাণ নিম্নে সন্নিবিষ্ট হইল। পূর্ণ আড়াই ঘণ্টা বক্তৃতার পরে শ্রীশ্রীবাবামণি যখন আসন পরিগ্রহ করিলেন, তখন কয়েকটী যুবক ভিড় ঠেলিয়া সম্মুখে আসিয়া উপনীত হইল। শ্রীশ্রীবাবামণির চরণে প্রণিপাত করিয়া তাহারা বলিল,—আজ আমরা আপনার গায়ে ছোঁড়্বার জন্য পচা ডিম নিয়ে এসেছিলাম, কিন্তু বক্তৃতা শুন্‌তে শুন্‌তে মনের এমন পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে যে, সে সব অন্য দিকে ফেলে দিয়ে আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিলেন।

শ্রীযুক্ত দুর্গেশ্বর শর্ম্মা বলিলেন,—বটে। এত দুঃসাহস তোমাদের। যিনি তোমাদেরই কল্যাণের জন্য জীবনপাত কচ্ছেন, তাঁর গায়ে ছুঁড়্বে তোমরা পচা ডিম?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এদের ক্ষমা করুন। এরা

অবোধ। হয়ত কারো প্ররোচনায় এমন কাজ কত্তে প্রবৃত্ত হয়েছিল। ভগবান করুণাময়, দয়া ক'রে এদের মনের গতি ফিরিয়ে দিয়েছেন। লাঞ্ছনায় আমার কি হয়? ও ত' আমার অঙ্গের ভূষণ।

দুর্গেশ্বর বাবু ছেলে কয়টীকে নিজের গাড়ীতে করিয়া বাড়ীতে নিয়া আসিলেন। নিভৃত কক্ষে ছেলেদের সহিত দীর্ঘ আলোচনার পরে তাহাদের ছাড়িয়া দিলেন। পরে বলিলেন,—জানেন স্বামীজী, এ একটা ষড়যন্ত্র। সহরের তথাকথিত প্রগতিবাদী প্রতিষ্ঠাবান্ ব্যক্তিদের প্ররোচনায় এরূপ অকার্য্য ঘট্‌তে যাচ্ছিল।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—ঘটে ত' নাই! তবে আর আফশোষ কিসের?

শ্রীহট্ট

৩রা মাঘ, মঙ্গলবার, ১৩৪১

(১৭ই জানুয়ারী,১৯৩৫)

বিবাহের পূর্ব্বে রক্ত-পরীক্ষা

শেষ রাত্রি হইতেই শ্রীশ্রীবাবামণি পত্র লিখিতেছেন। খুলনা নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তোমাদের সংস্কারে ও প্রথায় যতই আঘাত লাগুক,

বিবাহের পূর্ব্বে প্রত্যেক যুবক এবং যুবতীর এইরূপ একটা বাধ্যকর পরীক্ষার আমি পক্ষপাতী, যার দ্বারা নির্দ্ধারণ হইয়া যাইবে যে, ইহাদের কাহারও রক্তে বংশনাশক উপাদান আছে কি না। যদি তাহা থাকে, তবে তাহার পূর্ণ সংশোধন করিয়া নিয়া তবে বিবাহ অনুমোদিত হইবে। দেশে যে এত লক্ষ লক্ষ অন্ধ, আতুর, বিকলেন্দ্রিয়, বিকৃতাঙ্গ বালক-বালিকার প্রাদুর্ভাব হইতেছে, তাহার প্রধানতম কারণ দূষিত রক্তের সংগুপ্ত বিষ।

বিবাহের পূর্ব্বেই পুরুষের পৌরুষের পরীক্ষা

"বিবাহার্থী পুরুষের আরও একটী বিষয়ে পরীক্ষা একান্ত প্রয়োজন। স্ত্রীযন্ত্রের অপূর্ণতা বা অগঠিত অবস্থার দরুণ অনেক পুরুষ বিবাহ করিয়াও সেই স্ত্রীকে বর্জ্জন করিয়া থাকে। এই বর্জ্জন-ব্যাপারে তাহারা চক্ষু-লজ্জার বা বিবেকের কোনও দায়ই রাখে না। ইহা অহরহ দেখা যাইতেছে। কিন্তু স্বামীর জননাঙ্গের অপূর্ণতা জানিয়াও বহু নারী ইহাকে নীরবে সহ্য করিয়া নিতেছে। সীতা, সতী, সাবিত্রীর দোহাই তাহাদের সংস্কারের উপরে রাজত্ব করিতেছে, তাই তাহারা পুরুষ-হিসাবে-অগণ্য অঙ্গহীন স্বামীর সম্পর্কেও মুখের কথাটী উচ্চারণে অক্ষম। অনেকে ক্লীব স্বামীর সহস্র অত্যাচার ও

অকথ্য ব্যবহার নিঃশব্দে সহিয়া যাইতেছে। বহু সংসার-সুখে-ইচ্ছুকা রমণীর এই ব্যর্থতার আর্ত্তনাদ বাতাস বাহিয়া আমার কর্ণে আসিয়া পৌছিতেছে। তাই আমি মনে করিতেছি যে, বিবাহের পূর্ব্বেই প্রত্যেক পুরুষের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এই পরীক্ষার ব্যবস্থা হওয়ার প্রয়োজন রহিয়াছে যে, তাহার বিবাহ করিবার দৈহিক যোগ্যতা এবং নৈতিক অধিকার আছে কি না। নারী অহরহ বিনা দোষেও পরিত্যক্তা হইতেছে, সুতরাং তাহার দোষ থাকিলে তার জন্য কাহারও মাথা ঘামাইবার দরকার নাই, স্বামী নিজের গরজেই তাহাকে বিদায় দিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিবে। কিন্তু পুরুষের দোষে নারীর জীবন একান্ত দুঃসহ হইলেও সে সম্ভ্রম-বোধে জলাঞ্জলি দিয়া, লজ্জা-সরমে ডালি দিয়া প্রতীকার-প্রার্থিনী হইতে পারে না, হইলেও তাহাতে নট্‌খটি প্রচুর। এই কারণেই বিবাহের পূর্ব্বে প্রত্যেক পুরুষের শারীর-যন্ত্রের ক্ষমতা-অক্ষমতার সুপরীক্ষা সরকার হইতে বাধ্যকর হওয়া প্রয়োজন।

"ইহার ভিতরে ভয় পাইবার কিছু আছে বলিয়া আমি মনে করি না। পুরুষের ডাক্তারী পরীক্ষা এমন একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার নহে, যাহা সম্পর্কে আতঙ্ক থাকা সঙ্গত। পরীক্ষিতব্য যুবকের নৈতিক চরিত্রের অবমাননা করিয়া কোনও পরীক্ষার প্রয়োজন থাকিতে পারে না। তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংসারী মানবের প্রয়োজনীয় দৈহিক কর্ত্তব্য সম্পাদনে সমর্থ কি না

ইহা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন হইতেই অনায়াসে অনুমিত হইতে পারে, অঙ্গহীন বা শক্তিহীন কপটাচারী স্বামীদের দ্বারা যে রূপ অধিক সংখ্যায় সংসারী রমণীরা প্রবঞ্চিত হইতেছেন, তাহাতে আপাতদৃষ্টিতে বিসদৃশ ঠেকিলেও বিবাহার্থী পুরুষ-মাত্রেরই এইরূপ পরীক্ষায় অত্যাবশ্যকতা প্রমাণিত হইতেছে।

কন্যার পিতার খরদৃষ্টি

"আর, কন্যার পিতাদেরও সাধারণ অভিজ্ঞতা হইতেই কতকটা সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। যে সকল যুবক উৎসাহহীন, যাহারা মাকুন্দা বা গুম্ফশ্মশ্রু যাহাদের সহজে উদ্‌গত হয় না, চল্‌তি ভাষায় যাহাকে বলে 'ম্যাদামারা' সেইরূপ যাহাদের প্রকৃতি, অকারণে হাসে, অকারণে কাসে, বুদ্ধি-বিকাশ স্বাভাবিকের অপেক্ষা কম, এমন যুবকদিগকে প্রথম দৃষ্টিতেই ক্লীব বা ক্লীবতুল্য জ্ঞান করিয়া কন্যা সম্প্রদানে বিরত হওয়া প্রত্যেকের কর্ত্তব্য। যাহার বিবাহ-যোগ্যা কন্যা আছে, তাহাকে ভাবী বরের মুখ, চখ, আচরণ দেখিয়াই তাহার পুরুষোচিত সামর্থ-সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করিবার যোগ্যতা সঞ্চয় করিতে হইবে। অনেক বরের পৌরুষ নাই অথচ পশু-বিশেষের ন্যায় ক্ষেত্রে অক্ষেত্রে প্রেমের অভিনয় তাহারা করিয়া থাকে। ইহাদের এই অভিনয়-চপলতাকে পুরুষত্বের প্রমাণ বলিয়া গণনা করা নিতান্তই ভুল হইবে। কোনও প্রকারে অরক্ষণীয়া মেয়েটাকে পার করিয়া দিলাম ভাবিয়া যাহারা হাঁফ ছাড়িয়া

বাঁচিতে চাহে, অনেক ক্ষেত্রেই তাহাদিগকে চিতাশয্যায় শয়ন করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মরণাধিক আত্মগ্লানি সহিতে হয়।"

নারীর প্রতি অশুদ্ধ দৃষ্টি

অপর এক পত্র লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তুমি যে কেমন পরিবার হইতে আসিয়াছ, লোকে তাহার বিচার করিবে, নারীজাতির প্রতি সাধারণ ভাবে তোমার দৃষ্টিভঙ্গী কি প্রকার, তাহা দেখিয়া। নারীজাতির প্রতি যাহার সম্ভ্রম-বুদ্ধি নাই, এমন ব্যক্তি যে ভদ্র-বংশে জন্মে নাই, ইহাই জানিও সকল সদ্‌বংশজাত ব্যক্তিদের সাধারণ বিচার। নারীর নিন্দায় যাহারা পঞ্চমুখ, নারী-চরিত্রে যাহারা শ্রদ্ধাহীন, নারীর প্রতি আচরণ-সম্পর্কে যাহাদের কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান নাই, নারীকে যাহারা নিজেদের খেলার পুতুল মনে করে এবং তদ্রূপ কুবুদ্ধির বশে যাহারা প্রত্যক্ষ ভাবে বা পরোক্ষতঃ নারী-জীবনে পাতিত্য আনিবার ষড়যন্ত্রে সহায়তা করে, তাহারা নিজেরা ত' বর্ব্বর পশু-রূপে গণিত হয়ই, তাহাদের পিতৃকুল বা মাতৃকুলের প্রতিও লোকের কোনও উচ্চ ধারণা জন্মে না। কতকগুলি কদর্য্য উপন্যাস তোমার মনে যে বিকৃত ধারণারই সৃষ্টি করিয়া থাকুক, আমার এই কথা কয়টীকে তোমার সেই ধারণাসমূহ হইতে উচ্চতর মূল্য

দিও। নারীর প্রতি শুদ্ধ দৃষ্টি তোমার জীবনের এক পরম সম্পদ, জানিও। অশুদ্ধ দৃষ্টিই কুচিন্তার ধাত্রী।"

ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণ

হাজারিবাগ জেলান্তর্গত ফুস্‌রো নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"ভগবানের হাতে নিজেকে ছাড়িয়া দাও, তাঁর চরণে নিজেকে ফেলিয়া দাও, সম্পূর্ণরূপে ভগবৎ-সমর্পিত হও। নিজের উপরে কর্ত্তৃত্ব রাখিও না, তাঁহাকেই সর্ব্বতোভাবে তোমার জীবনের কর্ত্তা কর। ইহাই সকল প্রলোভনের উপরে তোমাকে কর্ত্তৃত্ব প্রদান করিবে। সর্ব্বতোভাবে ভগবানের বশ হও, ইহাতেই রিপুকুল অনায়াসে তোমার বশীভূত হইয়া যাইবে। মনঃসংযম কর ভগবানে, আত্মসংযম ইহাতেই আসিবে। চতুর্দ্দিকের সহস্র প্রতিকূল অবস্থার তাড়নে দিগ্‌-বিদিগ্‌জ্ঞান না হারাইয়া নিখিল বিশ্বের প্রভুকে তোমারও প্রভু বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া লও। দেখিও, সেই পরমবৎসল পরমপ্রভু নিজের হাতে ঘটনার গতি ফিরাইয়া দিবেন,— এমন অবস্থা-নিচয় সুকৌশলে সৃষ্টি করিয়া দিবেন, যাহা পরোক্ষে তোমাকে ধন্য, পুণ্য ও সার্থকজন্মা করিবে। তাঁর চরণে আত্মসমর্পণ অভিসন্ধিহীন হইয়া করিও। তাঁর কাছে নত হইলে জগৎ যে তোমার কাছে আপনা আপনি নত হইবে, এই কথাটা একেবারে ভুলিয়া গিয়া আত্মসমর্পণ

করিও। তাঁকে জীবনের কর্তা করিলে পাপের কর্তৃত্ব তোমার উপর হইতে যে উঠিয়া যাইবে, এই কথাটী বিস্মৃত হইয়া আত্মসমর্পণ করিও। আত্মসমর্পণের ফলে কিছু যে তুমি পাইবে, এই লাভাশা বা লোভ পরিহার করিয়া আত্মসমর্পণ করিও। আত্মসমর্পণকে একেবারে নিষ্কাম এবং সর্ত্তহীন রাখিতে চেষ্টা পাইও। এইরূপ আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়া তাঁহার করুণায় যে অযাচিত দান আসিবে, তাহার একটী মাত্র কণা এক কোটি জগৎকে উদ্ধার করিবার শক্তি তোমার চরণ-ধূলির একটি মাত্র রেণুর মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দিবে। তোমার ভিতরে জগদুদ্ধারের সামর্থ্য জাগুক, ইহা তিনি চাহেন। তুমি তোমার উদ্ধত অহমিকার সহস্র-শীর্ষ কালীয়-ফণার বিস্তার করিয়া বিষ-বাষ্পে নিজের কুশলকে নিজে সম্মোহিত করিতেছ মাত্র।"

ঈশ্বরে বিশ্বাস ও মানুষে বিশ্বাস

হুগলী জেলান্তর্গত রিষড়া নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"ভগবানকে বিশ্বাস করিব না, আর বিশ্বাস করিব এই জল-মাটি-বায়ুর মানুষকে, কাম-ক্রোধের পদানত দাস মানুষকে, স্বার্থপর অহংমুখ ক্ষীণদৃষ্টি অল্পবুদ্ধি মানুষকে,—ইহা যে এক হাসির কথা ভাই। মানুষে বিশ্বাস মানুষকে যুক্তির অধীন করে। কিন্তু মানুষ কি মানুষকে শত শত বার মিথ্যা যুক্তি

দিয়া প্রতারিত করে নাই? ঈশ্বরে বিশ্বাস মানুষকে যুক্তির ঊর্দ্ধে তোলে। বিজ্ঞান যুক্তি মানে। ইতিহাস অনেক সময়ে যুক্তিকে লঙ্ঘন করিয়া চলিয়া যায়। মানুষকে অবজ্ঞা করিতে বলি না। কিন্তু মানুষ মানুষই। তার ভ্রম আছে, প্রমাদ আছে। ভগবানই সকল ভ্রম ও প্রমাদের অতীত। তাই, চরমে তাঁহাকেই বিশ্বাস করিতে হইবে। মানুষ যখন নিজেকে ভগবানের যন্ত্ররূপে জানিয়া কাজ করে, বিশ্বাসের পাত্র সে তখন হয়। মানুষকে বিশ্বাস করিবার অসম্ভব প্রয়াসে অধ্যবসায়ের অপচয় না করিয়া প্রাণপণে ভগবদ্‌বিশ্বাসী হইতে চেষ্টা কর। ভগবদ্‌বিশ্বাসের স্বাভাবিক ফলস্বরূপে মানুষের উপরে আস্থার শক্তি আপনি আসিবে। তখন দেখিও, যাহার উপরে বিশ্বাস আসে, সেই মানুষ আর প্রাণাত্যয়েও অবিশ্বাসের কাজ করিতে পারে না।"

সাধন ও সত্যাস্বাদন

চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত বাগুলডাঙ্গা নিবাসী জনৈক ভক্তের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সাধন-ভজনে নিষ্ঠাকে দিনের পর দিন গভীর হইতে গভীরতর, নিবিড় হইতে নিবিড়তর, দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিতে থাক। সত্যনাম পাইয়াছ, সাধন করিয়া জীবনে পূর্ণ সত্যকে বিকশিত কর, আস্বাদন কর। নামে অভিনিবিষ্ট মনই সত্যনিষ্ঠ

মন। নামে অভিনিবেশ-বৰ্জ্জিত মনই নিয়ত প্রপঞ্চে ঘুরিয়া মরে। মঙ্গলময় ভগবানের পবিত্রতার খনিস্বরূপ দেবদুর্লভ নাম পাইয়াও যে তাহার সাধন করে না, সে ত' হেলায় রতন হারাইল। তোমরা সেইরূপ হইও না।"

ত্যাগী এবং গেরুয়া

কুমিল্লা নিবাসী জনৈক পত্র-লেখককে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"গৃহত্যাগী ব্যক্তিদের সহিত গৃহস্থদের আচার এবং ব্যবহারে কতক পার্থক্য থাকিবেই। ইহা অবশ্যম্ভাবী। এই পার্থক্যের কারণ দুই আশ্রমে অবস্থিত ব্যক্তি দুইটীর আভ্যন্তরীণ কোনও পার্থক্যের ভিতরে নহে, কেননা, স্বরূপতঃ উভয়েই সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ ব্যতীত অপর কিছুই নহেন। কিন্তু ত্যাগী ও গৃহীর ব্যক্তিগত ও সমাজগত দায়িত্বগুলি দুই প্রকার। এই দায়িত্বের প্রকার-পার্থক্য উভয়ের দৈনন্দিন জীবনের কাৰ্য্য, আচার এবং আংশিক ভাবে চিন্তা-প্রণালীরও পার্থক্য-বিধান করিয়া থাকে। কিন্তু আমরা ধৰ্ম্ম-প্রচারক ও ধৰ্ম্ম-প্রতিষ্ঠাতার দল অনেক সময়েই ত্যাগাশ্রম ও গৃহাশ্রম এই দুই আশ্রমে স্থিত ব্যক্তিদের ভিতরে নানা কৃত্রিম পার্থক্য সৃষ্টি করিয়া ত্যাগীকে গৃহীর সমাজ হইতে দূরে এবং গৃহীকে ত্যাগীর সমাজ হইতে দূরে সরাইয়া নিয়াছি এবং নিতেছি। ত্যাগীর ভিতরেই যে লুক্কায়িত একটী গৃহী আছেন, গৃহীর ভিতরেই

যে লুক্কায়িত একটী ত্যাগী আছেন, এই কথাটীকে উত্তমরূপে চাপা দিবার ইহা কারণ-স্বরূপ হইয়াছে এবং হইতেছে। গৃহী গ্রহণ করেন, ত্যাগী বৰ্জ্জন করেন। গৃহী সংগ্রহ করেন, ত্যাগী বিতরণ করেন, গৃহী সঞ্চয় করেন, ত্যাগী নিঃশেষ করেন। গৃহী বিষ্ণু-স্বরূপ, ত্যাগী মহেশ্বর-স্বরূপ। তোমরা বিষ্ণুকে মহেশ্বর হইতে পৃথক্ করিয়া কল্পনা করিয়া প্রণব সাধনার সরল তত্ত্বের ভিতরে যথেষ্ট জটিলতা সৃষ্টি করিয়াছ এবং তাহারই ফলে ত্যাগীর সহিত গৃহীর বিরোধ উপজাত হইয়াছে। ত্যাগী ও গৃহীর ভিতরের ভেদ আমি ভাঙ্গিতে আসিয়াছি, উভয়কে আপনতর এবং নিকটতর করিবার আমার প্রাণের প্রেরণা। এই জন্য নিজে সন্ন্যাসী হইয়াও গৈরিক ছাড়িয়াছি এবং আমার কোনও ত্যাগী ভক্ত বা শিষ্যকে গৈরিক পরিধানের অনুমতিও দিতেছি না। গৈরিক পরিতে হয়, শিরোদেশে পর, জগতের সকল ত্যাগীর, সকল মহতের স্মৃতি-চিহ্ন অন্তরে ধারণা করিয়া সগর্ব্বে ও নির্ভয়ে ধরণী-বক্ষে বিচরণ কর।"

সঙ্ঘ ও গণতন্ত্র

নোয়াখালী জেলান্তর্গত শান্তাসীতা-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সঙ্ঘ এবং গণতন্ত্রকে একই জিনিষ বলিয়া মনে করা ভ্রম। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের মূল হইতেছে সদস্যগণের

প্রত্যেকেরই পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তিত্বের সুতীব্র ও নিদারুণ চেতনা। কোনও একটী নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্যের সংসাধন-কল্পে উগ্র-ব্যক্তিত্ব-বুদ্ধি-বিশিষ্ট ব্যক্তিরা মিলিত হইলেন, ভোট দিলেন, অর্থাৎ প্রত্যেকে নিজ নিজ স্বাধীন মত-প্রকাশের অধিকারের প্রমাণ প্রতি পদে দিলেন, ব্যক্তিত্ব কোথাও খর্ব্ব হইতেছে দেখিলে বিরোধী দল গঠন করিলেন, প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে থাকিয়াই প্রতিপক্ষের ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন ব্যক্তিদের ভোট কিনিলেন (তাহা যুক্তি দিয়াই হউক আর অর্থ দিয়াই হউক, ভয় দেখাইয়াই হউক আর প্রলোভনেই হউক), পুনরায় মতামতের স্বাধীন বিকাশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ভোটাভুটির দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইলেন, কর্ত্তৃত্ব-বিশিষ্ট দলটীর দলপতিদের প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করিলেন এবং নিজেরা কর্ত্তৃত্ব আয়ত্ত করিয়া নিজেদের ধারণা অনুযায়ী শ্রেষ্ঠ-আদর্শে প্রতিষ্ঠানটীকে পরিচালিত করিতে লাগিলেন। একদল দুই দিনের বাদশাহীতে প্রমত্ত হইয়া ক্ষমতার অপব্যবহার করিলেন, অপর দল ভোটের জোরে তাঁহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া ক্ষমতা আয়ত্ত করিলেন কিন্তু সমগ্র শক্তিই ক্ষমতা অধিকারে নিঃশোষিত হওয়ার পরে নিত্য নূতন চমক্‌প্রদ কার্য্য-তালিকা সদস্যদের সম্মুখে ধরিতে সমর্থ হইলেন না, ফলে অকর্ম্মণ্যতার অপবাদে তাহাদেরও মাথার সোণার কিরীট একদা ধূলায় লুটিয়া পড়িল,—এই ভাবে চলে গণতন্ত্রের লীলা। সঙ্ঘে ব্যক্তিত্ব-বাদ নাই। ব্যক্তিটীকে বলি দিয়া তবে সঙ্ঘে ঢুকিতে হয়।

তাই সেখানে ভোটাধিকারের প্রশ্ন নাই। অহংকে পিষিয়া মারিয়া সঙ্ঘের জন্ম, অহংকে প্রশ্রয় দিয়া নহে। সঙ্ঘ-জীবনে প্রবেশ করিলে সুপ্ত অহমিকাও লুপ্ত হইতে থাকে। কর্ত্তৃত্ব সেখানে লক্ষ্য নহে, সেবাই সেখানে লক্ষ্য। কর্ত্তৃত্বলিপ্সু ব্যক্তিদের জন্য সঙ্ঘ উপযুক্ত স্থান নহে, তাহাদের পরমাশ্রয় গণতন্ত্র। গণতন্ত্রে গণ-মত চলে, সঙ্ঘে মতামতের কলহ নাই, জীবনকে নির্দ্দিষ্ট খাতে বহাইবার প্রতিজ্ঞা লইয়াই সঙ্ঘে ঢুকিতে হয়। সঙ্ঘ-জীবন যোগীর জীবন, তপস্বীর জীবন, বাক্যবীর বক্তার জীবন নহে, কূটকৌশলী ব্যবহারাজীবের জীবন নহে, ষড়যন্ত্র-সৃষ্টি-পরায়ণ তৃণাচ্ছাদিত সর্পের জীবন নহে। গণতন্ত্র ও সঙ্ঘ এই উভয়ের মধ্যে কোন্‌টী ভাল, কোনটী মন্দ, তাহা বলা আমার উদ্দেশ্য নহে। ভালমন্দ বিচার তোমরা করিবে। আমি মতামত ও পথাপথ সম্পর্কে কাহারও স্বাধীনতার সংহর্ত্তা নহি, আমি প্রত্যেক মানবের প্রত্যেক ব্যাপারে পরিপূর্ণ স্বাধীনতার দাতা এবং সমর্থক। কিন্তু গণতন্ত্রী মনোভঙ্গী লইয়া তোমরা যে কেহ কেহ সঙ্ঘ গঠন করিতে চাহিতেছ, সেই প্রয়াসের ভিতরে আত্মবিরোধ কোথায়, তাহা দেখাইয়া দেওয়া আমার কর্ত্তব্য। গণতন্ত্রীরা সঙ্ঘ গড়িতে পারিবে না, শিব গড়িতে বানর গড়িবে এবং সেই বানর আত্মনাশ-কার্য্যকেই প্রধান কর্ত্তব্য বিবেচনা করিবে। সঙ্ঘীরা গণতন্ত্রের পথে চলিতে পারিবে না, অধিকতর বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদের হস্তের ক্রীড়নক-রূপে নিজেদের স্বভাব

এবং প্রকৃতির বিরুদ্ধে বারংবার নানা উত্তেজনা-সঙ্কুল কর্ম্ম-তালিকার বাহ্য চাকচিক্যে বাধ্য হইয়া তামসিক জীবন যাপনে বাধ্য হইবে। যে যেইপথে চলিতে চাহ, ভাবিয়া বুঝিয়া চল। নিজ প্রকৃতির পথেই মানুষ সহজে প্রকৃতিজয়ী হইতে পারে,— 'পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ' একথা গীতাও বলিয়াছেন।"

বিবাহ ও নামাশ্রয়

অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"বিবাহিত জীবন যে যুদ্ধক্ষেত্র, এই বিষয়ে কোনও সংশয় নাই। কিন্তু ভগবানের নামের আশ্রয়ে যাহারা বাস করে, তাহাদের সংগ্রামের শক্তি অফুরন্ত হইয়া থাকে, তাহাদের বিজয়-লাভ অবশ্যম্ভাবী এবং তাহাদের শত্রুসমূহ ক্রমশঃ মিত্রে পরিণত হইয়া থাকে।"

সে যে কেমন স্নেহের খনি

অপর এক ভক্তের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সে যে কেমন স্নেহের খনি
ভাব্‌লি না তা একটী বার,
ওরে ও অবিশ্বাসী, আত্মনাশী
দ্বন্দ্ব করিস্ বারংবার।

"শিশুর মত সরল প্রাণে
স্মরণ কর্ রে শ্বাসের টানে,
জ্যোতির ধারায় স্নান-করান
দেখ্‌তে পাবি চরণ তাঁর,
চখের কোণে স্নেহের দীপ্তি
মুখের হাসি চমৎকার।
"হাত বাড়ায়ে ডাক্‌বে তোকে,
বুক বাড়ায়ে তুল্‌বে বুকে,
কেন রে তুই দূর-বিদূরে
মনের ভ্রমে থাকিস্ আর?
তার লাগি' সে সদাই পাগল
ঐ চরণে দৃষ্টি যার।"

"পরিদর্শকের" মন্তব্য

প্রাতঃকালেই একজন একখানা খবরের কাগজ শ্রীশ্রীবাবামণির হাতে আনিয়া দিল। পত্রিকাখানার নাম "পরিদর্শক"। সম্পাদকীয় প্রবন্ধে অত্যন্ত তেজস্বী ভাষায় যাহা বলা হইয়াছে তাহা এই।—ভদ্র-কন্যাদের নারীনৃত্য-বিলাস মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছে। আমরা স্থানীয় প্রভাবশালী লোকদের উৎপীড়নের ভয়ে সাহস করিয়া নারীনৃত্যের কুফল সম্পর্কে মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারি নাই। মানভূমের পুপুন্‌কী হইতে তেজস্বী সন্ন্যাসী আসিয়া দেশের যুবশক্তিকে অন্তর্গ্লানি-

বর্দ্ধক ও নৈতিকতার হানিকারক নারীনৃত্য সম্পর্কে তাঁহার নির্ভীক্ মতামত প্রকাশ করিয়া সকলকে অবাক্ ও স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছেন। প্রত্যেকেই প্রত্যেককে প্রশ্ন করিতেছেন যে, কে এই সন্ন্যাসী, যিনি লোক-বিরুদ্ধতার পরোয়া রাখেন না এবং যাহা সত্য বলিয়া বোঝেন, তাহা নিঃসঙ্কোচে হাজার হাজার লোকের সমক্ষে প্রকাশ্যে এবং নির্ভয়ে বলিয়া যাইতে পারেন? কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, কি সেই সামগ্রী, যাহার বলে তিনি এভাবে নির্ভয়ে দেশের পর দেশ পর্য্যটন করিতেছেন? আমাদের ধারণা, এই সত্যবাদী মহাপুরুষের বলের আধার দুইটী বস্তু। একটী হইতেছে তাঁহার আজীবনের আচরিত ব্রহ্মচর্য্য এবং অপরটী তাঁহার অভিক্ষা-ব্রত। যে কাহারও নিকটে ভিক্ষা চাহিতে যাইবে না, অপরকে ভয় করিবার তাহার কি আছে?—ইত্যাদি।

রূপোদ্ধতা রমণীর সংশোধন

একটু বেলা হইতে উপদেশার্থীরা সমবেত হইয়াছেন।

একজন প্রশ্ন করিলেন,—আমার একজন আত্মীয়া নিজেকে পরমা রূপসী ব'লে জ্ঞান করেন এবং রূপের গর্ব্বে গর্ব্বিতা হ'য়ে অপরাপর সকলের সাথে এমন আপত্তিজনক ব্যবহার করেন, যাতে মহা-অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে। এর কোনও প্রতীকার-পন্থা বল্‌তে পারেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমাদের শাস্ত্রকারদের উপদেশ

যদি শুন্‌তে হয়, তা'হলে কোনও কৌশলে এই মহিলার মনে রূপের নশ্বরতা সম্বন্ধে চিন্তা জাগিয়ে দিতে হবে। যথা,—আজ যে-জনা পরম রূপবতী, কাল বসন্ত রোগ হ'লে তার রূপ আর আগের মত চিত্তমাধুরীজনক থাক্‌বে না এবং বসন্ত রোগের আক্রমণ যে-কারো যে-কোনো বছর হ'তে পারে। অথবা, পদ্মিনী বা ক্লিওপেট্রা বা জগতের কোনো রূপসীই চিরকাল এই নশ্বর দেহটা নিয়ে থাক্‌তে পারেন নি, কেউ পবিত্র কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতে, কেউ বন্দিদশার অসম্মান এড়াবার প্রয়োজনে নিজের ইচ্ছায় রূপের খনি এই দেহটাকে বিনষ্ট করেছেন। অথবা লক্ষ্মী, সরস্বতী, সীতা, সাবিত্রী, উমা বা বিষ্ণুপ্রিয়া প্রভৃতি রূপের খনি-স্বরূপিণী দেবী বা মানবীগণ রূপের জন্য জগতে পূজিতা হন নি, পূজিতা হয়েছেন তাঁদের অলোকসামান্য গুণে। যে ভাবে এ সকল কথা মনে জাগিয়ে দিলে রূপসী মহিলাটীর মেজাজ গরম হবে না কিম্বা তিনি কারো প্রতি রুষ্টা, বিদ্বিষ্টা বা আক্রোশ-বিশিষ্টা হবেন না, তেমন কৌশল অবলম্বন কত্তে হবে।

প্রশ্নকর্ত্তা বলিলেন,—এ কাজ খুবই কঠিন হবে। মহিলাটীর অনুভূতির তারগুলি অত্যন্ত চড়া পর্দ্দায় সাজান।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এ ক্ষেত্রেও তুমি নিরুপায় নও। রূপসী হউন আর কদাকারা হউন, রমণী মাত্রেরই কতকগুলি প্রশংসনীয় গুণ নিশ্চিতই থাক্‌বে। ভক্ত এবং পরিজনেরা যদি

রমণীর রূপের বিষয়ে নজর না দিয়ে তাঁর প্রত্যেকটী গুণ সম্পর্কে অত্যধিক সচেতন হন এবং যে-কোনও একটী গুণের পরিচয় পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভদ্র ও সংযত ভাবে কিন্তু ইচ্ছাপূর্ব্বক সেই গুণের তারিফ করেন, তাহ'লে এই তারিফের প্রভাবেই রূপবতীর চেষ্টা বেড়ে যাবে সেই সকল সদ্গুণের অধিকাধিক অনুশীলনের দিকে। একদিন কারো রান্না ভাল হয়েছে বল্লে সে পরের দিন রান্না আরো ভাল কত্তে চেষ্টা করে। কারো দানশীলতার প্রশংসা একদিন কর্ল্লে পরে আরও একদিন সে দানশীলতার পরিচয় দিতে চেষ্টা করে। রূপোদ্ধতা রমণীর পাঁচটা দোষকে উপেক্ষা ক'রে অন্য দুটা বা চারটা গুণকে প্রশংসা কর্ব্বে। এ প্রশংসার ভাষায় বিদ্রূপের সুর থাক্‌বে না, তোষামোদের ভঙ্গী থাক্‌বে না, থাক্‌বে সরলতা ও স্পষ্টতা। এর ফলে নিজের গুণশালিত্বকে বর্দ্ধনের দিকে মহিলাটীর চেষ্টা আপনি ধাবিত হবে।

গুণোদ্ধতার সংশোধন

অপর একজন প্রশ্ন করিলেন,—গুণোদ্ধতা রমণীকে কি ভাবে সংশোধন করা যায়, এই জিজ্ঞাসারও অবসর আছে। অনেক মহিলাকেই দেখা যায় যে তাঁরা নানা প্রশংসনীয় সদ্গুণের আকর, কিন্তু দর্প, ঔদ্ধত্য আর তজ্জনিত পরুষ-ব্যবহারে চতুর্দ্দিকের শান্তি-নাশ করেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—উপদেশে কি কারো ঔদ্ধত্য

কমে? দৃষ্টান্তের শক্তিতে এ শত্রুকে দমন কত্তে হবে। বহুগুণযুক্তা অথচ বিনম্রস্বভাবা এমন মহিলাদের সংস্পর্শে এলে ক্রমশঃ অন্তরের দর্প প্রশমিত হয়। গুণবতী রমণীকে অধিকতর গুণবতীর সংস্পর্শে নিয়ে এলে কারো বা ঈর্ষ্যা বাড়ে, কারো বা দর্প কমে। কিন্তু গুণবতী বিনীতার সংস্পর্শ ঈর্ষ্যারও নাশক, দর্পেরও হারক।

বিনয়-প্রতিষ্ঠার মূল

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ঈশ্বরকে জীবনের সর্ব্বেশ্বর ব'লে জ্ঞান না করা পর্যন্ত প্রকৃত বিনয় আসে না। সকল অহংবুদ্ধিকে তাঁর চরণে অর্পণ ক'রে নিজেকে তাঁর অমোঘ ইচ্ছার দাসানুদাস ব'লে জ্ঞান কত্তে না পারা পর্য্যন্ত বিনয় আসে না। সবই ভগবানের ইচ্ছায় হয়, নিজের শক্তি, নিজের গুণ, নিজের প্রতিভা, নিজের গরিমা সবই একমাত্র তাঁর ইচ্ছার অধীন, একথা অন্তরে জাগে না ব'লেই ত' মানুষ দর্পিত হয়, স্পর্দ্ধিত হয়। ক্ষুদ্র জগতের ক্ষুদ্রতম কার্য্যসমূহ সম্পাদন ক'রে মানুষ নিজের পুরুষকারের গর্ব্বে কতই না স্ফীত হয়। কিন্তু ক্ষুদ্রকে দিয়েও বৃহৎ কাজ করান যিনি, বৃহৎকে দিয়েও ক্ষুদ্র কাজে অসাফল্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করান যিনি, যিনি তৃণের উপরে বজ্রকে ব্যর্থ ক'রে দেন আর পর্ব্বতশৃঙ্গের উপরে একটা ধূলিকণাকে শ্রেষ্ঠতা দেন, সেই

অঘটন ঘটন-পটীয়ান্ শ্রীভগবানকে সর্ব্বকার্য্যের কর্ত্তারূপে দেখ্‌তে পেলেই তবে না বিনয় আসে। জীবনে বিনয়কে প্রতিষ্ঠিত করার মতন শক্ত কাজ আর কিছুই নেই। কথায় বলে,—"বিদ্যা দদাতি বিনয়ং", কিন্তু সকল বিদ্যাই বিনয়ের দাত্রী নয়, একমাত্র ঈশ্বরে আত্মসমর্পণের বিদ্যাই প্রকৃত বিনয়ের জনয়িত্রী। সুতরাং রূপোদ্ধতা হউক, গুণোদ্ধতা হউক, যে কোনও রমণীকেই যদি শান্তির আধার রূপে পেতে চাও, তবে তাঁকে ঈশ্বরে সমর্পিত-প্রাণা কত্তে চেষ্টা কর। অথবা শুধু নারীদের কথাই কেন বলি, নারী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে সকলের সম্পর্কেই একথা প্রযোজ্য ব'লে জান্‌বে।

শ্মশান ও আত্মচিন্তা

অপর একজনের জিজ্ঞাসার উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—শ্মশান বা সমাধি-স্থান আত্ম-চিন্তার পক্ষে উৎকৃষ্ট স্থান। তার কারণ এই যে সুন্দরী, কুৎসিত, ক্রোড়পতি, দীনাদপি দীন, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ ও মূর্খাধম সকলেরই ঐহিক জীবনের গর্ব্ব এখানে ধূলায় অবলুণ্ঠিত হয়ে সমান হয়েছে। জীবনে যারা ছিল শত্রু বা প্রতিদ্বন্দ্বী, মরণে তারা হয়েছে একই মৃত্তিকায় শয্যাশায়ী। বিলাসী আর যতি, গণিকা আর সতী, সংযমী আর মাতাল, নিষ্ঠুর আর দয়াল, কৃপণ আর দাতা, আততায়ী আর ত্রাতা সকলে এসে এই একই

ধূলিশয়নে আশ্রয় নিয়েছে। দোষ, গুণ, উৎকর্ষ, অপকর্ষ কোনো কিছুরই পার্থক্য একজনকেও এই শ্মশান ভূমির শেষ শয়ন থেকে অব্যাহতি দিতে পারেনি। অর্থাৎ জীবনের ভালোমন্দ সব কিছুই মিথ্যা ব'লে পরিগণিত হ'তে পারে, কিন্তু মৃত্যু কখনো মিথ্যা নয়। শ্মশানের উপরে মৃত্যুর বিজয়-ধ্বজা উড়ছে। এজন্যই এখানে এসে আত্মচিন্তায় বস্‌লে মন সহজেই অনেকগুলি সংস্কারের নাগ-পাশ সহজে ছিঁড়ে ফেল্‌তে পারে।

শ্মশান-সাধনায় বিঘ্ন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু শ্মশানে ব'সে নশ্বরতা-চিন্তার একটা বিপর্য্যয়ের দিক্‌ও আছে। ভাল এবং মন্দ উভয়কেই যদি নশ্বর ব'লে বোঝ, হতাশায় তোমার হৃদয় পূর্ণ হ'য়ে যেতে পারে। অথচ, সাধকের পক্ষে হতাশা ও অবসাদ অতীব ইতর প্রকৃতির শত্রু। আর, কত কত শ্মশানে কত কত সাধু ব্যক্তিকে ব'সে ব'সে তপস্যা কত্তে দেখা যায়, যাঁদের প্রথম প্রথম মৃতের দৃশ্য অন্তরে বৈরাগ্যের ভাব আন্‌ত, কিন্তু নিত্যদিন দেখে দেখে শেষে ওটা একটা বায়স্কোপের ছবি ছাড়া আর কিছু ব'লে মনে হয় না। হাসি, আমোদ, ঠাট্টা, তরল চিন্তা এবং গরল পান সবই চলেছে অবাধে, অথচ মনকে প্রতারণা ক'রে নিজের কাছে নিজেকে শ্মশান-চারী মহাদেবের সগোত্র ব'লে জাহির করাও হচ্ছে।

যে সকল কামনা-বাসনাকে নিরস্ত করার জন্য জীবনের নশ্বরতার সাক্ষী এই শ্মশানে ব'সে সাধন করার ব্রত নিয়েছে, সেই শ্মশানে ব'সে ব'সেই মনের জমিতে কত কত নূতন নূতন বাসনার বীজ বপন করা হ'ল, আর তাই অঙ্কুরিত হ'য়ে, পল্লবিত হ'য়ে, চতুর্দ্দিকে লতার পর লতা ছড়িয়ে এক অক্টোপাসের বাঁধন সৃষ্টি ক'রে তোমাকে শ্মশানের মাঝে নিদারুণ সংসারীতে আটক ক'রে রেখে দিল।

জগতের সর্ব্বস্থানই শ্মশান

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এই কারণে লোক দেখান শ্মশান-ভূমিতে গিয়ে সাধন কত্তে বসার চাইতে যে-কোনও স্থানে সাধনে ব'সে এই চিন্তা ক'রে নেওয়াই উৎকৃষ্টতর যে, এই ভূমিতে কত কত জীব অনাদি কাল থেকে সুরু ক'রে তাদের শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছে। কত গর্ব্বিতের গর্ব্ব এই ধূলির সাথে মিশেছে, কত দর্পিতের দর্প এইখানে তার শেষ পরিণামকে প্রত্যক্ষ করেছে। এই যে জনাকীর্ণ নগরীর সুখাশ্রিত বৃক্ষবাটিকা, এইখানে এসে কত রাজা, কত প্রজা, কত ধনী কত দীন, কত জ্ঞানী, কত মূর্খ শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছে, তার কেউ ইয়ত্তা কত্তে পারে না। যেই গৃহে আজ নবজাত শিশুর প্রথম রোদন শুনা যাচ্ছে, সেই গৃহে কত ব্যক্তি যে নিজেদের পরম আদরের নরকলেবর ত্যাগ ক'রে গিয়েছে, কেউ দিব্যদর্শী না হ'লে তার ধারণাও কত্তে পার্ব্বে না। যেখানে দাঁড়াও,

যেখানে যাও, যেখানে বস, যেখানে শোও, প্রত্যেক স্থানে মৃত আত্মীয়ের শব পরিবেষ্টন ক'রে শত শত লোক কোনও-না-কোন সময় শোকের অশ্রু ফেলেছে। সুতরাং শ্মশানে সাধন কর্ব্বার জন্যে মরা পোড়ার জায়গায় যাবার কোনো বাধ্যকর প্রয়োজন নেই, যে-কোনও জায়গায় ব'সে শ্মশান-সাধন করা চলে।

বৈরাগ্য ও পরানুরাগ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তবে একটা কথা জান্‌বে যে, শুধু বৈরাগ্যের কোনো মূল্য নেই। শুধু পটলে চর্চ্চড়ি হয় না, সঙ্গে আলু দিতে হয়। শ্মশানে গেলে বা জীবের মরণশীলতার চিন্তায় অন্তরে অনিত্যতা-বোধ জাগে। কিন্তু এই অনিত্যতা-বোধ যদি নিত্য বস্তুর প্রতি চিত্তকে সংলগ্ন না করে, তবে এর কোনো সার্থকতা নেই। জগতের অনিত্যতার সাথে যখন জগৎপতির নিত্যতাকে উপলব্ধিতে আনা যায়, বৈরাগ্য তখনই সার্থক। কত লোককে ত' দেখ্‌তে পাচ্ছ তীব্র বৈরাগ্যের সাধন কচ্ছেন, কিন্তু দু'দিন দশ দিন বিশ দিন পরে বৈরাগ্যের বালির বাঁধ বাসনার জল-কল্লোলে তলিয়ে গেল। কেন গেল? না, জীবনকে অনিত্য জেনে সঙ্গে সঙ্গে নিত্যকে ধরার চেষ্টা হয় নি। বৈরাগ্যকে জান্‌বে পরমেশ্বরে পরম অনুরাগ অর্পণের সেতু। বৈরাগ্যের সাধনা কর্ল্লে, অথচ

তাঁর প্রতি অনুরাগ তোমার এল না, এমন সাধনে সিদ্ধি আসে না। এই পৃথিবী যে মিথ্যা, একথা বোঝার প্রয়োজন শুধু তিনি যে পরম সত্য সেকথা বোঝারই জন্য। তাঁকেই যদি পরম সত্য ব'লে না জান্‌লে, তাহ'লে এই পৃথিবী মিথ্যা না সত্য, সে কথা নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন কি?

নিরাপদ সংসারী

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সংসারের দাসও হ'য়ো না, সংসারের কর্ত্তব্য-সমূহকে উপেক্ষাও ক'রো না,—সংসারকে সেবা দেবে কর্ত্তব্যবুদ্ধির প্রেরণায়, আসক্তির অধীন হ'য়ে নয়। এই হ'ল সংসার সম্বন্ধে নিরাপদ হ'য়ে চল্‌বার কৌশল। যে ভগবানের দাস হয়, সংসার তাকে দাস কর্ত্তে পারে না; যে ভগবৎ-সেবাকে জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য ব'লে জ্ঞান করে, অনাসক্ত কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতে সংসারকে সেবা দান তার পক্ষে কঠিন হয় না। পদ্মপত্রে জলের উপমা শুনেছ ত'? টল্‌টল্ করে, কিন্তু পদ্মপত্রে জল কিছুতেই লাগে না। তেম্‌নি ভাবে সংসারে বাস কর্ব্বে, তেম্‌নি ভাবে সংসারের কর্ত্তব্য-সম্পাদন কর্ব্বে। সকল ভালবাসাকে ভগবৎ-প্রেমের অধীন কর, ভগবৎ-প্রেমের উদ্দীপক কর, তাহ'লেই আর সংসারের ভালবাসা তোমাকে বিপদে ফেল্‌তে পারবে না।

সাধু সন্দর্শনেও শৃঙ্খলা প্রয়োজন

সমস্ত দ্বিপ্রহর জুড়িয়াই আজ দর্শনার্থীরা আসিয়াছেন। শ্রীযুক্ত দুর্গেশ্বর শর্ম্মা মহাশয় জনসাধারণের জন্য একটী নিয়ম করিয়া দিয়াছিলেন। তাহা এই যে, শ্রীশ্রীবাবামণির সহিত বিশেষ আলাপ-আলোচনার জন্য যাঁহারা লালায়িত, তাঁহাদিগকে আগে হইতে সময় নির্দ্ধারিত করিয়া নিয়া যথাসময়ে আসিতে হইবে এবং নির্দ্দিষ্ট সময়টুকুর মধ্যে কাজ সারিতে হইবে। দুই একদিন আগে আসিয়া তারিখ ও সময় নির্দ্ধারিত করিয়া গেলে শ্রীশ্রীবাবামণির অফুরন্ত লেখাপড়ার কাজেরও ব্যাঘাত হইবে না এবং জিজ্ঞাসুদের জিজ্ঞাস্য বিষয়ে আলাপ করবারও বাধা হইবে না। তিনি বলিলেন,—আমাদের দেশের মহৎ লোকদের সময়ের যে দাম কত, তাহা জনসাধারণে বোঝে না। আবার, জনসাধারণের মনের কথাগুলি আগ্রহ করিয়া শোনা মহৎ লোকদের কত সঙ্গত, তাহা অনেক নামী ও দামী লোকেরা বোঝেন না। শ্রীশ্রীবাবামণি ত' আর্ত্ত-ব্যক্তির ব্যথার কথা শুনিতেই উদ্‌গ্রীব কিন্তু সারাদিনই জনতার ভিড় হইলে চলিবে কেন? সাধু-সন্দর্শনেও শৃঙ্খলার প্রয়োজন আছে। আর, সাধুসঙ্গকে ডিবেটিং ক্লাবের পর্য্যায়ে নিয়া ফেলার ভিতরেও কোনও লাভ নাই।

বলা বাহুল্য, শ্রীহট্টে এই শৃঙ্খলাটী সত্যই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর-রূপে রক্ষিত হইয়াছিল।

মানহানির মামলা

অপরাহ্নে শ্রীযুক্ত দুর্গেশ্বর বাবু কোর্ট হইতে ফিরিয়াই বলিলেন,—স্বামীজী, এক নূতন খবর।

—বলুন!

—আপনি ফৌজদারী মামলার আসামী।

—ব্যাপার কি?

—মানহানির মামলা। আপনার বক্তৃতায় এখানকার অত্যন্ত অভিজাত পরিবারের সম্মানহানি ঘটেছে। এই হচ্ছে অভিযোগ। পরিদর্শক পত্রিকার এডিটার আর আপনি এক সঙ্গে আসামী।

—আমি ত' এখানকার কোনও অভিজাত পরিবারের কাউকে জানি না! আর আমার বক্তৃতায় ত' কদাচ কারো প্রতি ব্যক্তিগত আক্রমণ থাকে না!

—কিন্তু "ঠাকুর ঘরে কে রে" বল্লেই কেউ কেউ কি চেঁচিয়ে ওঠে না,—"না, না, আমি কলা খাই না?"

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—তাই বলুন। তবে মামলা চলুক। দুর্গেশ্বর বাবু বলিলেন,—মামলার জন্য আপনি ভাববেন না। আপনার হ'য়ে লড়ার লোক এ সহরে অনেক আছেন। কেইসটা আমার কোর্টেই দায়ের হয়েছে। কিন্তু

আপনি আমার গৃহে অতিথি। মামলা আমি অন্য কোর্টে স্থানান্তরিত ক'রে দিচ্ছি।

একথা বলিয়াই দুর্গেশ্বর বাবু অন্তঃপুরে গেলেন।

ঘণ্টাখানিক পরেই কালীঘাট উপান্তের শ্রীসতীশ চন্দ্র দাশ উকিল মহাশয় আসিয়া হাজির হইলেন। তিনি একখানা ওকালত-নামা শ্রীশ্রীবাবামণির হাতে দিয়া বলিলেন,—স্বামীজী, একটা সই করে দিন্। আমি আপনার হ'য়ে মামলা লড়্‌ব।

দশবিশ মিনিটের মধ্যে আরও প্রায় দশ বারোজন উকিল আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলেন,—আপনার ভাষণাবলিতে আমরা মন্ত্রমুগ্ধ। আমরা এই মামলা আপনার হ'য়ে লড়্‌ব।

দুর্গেশ্বর বাবু ইঁহাদের পরিচয় দিয়া বলিলেন যে, ইঁহারা শ্রীহট্টবারের প্রত্যেকেই খ্যাতনামা ব্যবহারাজীব।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আপনাদের ফিস্ দিতে পারি, এ সাধ্য আমার নাই।

সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—বলেন কি! প্রত্যহ ভাষণ-মঞ্চ থেকে আপনি যে অমরার অমৃত পরিবেশন কচ্ছেন, তার ঋণ আমরা কয় জন্ম সেবা দিয়ে শোধ কর্ব্ব?

দুর্গেশ্বর বাবু প্রচুর জলযোগে সকলকে আপ্যায়িত করিলেন।

এদিকে মামলার খবর সহরের প্রায় সর্ব্বস্থানেই প্রচারিত হইয়া গিয়াছে। অ্যাডিশনাল ডিষ্ট্রিক্ট্ ম্যাজিষ্ট্রেটের বাংলোর সম্মুখে বহু লোকের সমাগম ঘটিয়াছে। উকিল-বাবুরা বাহির

হইয়া যাইবার কালে তাঁহাদের বলিলেন,—আপনারা উদ্বিগ্ন হবেন না। স্বামীজীর মামলা আমরা লড়্‌ব। অভিযোগকারী-পক্ষ শ্রীহট্ট-বারে কোনও উকিল পাবেন না। আপনারা নিশ্চিন্ত হোন এবং এখন গিয়ে কার্য্যরত স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে বিরক্ত না ক'রে সবাই যার যার বাড়ী চলুন। কাল স্বামীজীর বিশ্রাম, পরশু ৫ই মাঘ আবার যাবেন রাজা গিরিশ চন্দ্র হাইস্কুলের সেই মাঠে। আবার তাঁর বজ্রনিনাদ সেখানে শুন্‌তে পাবেন।

জনতা একটা জয়ধ্বনি দিয়া প্রস্থান করিলেন।

শ্রীহট্ট
৫ই মাঘ, শনিবার,১৩৪১
(১৯শে জানুয়ারী,১৯৩৫)

কয়েকটী কলেজের ছাত্র কয়দিন ধরিয়াই দীক্ষার জন্য শ্রীশ্রীবাবামণির পশ্চাতে ঘুরিতেছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীহট্ট জেলার লোকেরা খুব ধর্ম্মপ্রাণও বটে। কিন্তু শ্রীশ্রীবাবামণি দীক্ষা-বিষয়ে পুরুষ ও নারী সকলকেই সযত্নে বর্জ্জন করিয়া যাইতেছেন। মাত্র একটী যুবককে দীক্ষা না দিয়া পারিলেন না। বলিলেন, আজ পূর্ণিমা। আজই তোকে দীক্ষা দিব।

জীবনের সার্থকতা

দীক্ষান্তে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জীবনকে উৎসর্গ করাতেই জীবনের সার্থকথা। নিরহঙ্কার, নিরভিমান, আত্ম-

পৌরুষ-বোধ-বর্জ্জিত, নির্ব্বিচার আত্মদানের ভিতর দিয়ে চরিত্র ও আচরণের মধ্য দিয়ে ভগবানের অপার্থিব করুণা ও স্নেহ আত্মপ্রকাশ ক'রে থাকে। নিজের উপরে স্বকীয় কর্ত্তৃত্ব সম্পূর্ণ-রূপে ভু'লে যাও এবং সম্পূর্ণ-রূপে একমাত্র ভগবানেরই কর্ত্তৃত্বকে প্রতিষ্ঠিত কর। এতেই জীবন প্রকৃত সাফল্যকে অর্জ্জন কর্ব্বে।

দীক্ষা ও সঙ্কল্পের স্থিরতা

অপর এক দীক্ষার্থীকে ফিরাইয়া দিবার কালে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মন-প্রাণকে আগে একাগ্র কর, স্থির-লক্ষ্য-যুক্ত কর, দীক্ষা নেবে তার পরে। জীবনে দীক্ষার প্রয়োজন আছে কিন্তু সে প্রয়োজন সঙ্কল্প স্থির করার পরে। লক্ষ্যকে না জেনে, না চিনে, না বুঝে, দীক্ষা নিলে পরে হয়ত প্রাপ্ত দীক্ষার বিপরীত আচরণও তোমাকে কত্তে হ'তে পারে।

—আমি যদি দীর্ঘকাল পরে আসি?

—তখনো লক্ষ্যকে জেনে তারপরে এসো। এসে হয়ত দীক্ষা নেবে, তারপরে কোনও একটা অজুহাত দেখিয়ে প্রাপ্ত দীক্ষার অসম্মান কর্ব্বে, এমন কি তার নিন্দা কর্ব্বে। আমি তাতেও রুষ্ট হব না কিন্তু তোমার ক্ষতি ঠেকাবে কে? হঠাৎ হুজুগে দীক্ষা নিতে এস না। দুটা ভাল বক্তৃতা দিয়েছি বলেই দীক্ষা নিতে প্রলুব্ধ হয়ো না।

যুবকেরা চলিয়া গেলে শ্রীশ্রীবাবামণি পত্রাদির উত্তরে লিখিতে বসিলেন।

শ্রীহট্ট
শুক্রবার, ৪ঠা মাঘ,১৩৪১
(১৮ই জানুয়ারী,১৯৩৫)

দুষ্ট ছেলের সংশোধন

অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি পুপুন্‌কী আশ্রমের জনৈক কর্ম্মীর নিকট পত্র লিখিলেন,—

"দুষ্ট ছেলেটিকে সংশোধিত করিবার জন্য তোমার দুইটি সদ্‌গুণের প্রয়োজন হইবে। একটী, অতীব খরদৃষ্টি রাখা, অপরটী, স্নেহ-সহকারে শাসন করা। সংশোধন করিবার জন্য দুষ্ট ছেলে চাহিয়াছিলাম কিন্তু এমন ছেলেই আসিয়া পড়িয়াছে, যাহাকে বাগ মানান কঠিন। কিন্তু এই সব ছেলেকে যুদ্ধের অশ্বের ন্যায় বিবেচনা করিবে। যুদ্ধের অশ্ব দুরন্তই থাকে কিন্তু মৃত্যু-নির্ভীক হয়। এই সব ছেলেদের উপযুক্ত ভাবে গড়িতে পারিলে মহাকর্ম্মীতে পরিণত করা যায়। স্বাধীন দেশের সৈনিক-বিভাগ অনেক দুষ্ট ছেলের বীরত্ব-বিকাশের ক্ষেত্র হইয়া থাকে।"

সেবা ও অভিমান

ঐ পত্রেরই অপর অংশে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"আশ্রমের কাজ হঠাৎ এক সঙ্গে অনেকগুলি একত্র পড়ায় তোমাদের সকলেরই অত্যধিক শ্রম হইতেছে। এই শ্রম তোমরা ভগবানের চরণ-পানে তাকাইয়া নিরভিমান চিত্তে করিও। গোমূত্র যেমন দুগ্ধের সর্ব্বনাশ করে, অভিমান তেমন সেবার সর্ব্বনাশ করে।"

গুরুর স্নেহ ও শিষ্যের পুরুষকার

জনৈক শিষ্যের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তোমাদের সম্পর্কে আমার স্নেহ অকৃত্রিম এবং অহেতুক। তোমরা আমাকে পূজার পুষ্পাঞ্জলি দাও আর শূলে বিদ্ধ কর, হৈম-সিংহাসনে বসাও আর তুষানলে দগ্ধ কর, সর্ব্ব অবস্থাতেই আমার এই স্নেহধারা অসীম থাকিবে এবং অবিশ্রাম গতিতে বহিবে। তোমাদের জীবনের স্বল্পপরিসর ক্ষেত্রের পক্ষে এই স্নেহ অপর্য্যাপ্ত, তাই উপচিয়া বহিতে থাকিবে। স্নেহ দেওয়াই আমার ধর্ম্ম, পূজা পাওয়া নহে। আমার স্নেহ তোমাদিগকে পাপ, দুষ্কৃতি, অশান্তি এবং অনর্থ হইতে রক্ষা করিতে পারে, ইহা সত্য। এবং শুধু যে 'পারে', মাত্র তাহাই নহে, রক্ষা করিয়াও চলিয়াছে। সংস্কারমুক্ত দৃষ্টি লইয়া নিজের অতীত এবং বর্ত্তমান অধ্যয়ন করিলেই তাহা বুঝিবে। কিন্তু কুশলের ক্ষেত্রে নিজ পুরুষকার কিছুই প্রয়োগ

করিবে না, আর সবই শুধু আমার উপরে ভার দিবে, ইহা কোনও কাজের কথা নহে। আর সর্ব্বব্যাপারেই কি প্রকৃত প্রস্তাবে ভার দাও? ক্ষুধা লাগিলে আমি নিজে আসিয়া অন্নগ্রাস মুখে না তুলিয়া দেওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া কি বসিয়া থাক? তাহা থাক না। সুতরাং আমার নিজের গরজে তোমার যে-কুশল আমি অবিশ্রাম সম্পাদন করিতেছি, তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া নিজের কুশল নিজে সাধিবার জন্য ভগবদ্দত্ত আত্ম-শক্তিকেও প্রয়োগ কর এবং বারংবার কাজে লাগাইয়া তাহাকে নিপুণ কর। আমি নিয়তই তোমার সঙ্গে আছি,—ভয় পাইও না, হতাশ হইও না।"

সরলতার পথ

জনৈক জিজ্ঞাসুর পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"কুটিল সংসারে নামাশ্রয়ই সরল থাকিবার একমাত্র উপায়। সরল থাকিবার অপর উপায় দেখি না। চতুর্দ্দিকের জটিল পরিস্থিতির গ্রন্থিল দুর্য্যোগে দেখিয়া নিজের সরলতা বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে একটুখানি চালাকীর আশ্রয় নিয়া দেখ, সঙ্গে সঙ্গে তোমার প্রত্যেকটী কেশের অগ্রভাগ ধরিয়া শকুনির পাশার চাল প্রাণপণে তোমাকে টানিবে। নিন্দক ও বিরুদ্ধবাদিগণের অভিসন্ধি-প্রেরিত নানাবিধ চতুরতা এমন

এক নিদারুণ অবস্থার সৃষ্টি করিবে যে, শেষে তুমি কম্বল ছাড়িলেও কম্বল তোমাকে ছাড়িবে না, গায়ের জোরে জড়াইয়া ধরিয়া রাখিবে। সুতরাং সরল থাকিবার জন্য দুয়ারে দুয়ারে যাইয়া ব্যাখ্যা করিয়া নিজ সরলতার পরিচয় দিবার চেষ্টা না করিয়া সকলের সকল সংশ্রব নির্ম্মম ভাবে বর্জ্জন করিয়া একান্ত চিত্তে অনন্যশরণ হইয়া সম্পূর্ণরূপে নামাশ্রয়ী হও। নামে ডুবিয়া যাও। নামের অতলে এমনই ডুব, আর যেন এক শতাব্দী খুঁজিয়াও তোমাকে কেহ ষড়যন্ত্রের জালে ধরিতে না পারে।"

নামের কোলে আশ্রয়

অপর এক পত্র লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"উপাসনার ভিতর দিয়াই জীবনের শান্তি আসিবে এবং সর্ব্ববিধ ক্ষয়, ক্ষতি, অভাব ও অপূর্ণতার পূরণ ঘটিবে। অতীতের গ্লানি ভুলিবার জন্য যত প্রকারের বহির্ম্মুখ চেষ্টা প্রচলিত আছে, ভগবদুপাসনার শক্তি তাহাদের সবগুলির সম্মিলিত শক্তি অপেক্ষাও অধিক। মনকে দশ দিকে ছুটাছুটি করিতে না দিয়া শিশুর নির্ভর নিয়া ভগবানের নামের কোলে আশ্রয় নিতে দাও। মাতৃ-অঙ্কে আশ্রয় নিয়াও চির-নিশ্চিন্ত হইবার উপায় নাই, কেননা, মাতার জড় দেহও

মৃত্যুর অধীন। কিন্তু নাম অবিনশ্বর, শাশ্বত ও সনাতন বস্তু, নামের আশ্রয় নিলে চির-নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।"

দুর্য্যোগকে সুযোগে পরিণত কর

অপর এক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"জীবনের যাবতীয় দুর্য্যোগগুলিকে সুযোগ-রূপে পরিণত করিবার তপস্যায় ব্রতী হও। জীবনের সকল ক্ষয়-ক্ষতিকে প্রকৃত মূলধনে রূপান্তরিত করিতে কিসে সমর্থ হও, তাহার চেষ্টা দেখ। হতাশও হইও না, অবসন্নও হইও না। হতাশাখিন্ন অবসাদক্লিষ্ট দুর্ব্বলের জন্য এই জগতের কোনও সৌভাগ্যের বিন্দুমাত্র বরাদ্দ নাই। পরমেশ্বরে বিশ্বাস কর। তাঁহার অমোঘ কৃপায় বিশ্বাসী হও। তাঁহার অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিতে আস্থাবান্ হও। নিজেকে তাঁহার একান্ত অনুগত সেবক করিয়া লও এবং তাঁহার নয়নে নয়ন রাখিয়া তাঁহার অভিপ্রায়কে চিনিয়া লইয়া সেই অভিপ্রায়ের পূরণে অকুণ্ঠিত চিত্তে আত্মবলি দাও। তাঁহার কাজে প্রাণপাত করিয়াই তুমি প্রাণবন্ত হইবে।"

মুরারিচাঁদ কলেজের বক্তৃতা

বেলা বারোটা বাইশ মিনিটে শ্রীশ্রীবাবামণি মুরারিচাঁদ কলেজে একটী বক্তৃতা প্রদান করিলেন। সংস্কৃত-সাহিত্যের

প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত শাস্ত্রী এম-এ মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বক্তৃতা পূর্ণ দুই ঘণ্টা কাল ধরিয়া চলিল। কলেজে ছাত্র এবং ছাত্রীরা সকলেই পরমাগ্রহ-সহকারে বক্তৃতা শ্রবণ করিলেন।

ঐহিকের সহিত পারত্রিকের সম্বন্ধ

মানবের বহির্ম্মুখ জীবনের সহিত অন্তর্ম্মুখ জীবনের পূর্ণ সামঞ্জস্যের পন্থা-নির্দ্দেশ পূর্ব্বক শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—পাশ্চাত্যের ইহ-পরতন্ত্রতার সাথে ভারতের পারমার্থিক জীবন-ভঙ্গীর পার্থক্য আকাশ-পাতাল। আমরা পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকারী হ'তে পারি না, হবও না। কিন্তু এই ভারতে একদা আমরা ঐহিকের সাথে পারত্রিকের এক অত্যাশ্চর্য্য সমন্বয় সাধন করেছিলাম। তার পুনরুৎকৃষ্ট সাধন কত্তে হবে, তার পূনরাবির্ভাবকে সম্ভব ক'রে তুলতে হবে। আমাদের অতীতের সব-কিছুই বস্তা-পচা বাজে মাল নয়, এই কথা বিশ্বাস কত্তে হবে এবং পরানুকারী আত্মদৃষ্টি-বর্জ্জিত জন্মান্ধের ভূমিকা ত্যাগ ক'রে আমাদিগকে চক্ষুষ্মান্ ভারত-সন্তানের পরিচয় নিজ নিজ জীবনে দিতে হবে। এস যুবক এবং যুবতীগণ, তোমরা তার জন্য আজ বদ্ধপরিকর হও।

জৈব স্বভাবের উপরে প্রভুত্ব স্থাপন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জীবের দেহ জৈব উপায়েই উৎপন্ন হয়েছে। তাই এর উপরে জৈব ক্ষুধার দাবী অনুক্ষণ অনুভূত হয়। যতক্ষণ দেহ আছে, রসনার কাছে তেঁতুল ধর্‌লে ততক্ষণ জিহ্বায় রস-সঞ্চারের সম্ভাবনা থাক্‌বেই। কিন্তু এটা দেহেরই স্বভাব, তোমার নিজের এটা স্বভাবও নয়, স্বরূপও নয়। দেহকে আশ্রয় ক'রে আছ ব'লেই দেহের স্বভাব তোমার কাছে আব্‌দার করে, প্রশ্রয় চায়। কিন্তু তাকে প্রশ্রয় দেবে, কি না দেবে, তার নির্ণায়ক হবে তুমি নিজে, তোমার অভ্যাস বা সংস্কারসমূহ নয়। অভ্যাসেরও তুমি প্রভু, সংস্কারেরও তুমি প্রভু, তোমার দেহেরও তুমিই প্রভু। এই কথা স্মরণে রেখে তোমার জীবভাবের উপরে তোমার দেবভাবের কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা কর, এই কথা অন্তরে জাগরূক রেখে তোমার জৈব-স্বভাবের উপরে তোমার প্রকৃত স্বভাবকে জয়ী কর। তাতেই তোমার মনুষ্য ব'লে পরিচয় দেওয়ার সার্থকতা হবে।

পরাজয় তোমাদের নাই

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পুত্রগণ এবং কন্যাগণ, তোমাদের এক একটা ক্ষুদ্র জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জয়িষ্ণুতা

একটা দেশে একটা জাতির দিগ্বিজয়ের কর্ব্বে সূচনা। তোমাদের এক একটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরাজয় এই দেশকে ব্যাপক পরাজয়ের অগৌরবকে ম্লান কর্ব্বে। অন্তরে আজ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা জাগাও,—'পরাজিত আমরা হব না।' পরাজয় যে তোমাদের কখনো হ'তে পারে না, কোনও যুদ্ধক্ষেত্রেই যে তোমরা বিজিত হ'তে পার না, এই বিশ্বাসকে জোর ক'রে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত কর। ব্যক্তিগত জীবনের নৈতিক দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষে নয়, সামাজিক জীবনের ব্যাপক কর্ত্তব্যরাজিতে নয়, রাষ্ট্রিক জীবনের শোণিতোৎসর্গে নয়,—পরাজয়কে তোমরা কোনও অবস্থাতেই বরণ কর্ব্বে না, কত্তে পার না। পরাজিত হবার জন্য তোমরা জন্মগ্রহণ কর নাই।

বক্তৃতার অল্পাংশই লিপিবদ্ধ হইল। অদ্যকার এই বক্তৃতা এতই হৃদয়গ্রাহী হইল যে, শ্রীহট্ট কলেজের কোনও ছাত্র বা ছাত্রী বোধ হয় ইহজন্মে এই অপূর্ব্ব ভাষণের কথা ভুলিতে পারিবেন না। আরও কিছু শুনিবার প্রত্যাশায় ছাত্র-ছাত্রীগণ বসিয়াই রহিলেন। কিন্তু শ্রীশ্রীবাবামণি দুই ঘণ্টার অধিক বক্তৃতা করিলেন না।

অমানুষ হইও না

বক্তৃতান্তে শ্রীশ্রীবাবামণির বাসস্থানে অর্থাৎ শ্রীযুক্ত দুর্গেশ্বর শর্ম্মার গৃহে ফিরিয়া আসিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি কতিপয় উপদেশার্থীর পত্রের উত্তর প্রদান করিলেন।

একজনকে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তুমি ভগবান্ মান না? তোমার সহিতও আমার কলহ নাই। যে নিজেকে নাস্তিক বলিয়া প্রচার করে, আমার ঘৃণা তাহার জন্যও নহে। তাহাকে আমি দ্বেষ করিতে চাহি না। ভগবানকে না মান, নিজেকেও ত' মান? নিজকে যদি মান, তবে তোমার প্রতি আমার বাণী এই যে, এই নিজেকে চিনিবার চেষ্টা কর, নিজেকে সত্য সত্য জানিবার শক্তি অর্জ্জন কর, নিজের অর্চ্চনা নিজে করিয়া অন্তরের স্বাভাবিকী পূজা-প্রবৃত্তিকে সার্থক কর। ঈশ্বরকে তুমি না মানিতে পার, কিন্তু তোমার ভিতরেও সার্থকতা-লাভের পুঞ্জীকৃত আবেদন জমিয়া আছে, নাস্তিকও নিজেকে অসফল, অসার্থক, অপূর্ণ দেখিতে চাহে না। তোমার সম্পর্কে আমার অনুধ্যান তোমার সার্থকতা। হে নাস্তিক, তুমি আমার পর নহ, আমি তোমাকেও আমার একান্ত আপন বলিয়া গণনা করিয়া থাকি, তাই তোমার প্রতি আমার সংবেদনশীল চিত্তের ইহাই প্রধান আকিঞ্চন যে, নাস্তিক হইয়াছ, বেশ হইয়াছ, কিন্তু অমানুষ হইও না।"

রাজা গিরিশ চন্দ্র হাইস্কুলের শেষ বক্তৃতা

কয়েকখানা পত্র লেখার পরে ঘড়িতে তিনটা চল্লিশ

বাজিতেই শ্রীশ্রীবাবামণি গাত্রোত্থান করিলেন এবং জামা-কাপড় বদল করিয়া রাজা গিরিশ চন্দ্র হাইস্কুলের প্রাঙ্গণে রওনা হইলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি চিরকালই ঘড়ির কাঁটায় সভাস্থলে আগমন করেন এবং বিনা বিলম্বে বক্তৃতারম্ভ করেন। অদ্যও তাহাই হইল। সভাস্থল লোকে লোকারণ্য হইয়াছে। বক্তৃতা তিন ঘণ্টাকাল চলিল।

আসন-মুদ্রার উৎপত্তি

অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি যৌগিক আসন-মুদ্রার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি আসন-মুদ্রা প্রদর্শনও করিলেন।

বক্তৃতা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ডন, বৈঠক, কুস্তি বা কসরতের যে ভাবে উৎপত্তি ঘটেছে, যৌগিক আসন-মুদ্রার উৎপত্তি সে ভাবে হয় নি। কুস্তি-কসরতের আবিস্কার মানুষের অনুমান এবং বুদ্ধিকে আশ্রয় ক'রে। কিন্তু যৌগিক কৌশলসমূহের আবির্ভাব যোগস্থ মানুষের সাধন-নিমগ্ন প্রজ্ঞার ভিতর থেকে। এখনো এরূপ যোগী দু'চার জন দেখা যায়, যাঁরা সাধন কত্তে বস্‌লে কোনও না কোনও যোগাঙ্গ আসন ও মুদ্রা বিনা চেষ্টায় বিনা ইচ্ছায় বিনা কল্পনায় আপনা আপনি হ'তে থাকে। প্রাচীন কালেও আসন-মুদ্রাগুলির মধ্যে অধিকাংশের উৎপত্তি এই ভাবেই হয়েছে।

মনটী শরীরের অঙ্গ-বিশেষে বা কেন্দ্র-বিশেষে স্থির হ'ল, আর সঙ্গে সঙ্গে সেই অঙ্গে বা কেন্দ্রে আপনা আপনি সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে আকুঞ্চন-প্রসারণ চল্‌তে লাগ্‌ল। যোগী লক্ষ্য কর্‌লেন যে, এই ইচ্ছা-অনিচ্ছার বহির্ভূত আশ্চর্য্য প্রক্রিয়ায় হয়ত কোনও রোগ-বিশেষ নিরাকৃত হ'ল অথবা কোনও মানসিক-ভাব-বিশেষ স্তম্ভিত হ'য়ে গেল। তখন তিনি জান্‌তে পারলেন যে, এর গুণাগুণ কি।

আসন ও মুদ্রা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যাঁর জীবন সম্পূর্ণ-রূপে স্বভাবের উপরে প্রতিষ্ঠিত, জীবনে যাঁর কৃত্রিমতার লেশমাত্র নেই এবং লক্ষ্য যাঁর জটিলতা-প্রমুক্ত, এমন ব্যক্তি মনঃসংযমের স্তর-বিশেষে পৌছান মাত্র তাঁর দেহের প্রত্যেকটী অঙ্গ বা অণুপরামাণু, তাঁর ক্রমিক হিতবর্দ্ধনের অনুকূল ভাবে নিজের গতিপথ নিজে স্থির ক'রে নেয়। এগুলিই হচ্ছে আসন ও মুদ্রা। আসন মানে স্থিতি, মুদ্রা মানে মনোভঙ্গীর প্রকাশ।

নূতন আসন-মুদ্রার প্রবর্ত্তন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ব্রহ্মচর্য্যে যাঁর প্রয়োজন, তাঁর মন অন্তর্ম্মুখিনতার স্তর-বিশেষে পৌছে গেলে এমন আসন-মুদ্রার বিকাশ তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে হবে, যা ব্রহ্মচর্য্যের সহায়ক।

শক্তিমান, ধীমান্‌, কীর্ত্তিমান ও যোগশক্তি-সম্পন্ন সন্তান যাঁর প্রয়োজন, তাঁর মন অন্তর্ম্মুখিনতার স্তর-বিশেষে পৌছে গেলে এমন সব আসন-মুদ্রার বিকাশ তাঁর অঙ্গ প্রত্যঙ্গে হ'তে থাকবে, যা' ঠিক্‌ ঐরূপ সন্তানটীর শুভজন্ম লাভের পক্ষে সুনিশ্চিত সহায়ক। সুতরাং অন্তর্ম্মুখিনতার পদ্ধতিবদ্ধ অনুশীলনের ফলে এই দেশে এখনো শত শত ব্যক্তি নূতন নূতন আসন ও মুদ্রার আবিষ্কার এবং প্রবর্ত্তন ক'রে দেশের, দশের, সমাজের এবং জগতের পরম হিত সাধন কত্তে পারেন। যাঁরা আসন-মুদ্রা সম্পর্কে কোথাও কোনও উপদেশ পান নি, তাঁদেরও অন্তর্ম্মুখিনতার স্তরবিশেষে পৌছে আপনা আপনি পূর্ব্ব-প্রবর্ত্তিত আসন-মুদ্রাগুলির আবর্ত্তন-প্রবর্ত্তন শরীরের মধ্যে প্রকাশ পায়।

আসন-মুদ্রা ও মন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রত্যেকটা আসন বা মুদ্রার সমান্তরালে মনের এক একটা নির্দ্দিষ্ট চিন্তা-ধারা চ'লে থাকে। আসন-মুদ্রাগুলি মুখ্যতঃ শরীরের স্নায়ু বা nerve সমূহের ব্যায়াম। কিন্তু গৌণতঃ এরা এক একটা মনোভাবের পরিপোষক। পদ্মাসনে বস্‌লে মনটী পদ্মের মত শতদল মেলে বিকাশ পাবার আনুকূল্য পায়। যোনিমুদ্রা সুরু কর্‌লে ইন্দ্রিয়-সুখে-লাঞ্ছনাকারী দিগ্বিজয়ী পুরুষের রণস্পর্দ্ধী হুঙ্কার

যেন জেগে ওঠে। সাধারণ ব্যায়াম বা কুস্তি-কসরতের মধ্যে এই বিশেষত্বটুকু নেই।

যোগস্থ মানব চাই

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যদিও আসন মুদ্রাগুলি হঠ-যোগের অঙ্গ ব'লেই প্রকীর্ত্তিত, তবু এরা রাজ-যোগের রাজরথ্যার নির্ম্মাণ-কারক। যোগস্থ মনের এরা সৃষ্টি এবং যোগস্থ মন এদের হাতের সৃষ্টি। আজ সমগ্র দেশে সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ যোগস্থ পুরুষের, যোগস্থ নারীর প্রয়োজন। যোগস্থ যুবক অন্তর্ম্মুখ মন নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন কর্ব্বে অথবা বন্দুক ঘাড়ে ক'রে দেশের স্বাধীনতা রক্ষণের জন্য অকুতোভয়ে রণক্ষেত্রে অগ্রসর হবে। যোগস্থ গৃহস্থ অনাসক্ত-চিত্তে জিতেন্দ্রিয় সন্তানকে জন্মদান কর্ব্বে, যোগস্থ জননী অনাসক্ত চিত্তে নবজাত শিশুর মুখে স্তন্য সুধা প্রদান কর্ব্বে। মুচি, মেথর, মুদ্দফরাস থেকে সুরু ক'রে জ্ঞানী, পণ্ডিত, ধনী বা সম্রাট্ পর্য্যন্ত প্রত্যেকে যোগস্থ জীবন যাপন কর্ব্বে। এইটীই আমাদের আদর্শ।

বক্তৃতা হইল সোয়া দুই ঘণ্টা এবং আসন-মুদ্রা প্রদর্শন ও তাহার ব্যাখ্যা হইল পঁয়তাল্লিশ মিনিট। সভাস্থলে শ্রীশ্রীবাবামণি ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, আগামীকাল্য হইতে প্রত্যহ প্রাতে বেলা আট ঘটিকায় সমবেত ভাবে জন-

মণ্ডলীকে শ্রীযুক্ত দুর্গেশ্বর শর্ম্মার বাংলোতে যৌগিক আসন-মুদ্রা শিক্ষা দেওয়া হইবে।

শ্রীহট্ট

রবিবার, ৬ই মাঘ,১৩৪১

(২০শে জানুয়ারী,১৯৩৫)

প্রাতঃকালীন উপাসনা শেষ রাত্রেই সমাপ্ত হইয়াছে। তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি পত্র লিখিতে বসিলেন,—

তপস্যা ও কর্ম্মযোগ

পুপুন্‌কী আশ্রমের জনৈক কর্ম্মীকে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"অনুক্ষণ তপস্যায় ডুবিয়া থাকিয়া আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের অনুশীলনের যে পবিত্র ও প্রশংসনীয় মনোভাব তোমাদের ভিতরে ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতেছে, আমি তাহা সাহ্লাদ-দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিতেছি। কিন্তু ইহার সহিত আর একটী জিনিষ লক্ষ্য করিয়া কিঞ্চিৎ শঙ্কিতও হইতেছি। তাহা এই যে, তোমরা চাহ যে, তোমরা বসিয়া তপস্যা করিবে, আর আমি কিম্বা অপর কেহ তোমাদের সাধন-ধর্ম্মে উৎসর্গীকৃত দেহটার পরিচর্য্যার জন্য অন্ন, পানীয়, শয্যা ও বস্ত্রাদি আহরণ করিয়া দিয়া তোমাদিগকে নিজ শ্রমে দেহ-ধর্ম্মের দাবী মিটাইবার দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি দিব। ফলিতার্থ এই

যে, অভিক্ষুর প্রতিষ্ঠিত আশ্রমে একদল ভিক্ষুকের আবির্ভাব হইবে, যাঁহারা সরল মনে জন-সাধারণের কাছে ভিক্ষাপাত্র হস্তে গিয়া দাঁড়াইবেন না এই জন্য যে, তাহাতে তাঁহাদের 'অযাচক' নামক মহাকৌলীন্য-প্রদ উপাধিটী কিঞ্চিৎ ম্লান হইয়া যাইবে, কিন্তু যিনি এই ভিক্ষুকদিগকে আশ্রমের সীমানার ভিতরে ঢুকিবার অনুমতি দিয়াছিলেন, সেই হতভাগ্য আশ্রম-প্রতিষ্ঠাতা বা তাঁহার স্থলীয় অপর প্রধান ব্যক্তির কাছ হইতে ইঁহারা নিজ নিজ দেহের ক্ষুধা মিটাইবার জন্য যাবতীয় ভোজ্য, পানীয়, উপকরণ ও তৈজস আদায় করিয়া ছাড়িবেন। চিন্তা করিয়া দেখ, তোমাদের মনোভঙ্গী কতকটা এইরূপই হইয়া দাঁড়াইয়াছে কিনা। আমি ভিক্ষা না করিয়া, চাঁদা না তুলিয়া, লোকের বদান্যতাকে নিজের দিকে আকৃষ্ট না করিয়া, একটা প্রতিষ্ঠান চালাইব বলিয়াই 'অযাচক আশ্রয়' স্থাপিত হয় নাই, তোমরা যাহারা আশ্রমের অন্তেবাসী হইয়া আসিয়াছ বা ভবিষ্যতে আসিবে, তাহারাও নিজেদের শ্রমে নিজেদের দাবী মিটাইয়া এখানে অবস্থান করিবে, ইহাই হইতেছে এই আশ্রমের নাম 'অযাচক আশ্রম' হওয়ার প্রকৃত তাৎপর্য্য। ভূরি-পরিমাণ অন্ন আমি তোমাদের দিলাম না বা দিতে পারলাম না, ইহা তোমাদের অভিযোগ হওয়া উচিত নহে। অভিযোগ হইবে এই যে, নিজের অস্থিখণ্ড বিক্রয় করিয়া আমি অবিরাম তোমাদের যে অর্থ প্রেরণ করিতেছি, তাহার

অনুপূরণ করিবার জন্য তোমরাও নিজেদের অন্ন-সৃজনী প্রতিভাকে প্রয়োগ করিতেছ কিনা। আশ্রম-জীবনের তোমাদের প্রত্যেকটী অভাব এবং অভিযোগকে এই দৃষ্টিতে তোমরা বিচার কর এবং এই বিচারের আলোকে নিজেদের কর্ম্মকে পরিচালিত কর। আমি কি নিজে গিরিগুহায় নিজের জীবন ঈশ্বরানুধ্যানে কাটাইয়া দিতে পারিতাম না? হিমাচলের যে ডাক আমাকে আশৈশব আকর্ষণ করিতেছে, তাহার মর্য্যাদা রাখিবার জন্য আমি যদি হিমালয়-গুহাতেই দিন কাটাইয়া দিতাম, হিমালয় পর্ব্বত কি আমাকে লাঠি লইয়া তাড়াইতে আসিত? আমার নিজের অন্ন, নিজের পানীয়, সহজে সংগ্রহ করিবার পথগুলি কি আমার পক্ষে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে? তথাপি আমি আবশ্যকের অতিরিক্ত এই সুকঠোর শ্রম কেন তোমাদের জন্য করিতেছি? একপাল অলস ও পরমুখাপেক্ষীর সৃষ্টিই কি আমার লক্ষ্য? গতকল্য তোমাদিগকে দুইটী পৃথক্ মানিঅর্ডারে সাত শত টাকা পাঠাইয়াছি। কি ভাবে এই সাতশত টাকা আসিয়াছে, তাহা চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ কি? এই কয়টা দিনে শ্রীহট্টের আমি তৃণগুচ্ছ হইতে সুরু করিয়া অশ্বত্থ, বটাদি মহামহীরুহ পর্য্যন্ত প্রায় প্রত্যেকটী শিক্ষিত ও শিক্ষাভিমানী ব্যক্তিকে গোড়া ধরিয়া নাড়িয়াছি। শ্রীহট্টবাসীরা অকুণ্ঠিত কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন, যে, বিগত পঁয়ত্রিশ বৎসরের মধ্যে এরূপ ঝঞ্ঝা বহিতে তাঁহারা কেহ কখনও দেখিয়াছেন

বলিয়া স্মরণ করিতে পারেন না। কিন্তু এত বড় একটা অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টির পরেও আমি চাঁদা তুলিতে চেষ্টা করি নাই বা যে সাত শত টাকা তোমাদের পাঠাইয়াছি, তাহার মধ্যে একটী কপর্দ্দকও লোকের দান নাই। মানুষ আমার মুখের কথা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছে, আমাকে ভালবাসিয়াছে, তাই আমার গ্রন্থে কি লেখা আছে, তাহা জানিবার আগ্রহে চারি আনা, ছয় আনা, এক টাকা করিয়া বহুজনে মিলিয়া মোট সাত শত টাকার বহি কিনিয়াছে। সেই উপার্জ্জিত অর্থ তোমাদের প্রেরণ করিয়াছি এই জন্য যে, তোমরা ইহার সহায়তায় আবার সেখানে অর্থ সৃষ্টি করিবে এবং আমি যেমন তোমাদের পোষণের চিন্তা করিতেছি, তোমরা তেমন আরও দশ জনের বিশ জনের পঞ্চাশ জনের পোষণের চিন্তা করিবে। নিজের অন্নের অভাব বিন্দুমাত্র না থাকা সত্ত্বেও আমি যেমন তোমাদের জন্য ভাবিতেছি, আমার সৃষ্ট আনুকূল্যেকে অবলম্বন করিয়া তোমরা তেমন অপরের জন্য ভাব। নতুবা ত' আমার এই কথাই অনুতাপের সহিত অন্তরে জাগিবে যে, একদল অলসের জন্যই আমি আমার জীবনটাকে বিকাইয়া দিলাম। কয়েকটা চাকুন্দা গাছ কাটাইয়া দূর হইতে আনাইয়া তক্তা করিবার ভার যে তোমাদের উপরে দিয়াছি, তাহাতে তোমাদের অত্যধিক শ্রম যাইতেছে। নানাস্থানে দৌড়াদৌড়িতে তোমরা নাজেহাল হইয়া উঠিয়াছ।

কিন্তু এই তক্তা ও ফাইলগুলি আনিয়া তোমাদের নিশ্চিন্ত বিশ্রামের খাট-পালঙ্ক তৈরী হইবে না, তৈরী হইবে শত শত "মন্ত্রবাণী" বা "মটো"র ব্লক। কাঁঠাল কাঠে যে ব্লক কয়খানা অবিশ্রান্ত ভ্রমণের ফাঁকে ফাঁকে হাতুড়ী, বাটালি চালাইয়া তৈরী করিয়াছিলাম, তাহা হইতে ছাপান "মন্ত্রবাণী" গুলি লোকের অন্তরে নূতন প্রেরণা জাগাইয়াছে। আমি চাহিতেছি, এইরূপ সহস্র সহস্র ব্লক চাকুন্দা কাঠে নিজ হস্তে খুদিয়া বা অপরের দ্বারা খোদাই করাইয়া তাহা দ্বারা মুদ্রিত মন্ত্রবাণী-সমূহ দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে ব্যাপক ভাবে প্রচারিত করি। প্রতিদিন ঘরের দেওয়ালে সৎকথাগুলি দেখিতে দেখিতে অসৎ লোকেরও চরিত্রের মধ্যে নব বিবর্ত্তনের বিকাশ ঘটুক। আমি চাহি সমগ্র দেশকে জাগাইতে, আর তোমরা তোমাদের তপস্যানুরাগের দোহাই দিয়া নিষ্ক্রিয় হইতে চাহিতেছ। ইহা নিশ্চিতই তোমাদের সূক্ষ্ম আত্মপরীক্ষার বিষয়ীভূত হওয়া উচিত। তপস্বীর আজ প্রয়োজন আছে, কিন্তু পরান্নভোজী তপস্বী নহে, অপরের স্কন্ধ হইতে নিজের ভার যথাসাধ্য তুলিয়া নিয়া যাঁহারা নিজেদের পার্থিব প্রয়োজনের দাবী নিজেরা মিটাইয়াই তপঃপ্রদীপ্ত পবিত্র জীবন যাপন করিবেন, এই যুগের প্রয়োজন তেমন কর্ম্মযোগীর। অতীতের পানে তাকাইয়া কর্ম্মবর্জ্জিত যোগীদের মূর্ত্তি ধ্যান করিতে বসিয়া ভুলিয়া যাইও না, ভারত এখন পরাধীন;

ঋষি-বশিষ্ঠের তপস্যার আনুকূল্য সম্পাদনের জন্য ইক্ষ্বাকু বংশীয় দিগ্বিজয়ী রাজন্যবর্গ আজ নাই।”

আসন-মুদ্রা ও ভগবৎ সেবা

প্রাতে আট ঘটিকা হইতে সাড়ে নয় ঘটিকা পর্য্যন্ত যৌগিক আসন-মুদ্রার ক্লাশ করা হইল। হিন্দু, মুসলমান, যুবক ও বৃদ্ধ নানা শ্রেণীর সজ্জনই সমবেত হইয়াছেন।

উপদেশ-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—শরীরকে ঈশ্বরানুধ্যানের উপযুক্ত রাখ্‌ব, এই সঙ্কল্প নিয়েই আসন-মুদ্রার অভ্যাস করা উচিত। এই শরীর দিয়ে ঈশ্বরের কাজ কর্ব্ব, এই শরীরকে ভগবৎ-প্রীতি বর্দ্ধনের জন্য ব্যবহার কর্ব্ব, এই হওয়া উচিত লক্ষ্য। একমাত্র ভগবৎ-সেবা ব্যতীত দেহ-মন-প্রাণের অন্য কোনও উদ্দেশ্য থাক্‌বে না, আসন-মুদ্রা অভ্যাসকারীর মনোভঙ্গী এইরূপ হওয়া প্রয়োজন। তাতে শরীর ও মন থেকে তামসিকতা, স্বার্থপরতা ও লালসাতুরতা অতি দ্রুত দূর হ'য়ে যায়।

উপদেশ-সংগ্রহ

বেলা এগারটার শ্রীশ্রীবাবামণি চৌহাট্টা শ্রীযুক্ত লালমোহন রায়ের ভবনে আসিলেন। অদ্য মধ্যাহ্নের আহার এখানে হইবে। শ্রীশ্রীবাবামণির সঙ্গীয় ব্রহ্মচারী রান্নায় ব্যস্ত।

প্রতিবেশীদের গৃহ হইতে বহু পুরুষ ও মহিলা উপদেশ শ্রবণের জন্য আসিয়াছেন। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—উপদেশ শুন্‌বে নিজ নিজ প্রাণের ভিতরে কাণ খুলে। মুখের উপদেশ ত' উপদেশই নয়। আর মুখের উপদেশই যদি শুন্‌তে হয়, তবে রাজা গিরিশ চন্দ্র হাইস্কুলের প্রাঙ্গণে তা' তোমরা কম শুন্‌ছ না। কিন্তু মুখের কথা ত' মুখেই থেকে যায়, প্রাণে প্রবেশ করে কৈ? এজন্যই নিজ নিজ প্রাণের ভিতরে উঁকি মারো এবং সেখান থেকে উপদেশ সংগ্রহ কর।

ইষ্টমন্ত্র

শ্রীযুক্ত লালমোহন রায় প্রশ্ন করিলেন,—প্রাণের ভিতরে প্রবেশ করার পন্থা কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—তোমার গুরুই তোমাকে সেই বিষয়ে উপদেশ দিয়েছেন। ইষ্টমন্ত্রই হচ্ছে প্রাণের ভিতরে প্রবেশের পথ। ইষ্টমন্ত্রকে একান্ত ভাবে আশ্রয় কর। ইষ্টমন্ত্রকে জীবনের পরম আশ্রয়-রূপে গ্রহণ কর। দেখ্‌বে প্রাণের বাণী প্রাণের ভিতরে কেমন ভাবে ফুটে ওঠে।

জীবনকে সার্থক করার পথ

একটী কুমারী মেয়ে প্রশ্ন করিলেন,—জীবনকে সার্থক করার পথ কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নিজেকে সম্পূর্ণ-রূপে ইষ্টের চরণে অর্পণ করাই হচ্ছে জীবনকে সার্থক করার পথ। অহংবুদ্ধি, অভিমান, দুর্ব্বলতা ও আলস্য সব কিছু পরিহার ক'রে অবিরাম নিজেকে পুষ্পাঞ্জলির মত তাঁর চরণে ঢেলে যেতে হয়।

নিজের পানে তাকাও

অপরাহ্ণ চারি ঘটিকায় রাজা গিরিশ চন্দ্র হাইস্কুলে শ্রীশ্রীবাবামণির শেষ বক্তৃতা হইল। অদ্য অভূতপূর্ব্ব জন-সমাবেশ হইয়াছে। বক্তৃতার যে সংক্ষিপ্ত নোট রক্ষিত ছিল, তাহা কীটধ্বস্থ হওয়াতে আমরা অল্পই সন্নিবেশিত করিতে পারিলাম। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য জীবনাদর্শের এক বিস্তারিত তুলনা প্রদান করিয়া তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—হে ভারতের ঋষির সন্তান, নিজের পানে তাকাও, নিজের গৃহে ফিরে এস। নিজের অতীতকে, নিজের ভবিষ্যৎকে প্রাণের গভীর প্রীতি দিয়ে অভ্যর্থনা কর। বিদেশের কুকুরকে উপেক্ষা ক'রে দেশের ঠাকুরকে পূজা কর। অতীতে অবজ্ঞা যতই ক'রে থাক, ভারত-প্রতিভাকে আর অবজ্ঞা ক'রো না।

ভারতের Mission বা লক্ষ্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভারতের মৃত্তিকায় দাঁড়িয়ে,

ভারতের স্তন্য-রস আহরণ ক'রে, যে মহামহীরূহ অদূর-কালে আত্মপ্রকাশ কর্ব্বে তার শাখা-প্রশাখা একদা সমগ্র জগতের আকাশ ছেয়ে ফেলবে এবং বিভীষিকার সৃষ্টি ক'রে নয়, পরপীড়নের প্রশ্রয় দিয়ে নয়, শান্তির, প্রীতির, পবিত্রতার সুস্নিগ্ধ ছায়া বিতরণ ক'রে জগতের শত-ভেদ-ক্লিষ্ট পরস্পর-বিদ্বিষ্ট জাতি-সমূহের মধ্যে ঐক্য এবং সমতার সাধনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত কর্ব্বে। জগতে ভারতের একটা mission আছে, যে মিশন বা উদ্দেশ্য পরিপূরণের পূর্ব্বে আমাদের কারো বিশ্রাম করার অধিকার নেই। প্রত্যেক ভারত-সন্তান সেই বিষয়ে অবহিত হও। জগতের প্রতি প্রত্যেক ঋষি-সন্তানের কর্ত্তব্য আছে। আমরা সে কর্ত্তব্য পালন কর্ব্ব। দুস্তর কর্ত্তব্যের সমুদ্রতুল্য প্রসার এবং ঝঞ্ঝার মত বিরুদ্ধতা দেখে আমরা পশ্চাদপসরণ কর্ব্ব না, পরাজয় স্বীকার কর্ব্ব না। এই হবে আমাদের মূলমন্ত্র। এস ভ্রাতা, এস পুত্র, এস পিতা, এস ভগ্নী, এস মাতা, এস কন্যা, আমরা আজ প্রতিজ্ঞা করি যে, আমাদের হৃদয় শোণিতের বিনিময়ে আমরা ভারতের লুপ্ত প্রতিষ্ঠা ফিরিয়ে আন্‌ব, জীবনোৎসর্গের বিনিময়ে আমরা ভারতমাতার স্বর্ণ-সিংহাসনকে সর্ব্বপ্রকার দাসত্বের অপবাদ থেকে মুক্ত করব। মুক্তির আমরা সৈনিক, বিশ্বতোমুখ শান্তির আমরা অগ্রদূত।

অমৎসর সেবা

রাত্রে শ্রীশ্রীবাবামণি কতিপয় পত্র লিখিলেন।

একখানা পত্রে লিখিলেন,—

"সেবা জগতে অতীব আদরণীয় বস্তু। ঈর্য্যাহীন সেবা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আদরণীয়। কেননা, এই সেবা কাহারও অপ্রীতি উৎপাদন না করিয়া সেব্যের তৃপ্তি বিধান করিয়া থাকে। সেবার শক্তি অসাধারণ, কিন্তু ঈর্ষ্যাহীন সেবার শক্তি অতুলন। ইহাকে উপেক্ষা করিয়া যাইবার সাধ্য জগতের কাহারও নাই। প্রকৃত সেবক হইবার জন্য তোমরা অমৎসর ও নিরহঙ্কার হও। অবশ্য, অমৎসর হওয়া সহজ নহে, কিন্তু তাহার ফলও সামান্য নহে।"

অকৃতজ্ঞতার অপরাধ

অপর এক পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"বাবা হে, জীবনে যত অপরাধই কর, আমি মনে করি, ক্ষমা প্রত্যেকটারই আছে এবং হইবে। কিন্তু অকৃতজ্ঞতার ক্ষমা নাই। মতি-ভ্রম বশতঃ জীবনে যে দোষ কর, যে ক্রটী কর, কষ্ট হইলেও মানিয়া লইব। কিন্তু অকৃতজ্ঞ হইও না। এই পৃথিবীতে বেইমানের জন্য কোনও সম্মান-যোগ্য স্থান থাকা উচিত নহে এবং প্রকৃত প্রস্তাবে নাইও। এক বেইমানেই অপর বেইমানকে তারিফ করিয়া থাকে, জগতের কোনও

সৎলোক কোনও অকৃতজ্ঞের আচরণকে প্রশংসার দৃষ্টিতে দর্শন করে না। অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি সংসারের চিতাগ্নিস্বরূপ। ইহারা সংসার ধ্বংস করে, সমাজ ধ্বংস করে, দেশের সর্ব্বনাশ করে। যে স্বার্থপরতার উদ্বীজনে ইহারা অকৃতজ্ঞ হয়, ইহাদের সহিত সংস্পর্শ-রক্ষাকারী ব্যক্তিরা সেই স্বার্থপরতার ঘৃণ্যতম অনুকরণ করিয়া নিজ নিজ জীবনের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক কুশলের মূলে কুঠারাঘাত করে। বেইমানের সংসর্গ করিয়া কোনও মানুষের হিত সাধিত হইয়াছে, এইরূপ দৃষ্টান্ত এই জগতে বোধ হয় কেহই দেখাইতে সমর্থ হইবে না। যীশুকে ক্রুশকাষ্ঠে আরোপিত করিবার হেতু হইয়াছিল এক বেইমান। পৃথিবীর মানুষ সেই বেইমানের নাম ঘৃণার সহিত উচ্চারণ করিয়া থাকে, শ্রদ্ধার সহিত নহে, প্রীতির সহিত নহে। এই একটী মাত্র দৃষ্টান্ত হইতে বেইমানের ভাগ্য সমঝিয়া লও। যে তোমাকে কোলে-কাখে করিয়া মানুষ করিল, যে তোমার রোগে সেবা, শোকে সান্ত্বনা দিয়া তোমাকে নিয়ত রক্ষা করিল, যে তোমার মুখের অন্নমুষ্টি নিজে অর্জ্জন করিয়া খাওয়াইল, যে তোমাকে দুনিয়ার সহস্র অযোগ্যের অন্যতম জানিয়াও কেবল দেহের ধর্ম্ম প্রভাবিত হইয়া দশ জনের পূজার আসনে বসাইয়া দিয়া তোমার প্রভাব, প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তি বর্দ্ধনে আপ্রাণ যত্ন লইল, তোমার উজ্জ্বল বর্ত্তমান অংশতঃ হইলেও যাহার শ্রম ও আত্মত্যাগের

ফল, তাহারই বিরুদ্ধে গুপ্ত-ছুরিকা ধারণের পূর্ব্বে একবার চিন্তা করিয়া দেখিও, অতঃপর মানব-সমাজ তোমার ঘৃণিত নাম কতখানি অশ্রদ্ধার সহিত উচ্চারণ করিবে। ব্রুটাস লম্বা লম্বা আদর্শ-বাদের বুলি আওড়াইয়াই নিজের আচরণকে সমর্থন করিয়াছিল, কিন্তু জুলিয়াস সিজারের হত্যার পরে পৃথিবীর মানুষ এই অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে পূজার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া সম্বর্দ্ধনা করে নাই।"

অকৃতজ্ঞের আত্ম-পক্ষ সমর্থন

"তুমি অপরের বুদ্ধিতে পড়িয়া বেইমানি করিয়াছ, ইহা একটা সাফাই-ই নহে। এই সাফাই গাহিয়া মানুষের মনে বিশ্বাস উৎপাদন করিতে পারিবে না। একটা দুগ্ধ-পোষ্য শিশুও এই কথা বিশ্বাস করিবে না। বিনা দ্বিধায় ইহারা তোমাকে অনৃতভাষী বলিয়া সাব্যস্ত করিবে। হাজার যুক্তির বহর খুলিয়াও তুমি তাহাদের অন্তরের এই ধারণা পরিবর্ত্তিত করিতে পারিবে না। বেইমানকে কেহ বিশ্বাস করে না। বেইমান যে সত্য কথা কহিতে জানে, একথা কেহ সম্ভব জ্ঞান করে না। অকৃতজ্ঞকে জগতের লোক চিরকালই অসত্যবাদী, কপটাচারী, অসরল ও দুরভিসন্ধিপরায়ণ বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকে। হুজুগে পড়িয়া বেইমানী করিয়াছ শুনিবার পরে কেহ হুজুগের উপরে চটিবে না, তোমার উপরেই

চটিবে। উপকারী ব্যক্তির অপকার করিতে যাহার বিবেক বাঁধে না, উপকারী ব্যক্তির অনিষ্ট সাধনে যাহার হাত কাঁপে না, উপকারী ব্যক্তির অহিতকামীদের সহিত বন্ধুত্ব-সংরক্ষণে ও বন্ধুত্বের অনুশীলনে যাহার অরুচি হয় না, জগতে তেমন ব্যক্তিকে কেহ পাপিষ্ঠ ব্যতীত দ্বিতীয় কোনও সম্বোধনে ডাকিবে না, ডাকিতে পারে না। তোমার উপকারী ব্যক্তির পরোক্ষ হিত-সাধনের উদ্দেশ্যেই তুমি তাহার বিরুদ্ধাচরণকারীদের সহিত গিয়া গোপন মৈত্রী স্থাপন করিয়াছিলে, নিজের অপকার্য্য সমর্থনের জন্য নহে, এইরূপ কুযুক্তি তুমি দিতে পার। জগতের অনেক অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিই অনুরূপ ক্ষেত্রে অনুরূপ কুযুক্তির প্রয়োগ করিয়া থাকে। কিন্তু জগতের লোককে এত মূর্খ ভাবিও না যে, তাহারা এক নিঃশ্বাসে তোমার এই আজগুবি কথাগুলি শুনিয়া যাইবে, বিনা প্রতিবাদে প্রত্যেকটী অক্ষর গিলিতে থাকিবে এবং কুণ্ঠাহীন মনে কথাগুলি মানিবে। তোমার কথার একটা অক্ষরও তাহারা বিশ্বাস করিবে না, বিশ্বাস করিতে পারে না। দুধকলা দিয়া যেই সর্পকে পোষণ করা হইয়াছে, সে যদি নিজ অন্নদাতাকে দংশন করিবার পরে শাস্ত্র-বচন আওড়াইয়া বলিতে থাকে যে, সে উপকারীর প্রত্যুপকার মানসেই এই দংশন ও বিষোদ্গার করিয়াছিল, তবে তাহা পাগলা-গারদের বন্দীরাও বিশ্বাস করিতে চাহিবে না।

উপকারীর প্রকাশ্য বিরোধ

'পৃথিবীতে এমন অবস্থা আছে, যেই সময়ে উপকৃতকে উপকারীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হয়। কিন্তু সেই দাঁড়ান গোপনে নহে, প্রকাশ্যে। উপকৃতকে সকল অবস্থা সম্পর্কে অন্ধ রাখিয়া নহে, তাহার নিকটে অকপটে সকল ঘটনা জ্ঞাপন করিয়া। আদর্শবাদী ব্যক্তি যখন আদর্শ-সঙ্কটে পড়িয়া আদর্শ ও কৃতজ্ঞতা এই দুই মহারক্ষণীয় বস্তুর মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে অসমর্থ হয়, তখন সে গুপ্তঘাতকের ছায়াবৃত গোপন পথ ধরে না, পরন্তু অর্জ্জুন যেমন ভীষ্ম ও দ্রোণের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে অস্ত্র ধরিয়াছিলেন, তদ্রূপ করে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্ব-রজনীতে যুধিষ্ঠির কি ভীষ্মকে প্রণাম করিতে যান নাই এবং প্রকাশ্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া যাহাতে নিজে জয়ী হইতে পারেন, সেই আশীর্ব্বাদ যাচ্ঞা করেন নাই? ভীষ্মকে কি নিজ গুরু পরশুরামের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হয় নাই? নিজে যাহাকে কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান করিয়াছিলেন, তাহা রক্ষা করার দায়ে ঠেকিয়াই তিনি তাহা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সকল যুদ্ধ যুধ্যমান ব্যক্তিদের জীবনের আচরণে কলঙ্ক-লেপন করিতে পারে নাই। ইঁহারা কেহই নীচাত্মা ব্যক্তি ছিলেন না, তাই গোপন পথে অস্ত্র-পরিচালনার আবশ্যকতা অনুভব করেন নাই। যাহারা গোপন পথে চলে,

জগতের লোক তাহাদিগকে কখনই সদাত্মা বলিয়া বিবেচনা করিবে না।

উপকারীর কুৎসা-প্রচার

"পরমহিতকারী প্রতিপালক ব্যক্তির সদিচ্ছা ও সদাচরণ-সমূহের কুব্যাখ্যা করিয়া গোপনে গোপনে তাহা ব্রহ্মাণ্ডময় ছড়াইয়া বেড়াইবার মত হীন কার্য্য জগতে আর কি আছে, তাহা আমি অনেক না ভাবিয়া বোধ হয় বলিতে পারিব না। কিন্তু বেইমানদিগের ইহাও এক সাধারণ ধর্ম্ম হইতে দেখা যায়। যিনি একদা হাতে ধরিয়া টানিয়া সুগভীর পঙ্কাবর্ত্ত হইতে তুলিয়াছিলেন, তাঁহারই অতি সাধারণ ব্যবহার-সমূহের মধ্যে নানা প্রকার অভিসন্ধি আরোপ করিয়া গুপ্ত ভাবে তাহা চতুর্দ্দিকে প্রচার করতঃ তাঁহার বিরুদ্ধে এক সুপ্রবল জনমত সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে বিপন্ন, অসুবিধাগ্রস্ত বা আতঙ্কগ্রস্ত করা বর্ত্তমান যুগের বেইমানদের একটা বহুপ্রচলিত পন্থা। এই যুগকে গণতন্ত্রের যুগ বলা হইয়া থাকে এবং লোকের রসনার দাপটে কত দুরাত্মাও মহাত্মা হয়, কত মহাত্মাও দুরাত্মা হয়। বারংবার জয়ঢাক পিটাইতে পিটাইতে এবং শোভাযাত্রায় নানা প্রকারের 'শ্লোগান' উচ্চারণ করিতে করিতে এই যুগে "হয়"কে "নয়" এবং "নয়"কে "হয়" করা হইয়া থাকে। একদিকে কতকগুলি মস্তিষ্কহীন কাণ-কাটার দলকে

একত্র করিয়া সংখ্যার জোরে অর্থাৎ ভোটের জোরে মস্তিষ্কবান্ অক্ষতকর্ণ ব্যক্তিদিগকেও গর্দ্দভের পর্য্যায়ে নিক্ষেপ করা যায়। এই কারণেই প্রতিপালকের কুৎসা-প্রচার প্রতিপালিত ব্যক্তিদের বর্ত্তমান-যুগীয় বেইমানির একটা বিশিষ্ট লক্ষণে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। নিতান্ত বর্ব্বর ব্যক্তিও মাতার কিম্বা মাতৃসমা ব্যক্তির কুৎসা রটনা করে না, কিন্তু এই সকল অমানুষ যেই স্তন চুষিয়া দুগ্ধ সেবন করিবে, সেই স্তনেই দন্তাঘাত করিয়া ক্ষতসৃষ্টি করিবে, যে পাতে খাইবে সেই পাতেই হাগিবে।

"আমি তোমাদিগকে এই জাতীয় মহাপাতক হইতে মুক্ত থাকিবার জন্য আজ সতর্ক করিয়া দিতেছি। কেননা, সকল পাপেরই ক্ষমা আছে, অকৃতজ্ঞতার ক্ষমা নাই।"

দাম্পত্য সম্বন্ধকে স্বাভাবিক করিবার উপায়

অপর এক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"স্বামী এবং পত্নীর মধ্যে সম্বন্ধটী এত মধুর যে, কোথাও স্বামি-স্ত্রী পরস্পরের অপরিসীম মনোমিলনের মধ্য দিয়া পরমসুখে আছে, এই সংবাদ শুনিলে বিস্ময় জাগে না, মনে হয় ইহাই ত' স্বাভাবিক। কোথাও স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে মিল নাই, এই সংবাদই বরং বিস্ময়কর। কিন্তু যাহা বিস্ময়কর,

তাহাই আজ ঘরে ঘরে ঘটিতেছে, যাহা পরমস্বাভাবিক, তাহাই একান্ত দুর্ঘট হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার কারণ কি এই নহে যে, যেখানে একে অন্যের সুখ দেখিবে, সেখানে প্রত্যেকে নিজ নিজ সুখের দিকেই দৃষ্টিকে একান্ত ভাবে নিবিষ্ট করিয়াছে? স্বামী স্ত্রীকে চাহে নিজের সুখের জন্য, স্ত্রীও স্বামীকে চাহে নিজের সুখের জন্য। স্ত্রীর সুখের জন্যই স্বামী নহে বা স্বামীর সুখের জন্যই স্ত্রী নহে। একের সুখ-সম্পাদনের জন্য অপরে নিজ সুখাশায় জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত নহে। প্রত্যেকেই নিজের ব্যক্তিগত সুখের মায়া-মরীচিকার অনুসরণ করিতেছে। এই অবস্থাটাকে তোমরা ফিরাও। দম্পতী একে অন্য হইতে দেহ, মন, বাক্য ও ব্যবহারের সুখ আদায় করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। তৎপরিবর্ত্তে একে অন্যকে দেহে, মনে বাক্যে এবং ব্যবহারে সুখ দিতে কৃতসঙ্কল্প হউক। উভয়ে উভয়ের ব্যক্তিগত সুখ-তৃষ্ণা ভুলিয়া যাউক, একে অন্যের সুখ-সম্পাদনের ব্রত গ্রহণ করুক, একে অন্যের সুখকে ক্রমবর্দ্ধিত করিবার উপায় আবিষ্কার করিতে অভিনিবিষ্ট-চিত্তে আত্ম-নিয়োগ করুক, একের পরিতৃপ্তি কি করিলে স্থায়ী, গভীর এবং নিবিড় হইতে পারে, সেই অনুসন্ধিৎসা নিয়া অপরে গবেষণার প্রবৃত্ত হউক। দাম্পত্য সম্বন্ধকে স্বাভাবিক করিবার ইহাই হইতেছে একমাত্র কৌশল।"

শ্রমে কাতর হইও না

অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

'পরিশ্রমে যে কাতর নহে, সে হতাশ হইবে কেন? কাজ করিয়া যাও, থামিও না। যাহা তোমার চাহি, তাহা কর্ম্মেরই ফলে করায়ত্ত হইবে। এই বিশ্বাস লইয়া কাজ করিতে থাক। কাজ কর অসুরের মত, কিন্তু মনকে রাখ ঋষির মত। কর্ম্মে থাকিবে বিক্রম, লক্ষ্যে থাকিবে সাত্ত্বিকতা। কর্ম্মের প্রয়াসের ভিতরে দুর্ব্বলতাকে বাসা বাঁধিতে দিও না। দুর্ব্বলেরা এজগতে ঘৃণ্য পরাভব অর্জ্জন করিয়া তোমাকে দেখাইয়া দিয়াছে যে, দুর্ব্বল হওয়া কত বড় পাপ, দুর্ব্বল হওয়া কত বড় দোষ। দুর্ব্বল হইও না। কর্ম্মের মধ্য দিয়া ভগবানকে প্রীত কর। তিনি তোমার ক্ষীণ বাহুযুগলকে ভীমবাহুবৎ কার্য্য করিতে দেখিলে প্রীত হইবেন। তিনি তোমার ক্ষুদ্র শক্তিকে অপার অসীম শক্তিবৎ মহৎ কার্য্যে নির্ভয়ে নিয়োজিত হইতে দেখিলে প্রীত হইবেন। তিনি তোমার রুচি, প্রকৃতি, প্রবৃত্তির মাঝে তোমার একনিষ্ঠ দৃঢ়কর্ম্মা মূর্ত্তির ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করিয়া নিরন্তর প্রীত হইতে চাহেন। তিনি প্রীত হইলে, জগতে আর দুঃখ থাকে না। সুতরাং পরিশ্রমে কাতর হইও না। শয্যা ছাড় তাঁর কাজ করিবে বলিয়া, নিদ্রাগত হও তাঁরই কাজ করিবে বলিয়া। জাগরণে এবং নিদ্রায় সম-ভাবে

তাঁর কাজ করিয়া যাইবার সুতীব্র অভীপ্সা অন্তরে জাগরিত কর।"

শ্রীহট্ট

সোমবার, ৭ই মাঘ, ১৩৪১

(২১শে জানুয়ারী ১৯৩৫)

শ্রীহট্টে যে কঠোর পরিশ্রম হইবে, তাহা শ্রীশ্রীবাবামণি পূর্ব্বেই অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন। এজন্য নিয়ম করিয়া প্রত্যহ প্রাতে অর্দ্ধঘণ্টা পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া আসিতেছেন। অদ্য ভ্রমণকালে বাহিরের দুই জন লোক সঙ্গী-রূপে রহিয়াছেন।

মাতাপিতার আদেশে হত্যাকার্য্য

তন্মধ্যে জনৈক জিজ্ঞাসু প্রশ্ন করিলেন,—বাবামণি, আপনি ত' প্রত্যেককে মাতৃ-পিতৃ ভক্তি সম্পন্ন হবার জন্য সর্ব্বদা উপদেশ দেন। কিন্তু আমার জিজ্ঞাস্য হচ্ছে যে, আমার মা যদি আমার স্ত্রীকে হত্যা কত্তে আদেশ দেন, তবে আমার কর্ত্তব্য কি হবে?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—যাকেই কর, হত্যা করা নিশ্চয়ই পাপ। শুধু নৈতিক পাপ নয়, রাজার আইনেও পাপ। সুতরাং কারো আদেশেই তুমি স্ত্রীহত্যা কত্তে পার না।

প্রশ্নঃ—স্ত্রী যদি দ্বিচারিণী হয়?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—তুমি তাকে ত্যাগ কত্তে পার, হত্যা কত্তে পার না।

প্রশ্ন।—পরশুরাম ত' পিতার আদেশে মাতৃ-হত্যা করেছিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—তৎকালে বোধ হয় রাজার আইন হত্যাকারী ব্রাহ্মণকে স্পর্শ কত্ত না। নইলে কেন যে মাতৃহত্যার অপরাধে পরশুরামকে রাজদ্বারে যেতে হয় নি, তা' আমি বুঝতে পাচ্ছি না। কিন্তু নীতির বিচারে, ধর্ম্মের বিচারে তিনি অব্যাহতি পান নি। এই জন্যই পুরাণে বর্ণিত আছে যে, তাঁকে আসামের শেষ প্রান্তে গিয়ে ব্রহ্মকুণ্ডে প্রায়শ্চিত্ত-মূলক তপস্যা কত্তে হয়েছিল। তার আগ পর্য্যন্ত মাতৃঘাতী পরশু তাঁর হাত থেকে খসে নি। শাস্ত্রকারগণের দৃষ্টিতে হত্যা সর্ব্বাবস্থাতেই পাপ। নিকুম্ভিলা যজ্ঞের সময়ে সাধারণ সমর-নীতি উল্লঙ্ঘন ক'রে লক্ষ্মণ রাবণ-নন্দন ইন্দ্রজিৎকে বধ করেছিলেন, এই জন্য তাঁকে লছমন-ঝোলার কাছে লছমনকুণ্ডে এসে প্রায়শ্চিত্ত-মূলক তপস্যা কত্তে হয়েছিল।

বিপজ্জনক পিতৃভক্তি

প্রশ্ন।—পরশুরাম একজন জ্ঞানী ব্যক্তি হ'য়েও মাতাকে কেন পিত্রাদেশে হত্যা কর্লেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—পরশুরামের ধ্যান, জ্ঞান ও তপস্যা ছিল পিতৃসেবা। পিতা স্বর্গঃ, পিতা ধর্ম্মঃ, পিতা হি পরমন্তপঃ,

পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ—এই ছিল তাঁর মূলমন্ত্র। তিনি তাঁর নিজের পিতৃভক্তি-মূলক নিষ্ঠায় এত দৃঢ় ছিলেন যে, কোনও অবস্থাতেই যে মাতৃহত্যার ন্যায় অপরাধ করা যায় না, একথা তিনি চিন্তামাত্রও করেন নি। তাঁর মাতৃহত্যা একদিকে যেমন নির্ব্বিচার পিতৃভক্তির অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, অপর দিকে তেমনি বিচার-বিবেচনায় অনিচ্ছারও আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত। সৈনিক তার সেনাপতির আদেশ নির্ব্বিচারেই পালন করে, কিন্তু সেনাপতি যদি বলেন বিজিত পল্লীর নারীগুলির উপরে বলাৎকার কর, বালিকা বা বৃদ্ধাগুলিকেও বাদ দিও না, ঘরে ঘরে আগুন জ্বালাও এবং শিশুগুলিকে সেই আগুনে নিক্ষেপ কর,—তা'হলে এ আদেশ যে সৈনিক পালন কর্ব্বে, সে ভাল সৈনিক ব'লে পরিগণিত হ'তে পারে, কিন্তু মানুষ হিসাবে তার বিচার কত্তে গেলে সে গণ্য হবে পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট ব'লে। মাতা বা পিতা গুরুজন ব'লেই তাঁদের আদেশে হত্যা, বলাৎকার, গৃহদাহ, প্রভৃতির মত গুরুতর পাপের অনুষ্ঠান করা যায় না।

মাতা ও পত্নীর বিরোধে কর্ত্তব্য

প্রশ্নকর্ত্তা।—আমার পত্নী যদি দ্বিচারিণী না হন, কিন্তু নানা কারণে আমার মাতৃদেবীর রোষ উৎপাদন ক'রে থাকেন, এবং তদবস্থায় যদি আমার মাতা আমার স্ত্রীকে পরিত্যাগ

পূর্ব্বক পুনরায় বিবাহ কত্তে আদেশ দেন, তাহ'লে আমি কি কর্ব্ব?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—যে পত্নীর সতীত্ব সম্পর্কে কোনও প্রশ্নই নেই, সেই পত্নীকে সামান্য অবান্তর অপরাপর ত্রুটীতে পরিত্যাগ করা ধর্ম্মবিরোধী হবে। বরং পত্নীর সঙ্গে আলোচনা ক'রে তার সম্মতি নিয়ে মাতার তুষ্টির জন্য কিছু কালের জন্য তাকে দূরে রাখা যেতে পারে। যে সমাজে স্বামি-পত্নীর বিবাহ-বিচ্ছেদের নিয়ম নেই, সেই সমাজে বিনা অপরাধে বা লঘু পাপে স্বামী তার স্ত্রীকে ত্যাগ কত্তে পারে না। সেটা অধর্ম্ম হয়। কিন্তু মাকে সন্তুষ্ট করার জন্য সাময়িক বা দীর্ঘকালের জন্য বিরহ বরণ করা চলে। একই স্ত্রী জীবিত থাক্‌তে পুনরায় বিবাহ ক'রে আর একটী যুবতীকে পাণিগ্রহণের অর্থ হচ্ছে, দূরাপসারিত পত্নীকে প্রকারান্তরে দ্বিচারিণী হবার জন্য ইঙ্গিত করা। সুতরাং প্রথমা পত্নীকে দূরে সরিয়ে দিয়ে তুমি ঘরে ব'সে আইবুড়ো ছেলের মত একাকীই প্রাণান্ত যত্নে মাতৃ-সেবা ক'রে তাঁর সন্তোষ-বিধানের চেষ্টা কর্ব্বে, কিন্তু কোনও অবস্থাতেই আর একটী মেয়েকে বিবাহ ক'রে ঘরে আন্‌তে পার না।

রামচন্দ্রের দৃষ্টান্ত

প্রশ্নকর্ত্তা।—আমার প্রথমা পত্নী যদি এই বিবাহে নিজ সম্মতি দেয়?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—দিতে পারে, আশ্চর্য্য নয়। স্বামীর সুখকে যে নিজের সুখ ব'লে জ্ঞান করে, এমন সাধ্বী পত্নী নিজের দুর্ভাগ্যকে বরণ ক'রে দূরে স'রে গিয়ে স্বামীকে পুনরায় বিবাহ কত্তে অনুমতি দেবেন,—এটাই এদেশে স্বাভাবিক। কিন্তু তুমি যদি বিবাহও কর, তবু এক সাধ্বী রমণীর অধিকারে যে হস্তক্ষেপ করেছ, এই কথা তোমার জীবন থেকে তুমি মুছে ফেল্‌তে পার্‌বে না। রামচন্দ্র অত বড় একজন সম্রাট্ হয়েও সীতার বনবাসের পরে সীতার পরিবর্ত্তে অপর একজন মহিষী গ্রহণ কর্লেন না, যদিও এই রামচন্দ্রেরই পিতা বহু নারীর স্বামী ছিলেন। রামচন্দ্রের এই দৃষ্টান্ত থেকে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।

দেখা না হইতেই দীক্ষা

অদ্য বেলা দশ ঘটিকা হইতে বেলা তিন ঘটিকা পর্য্যন্ত অবিশ্রাম দেখা-সাক্ষাতের পালা চলিয়াছে। অধিকাংশেই পূর্ব্ব হইতে সাক্ষাতের জন্য সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন।

একজন সাক্ষাৎকারী বলিলেন,—আমি অমুক আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতার চরণদর্শনের জন্য গিয়েছিলাম। তিনিও আপনার মত এক এক জন ক'রে লোককে দেখা দেন। তিনি আমাকে জোর ক'রে একটী মন্ত্র দিয়ে ব'লে দিয়েছেন যে, তিনি আমার গুরু হ'লেন। আপনার সঙ্গেও একাকী দেখা কত্তে হবে শুনে আমার মনে সেই ভয় হয়েছিল।

শ্রীশ্রীবাবামণি অট্টহাসি হাসিয়া বলিলেন,—আমি যে বাবা দেখা না হ'তেই দীক্ষা দেই, সে কথা বুঝি জানো না? এজন্যই কেউ দেখা কত্তে এলে তাকে মন্ত্র দেওয়ার আমার প্রয়োজন হয় না।

শ্রীহট্ট

মঙ্গলবার, ৮ই মাঘ,১৩৪১

(২২শে জানুয়ারী, ১৯৩৫)

প্রাতে শ্রীশ্রীবাবামণি বহু পত্রলেখকের পত্রের উত্তর প্রদান করিলেন।

আদর্শ সমাজে সংসার ও সন্ন্যাস

জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"আদর্শ সমাজে সংসার এবং সন্ন্যাস পরস্পরের হাত ধরিয়া চলে, একে অপরের অনুপূরণ করে, একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া কলহের সৃষ্টি করে না। যেখানে দেখিবে, সংসার ও সন্ন্যাস পরস্পর বিবদমান, সেখানেই বুঝিবে যে, সমাজের ভারসাম্য বিনষ্ট হইয়াছে, এই সমাজ পতনোম্মুখ।

আদর্শ সংসারে স্বামী এবং পত্নী

"আদর্শ সংসারে আবার স্বামী এবং পত্নী একে অন্যের

হাত ধরিয়া চলে, একে অন্যের অভাব পূরণ করে, একে অপরকে আঘাত করিয়া পরস্পরের শক্তিক্ষয় করে না। যেখানে দেখিবে, স্বামী এবং পত্নীর মধ্যে মিলের অভাব, সেখানেই বুঝিবে যে, সংসারের ভিতরে মৃত্যু প্রবেশ করিয়াছে, এই সংসার ধ্বংসোম্মুখ।

সমাজের শ্রেষ্ঠতা-বিচারের মাপকাঠি

"সমাজের শ্রেষ্ঠতার বিচার আমি দুইটী মাপকাঠি দিয়া করিয়া থাকি। একটী হইতেছে, পতি-পত্নীর প্রেমের একনিষ্ঠতা। অপরটী হইতেছে, ভ্রাতায় ভ্রাতায় অকপট-প্রীতি। যে সমাজে ইহা আছে, সেই সমাজই শ্রেষ্ঠ সমাজ। যে সমাজে ইহা নাই, তাহা নামে মাত্র মানুষের সমাজ, নতুবা প্রকৃত প্রস্তাবে এখনও বন-মানুষের সমাজই রহিয়া গিয়াছে।

"তোমরা যে শ্রেষ্ঠ-সমাজে বাস করিতেছ, ইহার প্রমাণ তোমাদের একক এবং সঙ্ঘবদ্ধ আচরণ-সমূহের মধ্য দিয়া দিতে হইবে। নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া ঢাক পিটাইলেই কেহ শ্রেষ্ঠ হয় না। যাহার বা যাহাদের সংস্পর্শে আসিয়া অপর মানুষ বা সমাজ অনুকরণের যোগ্য সদ্‌গুণ বিনা চেষ্টায় দেখিতে পায়, সেই সমাজই প্রকৃত শ্রেষ্ঠ সমাজ। অনুরকণ সকল সময়েই সংসর্গকে অনুসরণ করে। কিন্তু অনুকরণ-মাত্রেই অনুকৃত সমাজের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দেয় না। পাশ্চাত্য

সমাজের জীবনকে অনুকরণ করিয়া আমরা যৌথ পরিবার ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলাম, পিতার জীবদ্দশায় পুত্র ও পুত্রবধূ ভিন্ন হাঁড়িতে রাঁধিয়া খাইল, এক সহোদর যখন রাস্তায় আবর্জ্জনা-স্তূপ হইতে পর্য্যুষিত অন্নকণা কুড়াইয়া খুটিয়া খাইতেছে, অপর সহোদর সেই সময়ে রোল্স্-রয়েস মটর-কার তীরবেগে ছুটাইয়া পথের ধূলির পুঞ্জায়মান ঘূর্ণিপ্রবাহে পথিকের প্রাণে ত্রাস-সঞ্চার করিতেছে। এই যে শিক্ষা আমরা বিদেশীদের কাছ হইতে গ্রহণ করিলাম, ইহা দ্বারা শ্বেতাঙ্গদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় নাই।

সৎ-সংসারীর দায়িত্ব

"আমি চাহি যে, তোমরা শুধুই সংসারী হইও না, সৎ সংসারী হও, পরিবারের অন্তর্ভুক্ত এবং ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকটী ব্যক্তির সৎ-প্রেরণার স্ফূর্ত্তি-বিধানের হেতুভূত হও। বৃদ্ধ হইতে শিশু পর্য্যন্ত, প্রভু হইতে ভৃত্য পর্য্যন্ত, গৃহস্বামিনী হইতে দাসী পর্য্যন্ত, এই পরিবারের সহিত সংশ্লিষ্ট ধোপা, নাপিত, মেথর, মুচি পর্য্যন্ত প্রত্যেকের ভিতরে নিত্য নূতন হিতচিন্তার উদ্বোধক হও। ধর্ম্মে, কর্ম্মে, সাধনায়, সংযমে, আদর্শে ও অনুশীলনে শুধু ব্যক্তিগত ভাবেই মহৎপথাশ্রয়ী হইবে, তাহা নহে, সংসারস্থ এবং সংসারের সহিত প্রত্যক্ষ ও গৌণ সম্বন্ধ-বিশিষ্ট প্রত্যেকের ভিতরে ঠিক্ সেই পথাশ্রয়ের প্রেরণা অবিরাম যোগাইতে হইবে। সন্ন্যাসীরা লোকালয়

ছাড়িয়া বিজনে যাইয়া আশ্রমাদি রচনা করেন বলিয়া প্রাথমিক উদ্যমে তাহাদের পক্ষে প্রতিবেশীদের সম্পর্কে কিছুই দায়িত্ব থাকে না। কিন্তু তোমাদের পক্ষে সেই দায়িত্বও অসাধারণ। তুমি যে তোমার আচরণে ও অনুষ্ঠানে, বাক্যে ও ব্যবহারে তোমার প্রতিবেশীদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক কুশল বর্দ্ধনে বাধ্য, এই কথা তোমাকে স্মরণে রাখিতে হইবে।

প্রতিবেশীদের সম্পর্কে দায়িত্ব

"যেখানে তুমি ঘর বাঁধিয়াছ, তাহারই সমীপে আরও লোকে নিজ নিজ ঘর বাঁধিবেই। প্রতিবেশীদের যেমন গৃহ প্রয়োজন, তোমারও তেমন প্রতিবেশী প্রয়োজন। একাকী বিজন বনে বাস সংসারী লোকের পক্ষে সম্ভবও নহে, নিরাপদও নহে। কিন্তু প্রতিবেশী পাইলেই কি তুমি সত্য সত্য নিরাপদ হইলে? একদল প্রতিবেশী পাইবার ফলে তোমার গৃহে সিঁদেল চোরের যাতায়াত-সম্ভাবনা হয়ত কমিয়া যাইবে, কিন্তু তোমার একজন প্রতিবেশীরই কলুষিত নৈতিক জীবনের অপচ্ছায়া আসিয়া তোমার গৃহে পড়িয়া তোমার কোনও কুমার পুত্র বা কুমারী কন্যার যে সর্ব্বনাশ করিতে পারে না, তাহা তুমি কি করিয়া জান? একজন মদ্যপ প্রতিবেশীর দৃশ্য অনুকরণ করিয়া, একজন লম্পট প্রতিবেশীর কুৎসা মনে মনে আলোচনা করিয়া তাহারই ফলে যে তোমার গৃহের ফুলসদৃশ পবিত্র পুত্রকন্যাগুলির মতিগতি পাপ-পথে ধাবনেচ্ছু

হইবে না, তাহা তুমি কি করিয়া বল? সুতরাং তোমাদের আচারে অনুষ্ঠানে প্রতিবেশীদের ভিতরে সৎ প্রেরণার প্রসার সাধনের সুপ্রবল ক্ষমতা থাকা একান্ত প্রয়োজন হইবে। ইহা নিজেদের প্রয়োজনেই প্রতিবেশীদের উপরে তোমার দায়িত্ব।

প্রতিবেশীদের উপরে প্রভাব-বিস্তার

"প্রতিবেশীরা বেশভূষাপ্রিয়, আরাম-প্রয়াসী ও বিলাসী হইলে তাহার ছোঁয়াচ বড় সংসারে আসিয়া সহজে লাগে। এই বিষয়ে প্রমাণ খুঁজিতে তোমাকে অধিক দূর যাইতে হইবে না। আংশিক অবস্থাপন্ন একজন মাত্র প্রতিবেশীর পুত্রকন্যাদের অনুকরণে অবস্থাহীন অপরাপর প্রতিবেশীদের পুত্রকন্যারা কি ভাবে রাতারাতি জামা, কাপড়, জুতা ও ব্লাউজের ধরণ পরিবর্ত্তন করে, তাহার দৃষ্টান্ত অলিতে গলিতে পাইবে। এই মারাত্মক সংক্রামকতা হইতে নিজ সংসারকে বাঁচাইবার জন্য তোমার সংসারটীকে অতি দ্রুত এবং বিক্রান্ত-প্রয়াসে এমন একটী সাধনা-স্নিগ্ধ তপোবনে পরিণত করিতে হইবে, যাহার পবিত্র আবহাওয়া সংসারস্থ প্রত্যেকটী ব্যক্তির উপরে স্থায়ী ভাবে বজায় থাকে এবং যাহার প্রভাব, প্রতিবেশীদের পরিবারে পরিবারে নিরন্তর ছড়াইয়া পড়িতে থাকে।"

প্রেম ও আত্ম-সমর্পণ

অপর একজন পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"হাল ছাড়িয়া দিও না, হতাশায় ঢলিয়া পড়িও না। অবিশ্বাসীদের সঙ্গ হইতে কোনও সম্বল কুড়াইবার আশা রাখিও না। প্রেম তোমাকে রক্ষা করিবে। যাঁহাকে প্রাণের সর্ব্বস্ব দিয়া ভালবাসিতে পার, এই সঙ্কট-মুহূর্ত্তে নিজেকে তাঁহার পায়ে বিনামূল্যে বিকাইয়া দাও। প্রতিদান-বুদ্ধি রাখিও না, দাম যাচাই করিও না, বিনা সর্ত্তে, বিনা যুক্তিতে নিঃশেষে আত্মসমর্পণ কর। আত্মসমর্পণই আশ্বাসের মূল, যুক্তি তর্ক বা মতবাদ নহে।

"জগতে প্রেমিকরাই ধন্য, আত্ম-সমর্পণকারীদের জীবনই সার্থক। হতাশা তাঁহাদের স্পর্শমাত্রও করিতে পারে না।"

দরিদ্রদের কথা ভাব

অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"দরিদ্রের কথা তোমরা চিন্তা কর। অন্নহীন, বস্ত্রহীন, গৃহহীন, আশ্রয়হীন চিরদুঃখী নরনারীদের বিষয় তোমরা ভাব। পিতৃহীন, মাতৃহীন, স্বাস্থ্যহীন, শিক্ষাহীন, সৎসংসর্গবর্জ্জিত ও সমাজ-বহির্ভূত বালক-বালিকাগুলির কথা তোমরা ভাব।

শুধু ভাবিলেই চলিবে না, ইহাদের দুঃখ, ইহাদের দৈন্য, ইহাদের ক্লেশ, ইহাদের অভাব কি করিলে স্থায়ী ভাবে দূরীভূত হইতে পারে, তাহার উপায় তোমরা বাহির কর। নিজেদের দোষেই ইহারা ছন্নছাড়া সর্ব্বস্বান্ত, না অপর কাহারও দোষ আছে, ইহার বিচার পরে করিও এবং সেই বিচার না করিলে এই দারিদ্র্যের মৌলিক প্রতীকার সম্ভবও নহে। কিন্তু কেন ঘরে আগুন লাগিল, আগুনের প্রকৃতি কি, দাহ্য পদার্থের ধর্ম্মই বা কি, এই সকল বিষয় বিচার করিয়া তৎপরে বাল্‌তি আনিয়া জল ঢালিতে গেলে হয়ত শেষ পর্য্যন্ত করিবার আর কিছুই থাকে না, যথাসর্ব্বস্ব ইতিমধ্যে ভস্মীভূত হইয়া যায়। সুতরাং ইহাদের এই হীনাবস্থার আশু প্রতীকারের উপায় সঙ্গে সঙ্গে অবলম্বন করিয়া তৎপরে স্থায়ী প্রতীকারের উপায় নির্দ্ধারণে ব্রতী হইও। যেদিন ইহাদের দৈন্যাবস্থা ও অসহায়তার কারণ অনুসন্ধান হইবে, সেই দিন হয়ত ধরা পড়িয়া যাইতে পারে যে, ইহাদের দুঃখের মূল কেবলই ইহাদের কর্ম্মফল নহে, তোমার বা তোমার পূর্ব্বপুরুষদের ইচ্ছাকৃত বা অজ্ঞানকৃত অনেক কৃতিত্ব ইহার গোড়ায় রহিয়াছে। সেই দিন পূর্ব্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধানে তোমাকে মনোযোগী হইতে হইবে। কিন্তু সে সকল হইতেছে বিচারের কথা, দোষ এবং গুণ ওজন করিবার কথা, চুলচেরা হিসাবের কথা, ন্যায়ান্যায়ের সূক্ষ্ম বিবেচনের

কথা। এখনকার কথা তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। এখনকার কথা হইতেছে মস্তিষ্ক লইয়া নহে, হৃদয় লইয়া, অতীত ইতিহাস লইয়া নহে, বর্ত্তমান অবস্থা লইয়া, তোমার দায়িত্ব বা কর্ত্তব্য লইয়া নহে, তোমার সহানুভূতি-প্রবণ কোমল হৃদয়ের স্বাভাবিক ত্যাগবুদ্ধির বিকাশ লইয়া। কে কি পাইবার যোগ্য আর কে কি পাইবার অনধিকারী, সেই হিসাব-নিকাশে উপেক্ষা করিয়া তোমার স্নেহশীল হৃদয়ের স্বভাবের গুণে কাহার জন্য তুমি কি দিতে পার, নিজ সুখভোগে অনাদর করিয়া কি কি প্রিয়বস্তু ছাড়িতে পার, ত্যাগযজ্ঞে নিজেকে কতটা পর্য্যন্ত আহুতি করিতে পার, তাহাই এক্ষণে প্রধান আলোচ্য। দরিদ্রের কাতর ক্রন্দন তোমার কর্ণে কি প্রবেশ করিবে না? অনাথের করুণ বিলাপ তোমার হৃদয়কে কি মথিত করিবে না? বিপন্নের নয়নের জল তোমার হৃদয়বত্তাকে কি আকর্ষণ করিবে না? উৎপীড়িতের বুক-চেরা দীর্ঘনিঃশ্বাস তোমাকে কি অভিভূত করিবে না?"

অতি-দরিদ্রের ধর্ম্ম ও ঈশ্বর

ঐ পত্রেই শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"দরিদ্রেরা দর্শন-শাস্ত্র বোঝে না। মত-পথের বিচার তাহাদের নিকটে তুচ্ছ। সত্য বা মিথ্যা কোনও প্রকারের আদর্শবাদেরই মূল্য তাহাদের নিকটে একটী কাণা-কড়ি-প্রমাণও

নহে। তাহারা বুঝে উদর, তাহারা বুঝে এক গ্রাস খাদ্য। তাহারা বোঝে ক্ষুধার জ্বালা, তাহারা বুঝে কটিতটের এক-বিতস্তি-পরিমাণ জীর্ণ বস্ত্র। তাহারা বুঝে ঘুমাইবার কালে এক কণা ছায়ার আশ্রয়, তাহারা বুঝে হস্তধৃত জীর্ণ ভগ্ন মৃৎপাত্র-খানার কিয়দংশ ভরিয়া কয়েক দানা অন্ন। খরস্রোতা নদীর তীরে যাইয়া কম্পিত হস্তে অঞ্জলি পূরিয়া জল লইয়া তাহারা কণ্ঠের পিপাসা মিটাইতে রাজি, শুধু দুমুঠা অন্ন দাও। শীতে কাঁপিতে বৃষ্টিতে ভিজিতে, রৌদ্রে পুড়িতে তাহারা রাজি, শুধু দুমুঠা অন্ন দাও। অন্ন দিয়া তারপরে তাহাদিগকে ধর্ম্মের কথা বলিও। ধর্ম্মের কথা শুনিতে তাহাদের আপত্তি নাই, কেহ কেহ আগ্রহ-ভরেই শুনিবে, কেহ কেহ যেমন যেমন শুনিবে তেমন তেমন জীবন-যাপনেরও চেষ্টা করিবে, সকলেই ধর্ম্মদ্রোহী ঈশ্বরদ্বেষী হইবে না, হইতে পারে না কিন্তু আগে তাহাদের পেটে অন্ন দাও। শূন্য উদরে ধর্ম্ম-সাধনা হয় না। শূন্য উদরে ঈশ্বর চিন্তা অসম্ভব। যার গৃহে অন্ন আছে, সে অল্প খাইয়া সংযম অভ্যাস করুক। তাহাতে তাহার ঈশ্বরানুধ্যানের যোগ্যতা বাড়িবে, তপঃসাধনের সামর্থ্য উপচিত হইবে, দেহ-মন অধ্যাত্মমুখী হইবে। কিন্তু গৃহে যার অন্ন নাই, তাহাকে আগে অন্ন দাও, তাহাকে আগে বস্ত্র দাও, তারপরে তাহাকে ধর্ম্মের কথা, ঈশ্বরের কথা শুনাইতে আসিও।"

সদাচারের অভ্যাস

অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সদাচারের অভ্যাসকে এমন ভাবে আয়ত্ত কর, যেন উহা তোমার স্বভাবের অঙ্গীভূত হইয়া যায়। হস্ত, পদ, চক্ষু, মুখ, বক্ষ, পৃষ্ঠ, উদর, উপস্থ প্রত্যেকটী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে এমন সুসভ্য সদ্‌ব্যবহারের অধীন কর, যেন নিদ্রাবস্থাতেও তাহারা অসুন্দর ভাবে অবস্থান না করিতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে মনোভঙ্গীকে এমন সুরুচিপূর্ণ কর, যেন মনের গতির সঙ্গে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি নিজেদের গতিকে মিলাইয়া চলিতে অভ্যস্ত হয়, বাধ্য হয়।

"গ্রীকবীর একিলিসের পুত্র ফির্‌রাস্ স্বহস্তে একটী সুন্দরী কুমারীকে হত্যা করিয়া তাহার রক্তে মৃত একিলিসের আত্মার তৃপ্তি সাধন করিবেন। গ্রীক-নাট্যকার ইউরিপাইডিস্ তার এক বিষাদমাখান চিত্র তাঁহার এক নাটকে অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। ফির্‌রাস পিতার আত্মাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—'হে পিতা, কুমারী-বক্ষের এই পবিত্র শোণিত পান করিয়া তৃপ্ত হও এবং আমাদের জাহাজগুলির পালে পালে বাতাসের যোগান দাও, যেন সমস্ত গ্রীক সৈন্যমণ্ডলী নিয়া ট্রয় নগরের উপকূল হইতে আমরা শীঘ্র দেশে ফিরিতে

পারি।' ফির্‌রাস তাহার কোষ হইতে স্বর্ণখচিত তরবারি উন্মুক্ত করিলেন এবং তাহার ইঙ্গিতে সমবেত গ্রীক যুবকেরা কুমারী পেলিক্‌জেনাকে ধরিবার জন্য সম্মুখে আগাইয়া আসিল। কুমারী পেলিক্‌জেনা ইহা দেখিয়া সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—

'স্বেচ্ছায় আমি দিব এই প্রাণ,
মানব হস্ত ছুঁয়ো না মোরে,
এই আমি দেই পাতিয়া গ্রীবা,
ভয় নাই মোর তরবারিরে।'

সকলে আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল। রাজা আগামেম্‌নন চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—'ইহাকে কেহ স্পর্শ করিও না।' যুবকের দল পিছনে হটিল। আর পেলিক্‌জেনা কি করিলেন? অপাপবিদ্ধা কুমারী নিজের দেহাবরণ বস্ত্রখানা ধরিয়া কণ্ঠ হইতে বক্ষ পর্য্যন্ত উহা ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। দক্ষতম ভাস্করের চারুতম শিল্পকে লজ্জা দিয়া তাঁহার তুষার-শুভ্র বক্ষঃস্থল অনাবৃত হইল। তখন মাটীতে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া কুমারী পেলিক্‌জেনা বলিলেন,—

'যদি চাহ, হে যুবক, এই বক্ষে হান,
যদি চাহ, এই গ্রীবা কর দ্বিখণ্ডিত,
চেয়ে দেখ, কৃপাণের সহিতে আঘাত
গ্রীবা, বক্ষ দুই মোর প্রস্তুত সতত।'

অমন যে রুক্ষ-চরিত্র ফির্‌রাস, তারও যেন প্রাণে একটা করুণার আমেজ ভাসিয়া উঠিল, সে অনিচ্ছা সহকারেই যেন সেই সুকোমল বক্ষের গভীরতম প্রদেশে দীপ্ত শায়ক প্রবেশ করাইয়া দিল, প্রস্রবণের মত শোণিতের ধারা নির্গত হইতে লাগিল, কিন্তু এমন কি এই মরণ-সময়েও চিরকালের ব্রীড়াশীলা সদাচার-পরায়ণা এই কুমারী দেহাবরণ-বস্ত্রকে টানিয়া টানিয়া তার সুচারু তনুকে ঢাকিয়া লইতে লাগিল যেন অশুদ্ধ-চেতার পঙ্কিল দৃষ্টি এই শুদ্ধশীলার দেহের কোনও অঙ্গে না পড়ে।

"এত বড় বিয়োগান্ত করুণ কাহিনীর মাঝখানেও কি সুন্দর উপদেশ! সংযম ও সদাচার যাহার অভ্যাসগত হইয়াছে, সে মরণকালেও সেই সদাচারের অভ্যাসকে পরিহার করিতে পারে না। কোষমুক্ত তরবারি বক্ষে বিদ্ধ হইয়া যখন মৃত্যুই হইয়া গেল, তখন দেহটা নগ্ন রহিল, কি আবৃত রহিল, একথা ভাবিবার প্রয়োজনই কি, সার্থকতাই বা কি? মৃত দেহের কি গতি হইল, কি না হইল, মৃত ব্যক্তির ত' তাহা আয়ত্তে নহে। তবু, যে সদাচার, চরিত্রের যে শোভনতা, আচরণের যে সৌষ্ঠব জীবন ভরিয়া অভ্যাস করিয়া সে আসিয়াছে, মরণকালে বক্ষের আহত স্থানের শোণিতোৎসারণ বন্ধ করিবার জন্য হস্ত দ্বয় প্রযুক্ত না হইয়া স্বভাবতই চিরাভ্যস্ত সদাচারের পরিরক্ষণে হস্তদ্বয় নিয়োজিত হইল।

জীবৎকালের কর্ম্ম ও মরণকাল

"একজন পাগলকে বলিতে শুনিতাম,—'জীবন ভরিয়া কত কিছুই ত' করিয়া আসিয়াছি। এক্ষণে মরণকালে ভাল ভাবে মরিতে পারি, তবেই রক্ষা।' কথাটা বড় সত্য, বড় খাঁটি। জীবন ভরিয়া যে সদনুশীলনে কাটাইয়াছে, মরণ কালে তাহার দ্বারা অসৎ আচরণের অনুষ্ঠান হইতে পারে না। আবার জীবন ভরিয়া যে কেবল অসদনুশীলনই করিল, মরণ-কালে ভাল ভাবে দেহত্যাগের আশাই সে কি করিয়া করিবে? জীবন-ব্যাপী কর্ম্ম-অপকর্ম্মের মাঝে তোমার মরণ-কালের অবস্থাটা একবার ভাব এবং তদনুসারে সংযত হও। হাসিয়া খেলিয়া জীবন কাটাইলেই হইল না, হাসিয়া খেলিয়া মরিতে পারা চাই।"

জীবনের পরম কর্ত্তব্য

বেলা দশ ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবামণি চৌহাট্টা স্বর্গীয় হরেন্দ্র কুমার সিংহের গৃহে গমন করিলেন। আহারাদি সেইখানেই হইল। বেলা তিনটা পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীবাবামণি সেখানে অবস্থান করিলেন।

এস্থানে একটি মেয়েকে শ্রীশ্রীবাবামণি দীক্ষা দান করিলেন এবং উপদেশ করিলেন,—অকপটে নিজেকে ভগবানের চরণে উৎসর্গ করাই হচ্ছে পূর্ণ পবিত্রতা রক্ষার উপায়। কখনো

ভুলে যেও না যে, ভগবানকে সর্ব্বতোভাবে একমাত্র আশ্রয় ব'লে জানতে হবে, তবেই ভগবানকে পাবে। বাহিরের আড়ম্বরে নয়, অন্তরের একনিষ্ঠ প্রেমে তিনি মুগ্ধ হন। নিজের সমগ্র শক্তি ও প্রতিভাকে একমাত্র তাঁরই প্রীতি-সম্পাদনের জন্যই প্রয়োগ কর। জগতে আর কারো তুষ্টি-তুষ্টির প্রতীক্ষা নিষ্প্রয়োজন। ভগবৎ-সেবাই হচ্ছে জীবনের পরম কর্ত্তব্য।

দেওয়া এবং পাওয়া

অপরাহ্ন তিন ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবামণি নিজ স্থানে ফিরিয়া আসিলেন এবং চারি ঘটিকায় ঠাঁকুর কাচার বাড়ী আগমন করিলেন। ঠাঁকুর কাচার বাড়ীতে একটী মন্দির আছে এবং তাহাতে বৈষ্ণবদের দ্বারা পূজিত বিগ্রহ আছেন। শ্রীশ্রীবাবামণির আগমনে গৃহস্বামী শ্রীযুক্ত ব্রজধন ভট্টাচার্য্য মহাশয় কি ভাবে যে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, বলিবার নহে।

উপদেশ-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জীবনে মাত্র দুইটী কথাই সত্য। একটী হচ্ছে দেওয়া, অপরটী হচ্ছে পাওয়া। দেওয়ার সার্থকতা হচ্ছে ভগবৎ-পাদ পদ্মে নিজেকে উৎসর্গ করায়, অন্য কোনও দানের কোনো অর্থ নেই। পাওয়ার সার্থকতা হচ্ছে, ভগবানকে পাওয়ায়, অন্য কোনও পাওয়ারও কোনো অর্থ নেই।

শ্রীহট্ট
৯ই মাঘ, বুধবার,১৩৪১
(২৩শে জানুয়ারী,১৯৩৫)

শেষ রাত্রে উঠিয়াই শ্রীশ্রীবাবামণি পত্র লিখিতে বসিলেন।

সঙ্কল্পকে স্থির কর

জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"দুইটী বিপরীত বিঘ্নের মাঝখানে পড়িয়া কিঙ্কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইও না। আগে চলার ফল হয়ত অনিশ্চিত, পিছে চলার ফল হয়ত বিপজ্জনক, কিন্তু কোনও দিকে না চলিয়া চুপ্ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবার ফল হইবে সদ্যঃ আত্মনাশকর। সুতরাং মন হইতে সকল দ্বিধা ঝাড়িয়া দিয়া পথ চলা সুরু কর, এখন দক্ষিণেই চল আর বামেই চল, আগেই যাও আর পিছেই হঠ। ভগবানের পবিত্র নামে মনকে নিমজ্জিত করিয়া দিয়া স্থিরা প্রজ্ঞার ভিতর দিয়া দৈবী বাণী জানিয়া লও যে, কোন্ দিকে চলিবে এবং একবার সঙ্কল্প স্থির করিবার পরে আর তাহাকে পরিবর্ত্তিত হইতে দিবে । জগতের অনেক নিশ্চিত পরাজয় একমাত্র সুদৃঢ় সঙ্কল্পের সম্মুখে পড়িয়া নিশ্চিত জয়ে রূপান্তর পাইয়াছে। দ্রুত সঙ্কল্পকে স্থির কর।

একনিষ্ঠ-ভক্তি ও ভক্তির গণিকাবৃত্তি

অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তোমার ভক্তি নিষ্ঠার প্রভায় উজ্জ্বল হউক, বিদ্যুৎ-চমকের ক্ষণ-চঞ্চলা দীপ্তি তাহার প্রয়োজন নহে। তোমার ভক্তি পতিব্রতা সতীর নিকট তাহার শিক্ষা গ্রহণ করুক, গণিকার বহু-প্রীণনের প্রবৃত্তি যেন তাহাতে আত্ম-প্রকাশ না করে। পরা ভক্তি একজনকে নিয়াই আত্ম-প্রকাশ করে, জনে জনে পরা ভক্তি অর্পণ করা যায় না। ভক্ত ত' বাছা কতই দেখিতেছি, ইহাদের ভক্তির গভীরতাও নগণ্য নহে। কিন্তু যখন দেখি যে, ভক্তির আধার ইহাদের শত শত ও সহস্র সহস্র, তখন বড়ই কাতর হইয়া পড়ি। একজনাতে আত্ম-সমর্পণ করিলে যখন বিশ্বের সকল সত্যকে লাভ করা যায়, তখন জনে জনে প্রীণন করিবার কোন্ প্রয়োজন রহিয়াছে, তাহা আমি বুঝি না! নিষ্ঠাবতী সতী রমণী জগতের সকল ব্যক্তি বা বস্তুকে একমাত্র পতির সহিত সংশ্রবের মধ্য দিয়া বুঝে, জানে বা মানে। নিষ্ঠাবান্ ভক্তও তেমন তাঁর একটী মাত্র আরাধ্যের সহিত সংশ্রবের মধ্য দিয়া জগতের সকল ব্যক্তি বা বস্তুকে বুঝিতে, জানিতে, মানিতে চেষ্টা করিবেন। পতিগৃহে অতিথি আসিলে সতী কি তাহাকে দেহদান করে?

না, তাহাকে এমন সেবা প্রদান করিয়া থাকে, যাহার একমাত্র প্রাপক জগতে তাহার স্বামী ব্যতীত অপর কেহ নহে? বিল্বমঙ্গলের গল্পে তোমরা শ্রেষ্ঠী-পত্নীর যে আতিথেয়তার কথা শুনিয়াছ, তাহা গল্প-রচনাকারীর রসনার অসংযম মাত্র। পুরাণাদিতে এইরূপ আরও দুই একটা গল্প আছে। তাহাও গল্প কথকের রসনার অনুচিত কণ্ডুয়নের ফলমাত্র। উহা আতিথ্যেরও আদর্শ নহে, ধর্ম্মেরও জনক নহে। পত্নী পতিতেই সম্যক্ আত্ম-সমর্পণ করিতে পারেন, জগতের অপর সকলের প্রতি তাঁহার কর্ত্তব্য কোমলতা-সমন্বিত, মাধুর্য্য-মণ্ডিত এবং স্নেহ সম্বর্দ্ধিত হইলেও তাহাতে নিশ্চিতই সুষ্ঠুতার সীমারেখা থাকিবে, গণ্ডী থাকিবে, নিয়মের বাঁধন থাকিবে। পতি সম্পর্কে তাহা নহে। যাহাতে পতির প্রীতি, পত্নীর তাহাই প্রদেয়। পতি-সম্পর্কে তাহার আত্ম-দানের প্রয়াসের ভিতরে কোনও সীমা নাই, কোনও বেলাভুমি নাই, ইহা অনন্ত আকাশের ন্যায় পার-কূল-হীন। আরাধ্যে তোমাদের এইরূপ নিষ্ঠা আবশ্যক। নিত্য নূতন প্রভুর পূজা সেবার আদর্শ নহে, সেবার উহা ব্যভিচার। ভক্তশ্রেষ্ঠ হনুমানের চরিত্রে তাহা প্রত্যক্ষ কর। তিনি শ্রীনাথে এবং জানকীনাথে অভেদত্ব স্বীকার করিয়াও একমাত্র রাজীবলোচন রামকেই নিজের সর্ব্বস্ব বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তোমরাও নিজেদের প্রকৃত জীবন-সর্ব্বস্ব কে, তাহা চিনিয়া লও। স্থানে স্থানে যাইয়া জীবন-সর্ব্বস্ব সম্বোধনে নতি করা আর গণিকাবৃত্তি করা এক কথা। ইহা

হইতে তোমরা বিরত হও। অনুশীলন কর একনিষ্ঠ ভক্তির, জীবন হউক তোমাদের একনিষ্ঠ ভক্তের। ভক্তির অভিনয়কারী লোকমানলিপ্সু, প্রকৃত-স্বভাব জনগণের পক্ষে একনিষ্ঠা গোঁড়ামি বলিয়া নিন্দনীয় হইতে পারে, কিন্তু তোমাদের পক্ষে নহে। ভক্তির একনিষ্ঠা ব্যতীত কাহারও দিব্য জীবনের বিকাশ হইতে পারে না। এই কথা স্মরণে রাখিয়া প্রাণপণে একনিষ্ঠ হও, সত্য জীবনের ভিত্তিপত্তন কর, ঋষি-স্বভাবের গোড়া বাঁধ।

ইষ্টনিষ্ঠা ও অসাম্প্রদায়িক প্রেম

"অবশ্য, তোমার ইষ্ট-নিষ্ঠার একমুখতা যাহাতে অপর-পন্থা-অবলম্বনকারী ভক্ত সাধকের সাধন-বিঘ্ন বা উদ্বেগ সৃষ্টি না করে, ইহা তোমাকে দেখিতে হইবে। একই ভগবান্‌কে আশ্রয় করিয়া ভিন্ন ভিন্ন সাধক ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন সাধন-পথ ও ভজন-মত আয়ত্ত করিয়াছিলেন, এই সত্যটুকু তোমাকে স্বীকার করিয়া নিতে হইবে। যে ব্যক্তি যে ভাবেই ভগবানের ভজনা করুক, চরম ইষ্ট-নিষ্ঠার মূলে তাহার যে পরম সত্যের আস্বাদন লাভ অবশ্যম্ভাবী, ইহাও তোমাকে মনে প্রাণে মানিতে হইবে। এই দুইটী কথা মানিয়া লইবার ফলে অপর সম্প্রদায়ভুক্ত মাত্রেরই প্রতি তোমার চিত্তের যে উদারতা ও ভ্রাতৃত্ব-বোধ অবশ্যম্ভাবী, তাহা অন্তরে জাগরূক রাখিয়াই নিজের ইষ্টে সম্পূর্ণ-রূপে নিমজ্জিত হইবে। ইষ্ট-

নিষ্ঠার সহিত অসাম্প্রদায়িক প্রেমের বিরোধ নাই। যেখানে দেখিবে বিরোধ আছে, বুঝিতে হইবে, হয় প্রকৃত ইষ্টনিষ্ঠা জন্মে নাই, তবু ইষ্টনিষ্ঠার একটা ভাণ করা হইতেছে, নতুবা তোমার ইষ্টই যে নানা রূপ, নানা ভাব, নানা ভজন-পথের ভিতর দিয়া নিখিল বিশ্বের নিখিল জীবকুলের উদ্ধারের জন্য নানা যুগে অনাদি অনন্ত কাল ধরিয়া নিজের বিচিত্র মহিমা প্রকাশ করিতেছেন, এই সরল বিশ্বাসটী তোমার জন্মে নাই। অর্থাৎ ইষ্টের শক্তি সম্বন্ধে তোমার ধারণার অপূর্ণতারই ফল পরধর্ম্মদ্বেষ, ইহা তোমার অজ্ঞানতারই সন্তান।

সমগ্র জগতে একটী মাত্র ধর্ম্মের সম্ভাব্যতা

"শুদ্ধি, তব্‌লীগ ও ব্যাপ্‌টিজ্‌ম যে যত ইচ্ছা চালাইয়া যাউক, জগতের সকল লোককে কখনই এক ধর্ম্মাবলম্বী করা যাইবে না। এইরূপ করা যাইবে বলিয়া যাহারা বিশ্বাস করে, তাহাদের সরলতাকে প্রশংসা করিতে হয় কিন্তু বুদ্ধিকে প্রশংসা করা চলে না। নদীর জলের মত এক একবার এক একটা সম্প্রদায় জোয়ারে বাড়িতেছে, ভাটায় কমিতেছে। যেই সকল সম্প্রদায়কে দুই চারি বা হাজার বছর ধরিয়া কেবলই ক্রমবর্দ্ধমান বলিয়া তোমরা দেখিতেছ, ইতিহাসের ঝোল্‌না ঝাড়িলে দেখিতে পাইবে, সকলের দৃষ্টির অগোচরে তাহারা

সংখ্যায় কিছু কিছু কমিয়াছেও। কত খ্রীষ্টান মুসলমান হইয়া গেল, কত মুসলমান খ্রীষ্টান হইল। ঔরসের শক্তিতে নিজেদের সংখ্যা যতটা বাড়ান যায়, ইহুদী এবং পার্শী প্রমুখ সম্প্রদায়-সমূহ তাহা অপেক্ষা অধিক-সংখ্যায় নিজেদের বাড়াইতে পারে নাই, মোটামুটি এই কথাটা বলা চলিতে পারে। নতুবা অপর সকলেই নিজ সম্প্রদায়ের বাহির হইতে লোক আনিয়া নিজেদের আয়তন অল্পাধিক বাড়াইয়া লইয়াছে। এক সম্প্রদায়ের সংখ্যাগত ক্ষতির মধ্য দিয়া এভাবে অপর সম্প্রদায় নিজের সংখ্যাগত লাভ বাড়াইয়া নিয়াছে। যে-কোনও জাতির বা যে কোনও ধর্ম্মাবলম্বীর কন্যাকে আনিয়া নিজ পুত্রবধূ করিবার অরুচি যেই মূহূর্ত্তে হিন্দু-সম্প্রদায় হইতে দূরীভূত হইয়া যাইবে, সেই মুহূর্ত্তে দেখিও হিন্দুরাও এত দ্রুত নিজেদের সংখ্যা-বর্দ্ধন করিয়া চলিবে যে, দ্রুত-বর্দ্ধিষ্ণু অপরাপর সম্প্রদায় রাজনৈতিক আতঙ্কে কাঁপিতে সুরু করিবে। এভাবে সামাজিক ব্যবস্থার এক একটী সুযোগের মধ্য দিয়া এক এক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা সংখ্যার দিক্ দিয়া জগতে গরিষ্ঠ হইবার চেষ্টায় এক এক সময়ে সফল হইবে, ইহা সত্য। কিন্তু জগৎ হইতে সকল মত ও পথকে বিলুপ্ত করিয়া দিয়া একটা মাত্র মত বা পথ একচ্ছত্র হইয়া বিরাজ করিবে, ইহা এক অসম্ভব কল্পনা। হিন্দু বল, বৌদ্ধ বল, খ্রীষ্টান বল আর মুসলমান বল, কেহই এই চেষ্টায় সফলতা অর্জ্জন করিতে পারিবে না।

ইষ্টনিষ্ঠার প্রমাণ

"সুতরাং নিজ ইষ্টের প্রতি অব্যভিচারিণী নিষ্ঠার মানে কখনই ইহা হইবে না যে, অপর সম্প্রদায়কে বিলুপ্ত করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেই হইবে। নিজের ধর্ম্মমতের সহিত মিল নাই বলিয়া মন্দির, মসজিদ, গীর্জ্জা ভাঙ্গিতে যায় অসৎপ্রবৃত্তি গুণ্ডারা, ইষ্টনিষ্ঠ সাধকেরা নহে। ইষ্টনিষ্ঠার কতকগুলি প্রমাণ আছে। বিনা প্রমাণে কাহাকেও আমি ইষ্টনিষ্ঠ বলিয়া মানিব না। ইষ্টনিষ্ঠার আভ্যন্তর প্রমাণ হইতেছে এই যে, তোমার মন কোনও অবস্থাতেই তোমার ইষ্টের প্রীতি-সম্পাদনের ইচ্ছা ব্যতীত অপর কিছুতে লিপ্ত হইবে না। ইষ্টনিষ্ঠার বাহ্য প্রমাণ হইতেছে এই যে, যেই দিকে নয়ন ফিরাইবে, সেই দিকেই নিজের ইষ্টের মহিমাকে অবিরাম দর্শন করিবে। ফলে, প্রকৃত ইষ্টনিষ্ঠা আসিলে দ্বেষবুদ্ধি থাকে না। ইষ্ট-নিষ্ঠার দোহাই দিয়া ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের প্রতি অন্যায়াচরণ করিতে প্ররোচনা দিতে আমি কোনও কোনও সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগুরুদের দেখিয়াছি। কোনও কোনও ধর্ম্ম-ব্যাখ্যাতাকে একথা বলিতে শুনিয়াছি যে, নিজ সম্প্রদায়ের লোকের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ রক্ষা করতঃ ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের প্রতি righteous indignation (ধর্ম্মসঙ্গত ক্রোধ) প্রকাশ করিলে ধর্ম্মহানি হয় না। কিন্তু এই সকল কথা আধ্যাত্মিক জীবনের অনুন্নত অবস্থার পরিচায়ক

মাত্র। ইষ্টনিষ্ঠা আসিলে জগতের সকল প্রাণীকে তোমারই ইষ্টের আশ্রিত বলিয়া জ্ঞান হইবে এবং তাহার ফলে কেহ তোমার নিজ সম্প্রদায়ের অন্তর্ব্বর্ত্তী হউক বা না হউক, তাহার প্রতিও নির্ব্বিচারে অন্তরের স্নেহ ও কুশলেচ্ছা ধাবিত হইবে। যেখানে ইহা হয় না, সেখানে প্রকৃত ইষ্ট-নিষ্ঠা আসে নাই বলিয়া বুঝিতে হইবে। ইষ্টে নিষ্ঠা আসিলে জর্ডন-নদীর আর ভাগীরথীর জল দুইজন ঈশ্বরের সৃষ্টি বলিয়া জ্ঞান হইবে না।

সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়

"অবশ্য সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের নাম করিয়া একদল লোককে সর্ব্বদাই ধর্ম্মে ধর্ম্মে খিচুড়ী পাকাইবার চেষ্টায় রত থাকিতে দেখা যায়। ইহারা নিজেরা কোনও পন্থায়ই চলে না, কোনও মতানুসারেই সাধন করে না, কিন্তু ইসা, মুসা, মহম্মদ, বুদ্ধ, চৈতন্য ও নানককে আনিয়া এক বক্তৃতামঞ্চে দাঁড় করাইয়া দিয়া সুশ্রাব্য বচন-মাধুরী মাত্র বর্ষণ করিতে থাকে। শ্রোতাদের উপরে ইহার কিছু সুফল অবশ্যই আসে, তাহাতে সন্দেহ করি না। কিন্তু নিজেরা যে কোনও পথে চলিল না, ইহার দরুণ ইহাদের ধর্ম্ম শুধু মুখের বুলি মাত্র থাকে, আস্বাদন কখনই লাভ হয় না। সকল পথের পথিকেরাই যে একই গন্তব্য স্থানে গিয়া পৌছিবেন, এই কথা প্রচারের জন্য এই জাতীয় মঙ্গলানুষ্ঠানের খুবই প্রয়োজন আছে। কিন্তু সাধন

করিয়া যাহার আস্বাদন করিতে হয়, তাহাকে শুধু কথাতেই আটক রাখিলে চলিবে না। সর্ব্বধর্ম্মের প্রকৃত সমন্বয় কথায় হইবে না, হইবে অনুভূতিতে, আস্বাদনে,—যাহা একমাত্র সাধনের বলেই লব্ধ হয়।

সাধনে নিমগ্ন হও

"সুতরাং তোমরা সাধন-বিষয়ে নিরন্তর উৎসাহী হও। জীবন যায় যাউক, সাধন-রস আস্বাদনের সুযোগ হেলায় হারান চলিবে না। আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বা কুটুম্ব বিরোধী হয় হউক, সাধনের অমৃত-সলিলে অবগাহন করিতে আর দেরী করা চলিবে না। কেননা, কেহ ত' জানে না যে, কবে জীবনের রবি পশ্চিমে হেলিবে। সাধনে যদি নামিবে, তবে এখনি তাহা কর। গড়িমসি করিয়া আর সময় কাটাইও না।"

প্রবল পবিত্র চিন্তার শক্তি

বেলা সাড়ে দশ ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবামণি স্থানীয় কোনও অধ্যাপকের গৃহে আহারের আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন।

অধ্যাপকের কন্যা নিদারুণ রোগে জর্জ্জরিতা। শ্রীশ্রীবাবামণি মেয়েটীকে কয়েকটী যৌগিক আসন ও মুদ্রা শিক্ষা দান করিয়া তৎপরে বলিলেন,—দেহটার ভিতরে উন্নত এবং পবিত্র চিন্তার প্রবল স্রোতকে অভ্যাস-বলে প্রবাহিত

কর। এক একটা প্রবল চিন্তা শারীর ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন এনে দেবে। তাতে দেখ্‌বে, অতি সহজে দেহ তার সহস্র রোগক্লিষ্টতা থেকে অনায়াসে মুক্তি পেয়ে যাবে। প্রবল চিন্তাকে জান্‌বে যেন একটা বজ্র। বজ্র যেমন পর্ব্বত-শিখর বিদীর্ণ ক'রে দেয়, পবিত্র চিন্তা তেমন দেহের এক একটা কেন্দ্রে অবস্থিত এক একটা রোগের দুর্গকে ধ্বংস ক'রে দেয়। রুগ্ন স্থানে মনকে নিবিষ্ট কর, আর জগতের পবিত্রতম চিন্তাকে সে স্থানে সমাবিষ্ট কর। পবিত্র চিন্তার শক্তিতে রোগও দূর হবে, রোগের কারণও দূর হবে।

অভ্যাসের শক্তি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মনকে সন্নিবিষ্ট কত্তে পাচ্ছ না?

অভ্যাসের বলে তা' পার্‌বে। জগতে অসাধ্য কিছু নেই। কোনো কাজকেই অসাধ্য ব'লে জ্ঞান ক'রো না। আজ যা' অসাধ্য, অভ্যাসের বলে কাল তা' দুঃসাধ্য হবে, পরশু তা' সাধ্য হবে, তরশু তা' হবে একেবারে সুসাধ্য। চাই অভ্যাস। অভ্যাসের শক্তিতে বিশ্বাস কর।

বাসনা-জয়ের প্রকৃষ্ট পন্থা

সময়ান্তরে অধ্যাপক মহাশয় বলিলেন,—এত কাল ধ'রে

সংসারীই ক'রে আস্‌ছি, কিন্তু সংসার-বাসনার লোপ হচ্ছে না।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভোগের দ্বারা ভোগবুদ্ধিকে দাবান যায় না। ত্যাগের দ্বারাই তাকে দাবাতে হয়। তবে, কোনো কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে আংশিক ভোগের পরে ত্যাগ সহজে হয়, কেননা, তাতে কৌতূহলের পরিমাণ ক'মে যায়। কিন্তু কার পক্ষে যে কোন্ পন্থা গ্রহণীয় হবে, তা নিজে নিজে ঠিক্ করা কঠিন। একজন হয়ত বিন্দুমাত্র ভোগাস্বাদন না পেয়েও ত্যাগের পথে যেতে পাত্তেন, তাকে কৌতূহল-বিনাশের জন্য ভোগ-পথে প্ররোচিত করার ফলে হয়ত ভোগবাসনা তার বেড়েই গেল। এই জন্যই, সর্ব্বপন্থাকে অপন্থা জ্ঞান ক'রে সর্ব্বপ্রযত্নে ভগবানে আত্মসমর্পণের ব্রত নিতে হয়। যে তাঁর চরণে আত্মসমর্পণ করে, অভ্যাসের দাসত্ব থেকে এবং কৌতূহলের তাড়না থেকে তিনি তাকে অনায়াসে মুক্তি দিয়ে দেন। ভগবানে আত্মসমর্পণই হচ্ছে বাসনা জয়ের প্রকৃষ্ট পন্থা।

সংস্কৃত কলেজের বক্তৃতা

অপরাহ্ণ সাড়ে চারি ঘটিকায় শ্রীহট্ট সংস্কৃত কলেজে একটী সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। রায় বাহাদুর নলিনী কান্ত রায় দস্তিদার মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি পূর্ণ দুই ঘন্টা কাল বক্তৃতা করিলেন।

ত্যাগ ও ব্রাহ্মণত্ব

বক্তৃতা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব সর্ব্ব-ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত। যতদিন জগতে ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা থাক্‌বে, ততদিন ত্যাগেরও মর্য্যাদা থাক্‌বে। যতদিন ত্যাগের মর্য্যাদা থাক্‌বে, ততদিন ব্রাহ্মণের অর্থাৎ প্রকৃত ব্রাহ্মণের মর্য্যাদাও সুনিশ্চিত থাক্‌বে।

ব্রাহ্মণ-জীবনে মণি-কাঞ্চন যোগ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ত্যাগ এবং উদারতা এই দুয়ের যেখানে মিলন, বল্‌তে হবে সেখানে মণিকাঞ্চন-সংযোগ হয়েছে। ত্যাগী ব্রাহ্মণ বড়ই উজ্জ্বল, কিন্তু বিশাল নন। উদার ব্রাহ্মণ বড়ই বিশাল, কিন্তু উজ্জ্বল নন। প্রত্যেকটী ব্রাহ্মণের জীবনে যুগপৎ উজ্জ্বলতা এবং বিশালতার সমাবেশ করা চাই। অনেকের ত্যাগ আশ্চর্য্য, কিন্তু চিত্ত বড়ই সঙ্কীর্ণ। অনেকের চিত্ত বড়ই উদার, কাউকে ছোট জ্ঞান ক'রে ঘৃণা করেন না, কিন্তু ভিতরে ভোগবুদ্ধিতে বাসা বেঁধেছে। প্রকৃত ব্রাহ্মণের আদর্শ এরূপ হবে না।

ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের প্রভাব ও চরিত্র

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—শাস্ত্রাজীব ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণকে

বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারীরা তুচ্ছ জ্ঞান করেন। এর কতক কারণ দর্প, কতক কারণ অজ্ঞতা। কিন্তু এই অবজ্ঞাত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের যে কত বড় প্রভাব সমাজের উপরে রয়েছে, তা এঁরা কল্পনাও কত্তে পারেন না। বিলাতী বিদ্যার মদিরা আমাদের যত পান করিয়ে থাক না কেন, হে ইংরাজ, লিভারপুলের নূন উদরস্থ ক'রেও দেশদ্রোহী আমরা আমাদের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-বর্গের পবিত্র প্রভাবকে অতিক্রম ক'রে যেতে পারি নি, কখনো পার্‌বও না। বিলাতী বিদ্যার পণ্ডিতেরা নিজেদের চরিত্রের মেরুদণ্ডের সাথে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-শ্রেণীর চরিত্রের মেরুদণ্ডের তুলনা না ক'রে কি ক'রে বুঝ্‌বে যে, তাঁরা কত শ্রেষ্ঠ? একজন বিখ্যাত আয়ুর্ব্বেদ ব্যবসায়ীকে বল্‌তে শুনেছি যে, বামুন-পণ্ডিত দেখে কর্ম্মচারী নিয়োগ কর্ল্লে নাকি দেখা যায় যে, কারবারে চুরী-ধারী কম হয়। অর্থাৎ পরকালে বিশ্বাসী শাস্ত্রাজীব ব্যক্তি জড়বাদী বস্তুতন্ত্রবিলাসী ভোগ-প্রচারক ব্যক্তির তুলনায় নিশ্চিতই নির্লোভতর হবেন।

ব্রাহ্মণ ও অবসাদ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু চারিত্রিক বল এবং প্রভাবের শক্তি ব্রাহ্মণের সহজাত সম্পদ হ'লেও আজ যে তাঁকে অবসাদের তামসিকতা ত্যাগ কত্তে হবে। ব্রাহ্মণ আসন-

মুদ্রার অভ্যাস কত্তেন তামসিকতা বিদূরণের জন্য, সার্কাস দেখাবার জন্য নয়। ব্রহ্মচর্য্যের সাথে আলস্যের কোনো আপোষের কল্পনাও করা চলে না। হে কলির ব্রাহ্মণ, অধঃপতিত হ'লেও আপনারা ব্রাহ্মণ। যে ব্রহ্ম-বীজ আপনাদের মধ্যে সুপ্ত রয়েছে, পৌরুষের পরম সাধনায় তাকে পুনরায় প্রকাশোন্মুখ করুন, পুনরায় তাকে জগতের কাছে উদ্‌ঘাটিত ক'রে ধরুন। অবগুণ্ঠন ক্রীতদাসের জন্য, ব্রাহ্মণের জন্য নয়।

মধুম্রক্ষিত কষা

এই বক্তৃতাতে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতবর্গের অনেক দোষ-ক্রটীর কথাও বলা হইল। কিন্তু দ্বিসহস্রাধিক পণ্ডিত ও সংস্কৃত পড়ুয়া তথা শাস্ত্র-বিশ্বাসী জনগণ মুগ্ধ-কর্ণে বক্তৃতা শ্রবণ করিলেন।

বক্তৃতান্তে শ্রীশ্রীবাবামণিকে ধন্যবাদ-প্রসঙ্গে সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন,—পূজনীয় স্বামী মহারাজ আমাদিগকে অনেক কঠোর কষাঘাত করেছেন, কিন্তু এমন মধুম্রক্ষিত কষা আমরা আর কখনো দেখিনি। তিনি আমাদের শত শত দোষ চখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছেন। কিন্তু তাতে আমাদের চক্ষু-পীড়া উৎপাদিত হয় নাই, চখের দোষ কেটেছে। আমরা স্বামী মহারাজের ন্যায় দরদী বন্ধুর শাসন-বাণী মাথা পেতে নিতে চাই।

শ্রীহট্ট
বৃহস্পতিবার,১০ই মাঘ,১৩৪১
(২৪শে জানুয়ারী,১৯৩৫)

এইডেড-হাইস্কুল, গবর্ণমেণ্ট গার্লস্ হাইস্কুল এবং টেক্‌নিক্যাল স্কুল হইতে বক্তৃতার আমন্ত্রণ আসিয়াছে। শ্রীশ্রীবাবামনি সকলকেই জানাইয়া দিলেন যে, তিন দিন কোনও বক্তৃতা দিবেন না।

ছোটরও প্রাণ আছে

জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"ছোটকে কেবলই ছোট ভাবিও না, তাহার ভিতরেও প্রাণ আছে। দরিদ্র কেবলই দরিদ্র নহে, তাহার ভিতরেও প্রাণ আছে। অশিক্ষিত, অসভ্য, বন্য ও বর্ব্বর কেবলই বর্ব্বর নহে, তাহার ভিতরেও প্রাণ আছে। সে হয়ত নিজের প্রাণের প্রকৃত স্পন্দনকে এখনো ধরিতে পারে নাই। তুমি হয়ত তাহার প্রাণের প্রকৃত স্বরূপকে উদ্ঘাটিত করিতে সমর্থ হও নাই। কিন্তু নিজেকে যদি শিক্ষিত ও বড় বলিয়া অভিমান করিয়া থাক, তবে ইহাদের প্রাণকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে তোমাকেই। ইহাদের সহিত মিশিবার চেষ্টা করিয়াছ কি? আত্মাভিমান বিস্মৃত হইয়া ইহাদের সাথে গলাগলি করিয়া চলিয়া দেখিয়াছ কি? ইহাদের সুখ-দুঃখের

কথা, ইহাদের হর্ষ-বিষাদের কাহিনী অন্তরভরা মমত্ব ও সহানুভূতি লইয়া কাণ পাতিয়া কখনো শুনিয়াছ কি? যদি ইহা করিয়া না থাক, তবে এখন হইতে তাহার জন্য প্রস্তুত হও। বড় মানুষদের সেবা কম কর নাই। বড় লোকদের মোসাহেবিতে অল্প সময় তোমাদের অপব্যয়িত হয় নাই। এখন একবার ছোট'র দিকে তাকাও, নীচের পানে নয়ন মেলিয়া ধর।

নীচের ভিতরে উচ্চকে অনুভব

"অকপট সত্য নিবেদন করিব যে, ছোট কেহ আমার কাছে আসিলে আমি তাহাকে বড় বলিয়াই জ্ঞান করিয়া থাকি। জীবন বা জীবিকা কিছুরই জন্য কেহ আমার ঘৃণার পাত্র হয় নাই। আমি নীচের ভিতরে উচ্চকে, দীনের ভিতরে ধনীকে, দুর্ব্বলের ভিতরে সবলকে, অজ্ঞানের ভিতরে জ্ঞানীকে, অমানীর ভিতরে মানীকে, কদর্য্যের ভিতরে সুন্দরকে, অনর্হের ভিতরে আর্য্যকে অবিরাম খুঁজিয়া বেড়াইয়া থাকি। আমার প্রাণভরা প্রেম ডোম, চাঁড়াল, মুচি আর রিয়াং, কুকীও মগের ভিতরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

অনার্য্য উদ্ধারের পন্থা

"শুধু কথায় ত' চিঁড়া ভিজিবে না। তোমাদের প্রাণে যদি

অনুরূপ ধ্যান জাগিয়া থাকে, তবে তোমরা মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিও না। বহুজনে মিলিয়া সঙ্ঘবদ্ধ হও, সকলে অকপট দারিদ্র্যের ব্রত গ্রহণ কর, নিজেদের সকল শক্তিকে সঙ্কর্ষণ-মন্ত্রে জাগরিত কর এবং অকৃষ্ট ভূমিতে সংস্কৃতি ও সভ্যতার লাঙ্গল গভীর করিয়া চালনার জন্য সকল দিকের সকল আয়োজন পূর্ণ কর। বনে, পর্ব্বতে, প্রান্তরে অথবা অবজ্ঞাত বিস্মৃত পল্লীতে একটা একটা করিয়া কেন্দ্র নির্ব্বাচন কর। প্রতি কেন্দ্রে ছয় মাস পরে পরে একজন করিয়া প্রচারক প্রেরণ কর। এমন ব্যক্তিকে প্রেরণ কর, যে তার বহুবর্ষের লব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা এই অজ্ঞান মানব-কুলের মধ্যে প্রাণ ঢালিয়া বিতরণ করিয়া আসিতে পারে। পাঠাইবে প্রচারক, প্রতারক নহে। তথাকথিত অনার্য্যকে যে নিজ দাম্ভিকতার আঘাতে পীড়িত করিবে, তাহার সরল জীবন-যাত্রার মাঝে কুটিল কুরীতির প্রবর্ত্তন করিয়া তাহাকে গ্রন্থিল, জটিল, আবিল অনাচারের মধ্যে যে নিক্ষেপ করিবে, অনার্য্য-কন্যার সহজ সারল্যের যে অন্যায় সুযোগ গ্রহণ করিতে প্রলুব্ধ হইবে, আতিথেয়তার যে অপমান করিবে, এমন প্রবঞ্চক কাহাকেও পাঠাইও না। সর্ব্বস্ব দিয়াও যে মনে করিবে যে, কিছুই দিল না, অল্প পাইয়াও যে মনে করিবে যে, কুবেরের ঐশ্বর্য্য সে পাইয়াছে, অল্পে তৃপ্ত, সদাসন্তুষ্ট, নির্লোভ এবং অভিসন্ধিহীন কর্ম্মীকেই তোমরা পাঠাইবে। সমস্ত জীবন সে অনার্য্য উদ্ধারের পবিত্র ব্রতে উৎসর্গ না করিতে পারে ত'

জীবনের মাত্র ছয়টী শ্রমপূর্ণ পবিত্র মাস সে এই মহদ্ব্রতে সার্থক করুক। তোমার ধর্ম্ম, তোমার সাধনা, তোমার শিক্ষা তোমাকে কি দিয়াছে, তাহা তুমি এই ছয়টী মাস ধরিয়া বন-জঙ্গলের অধিবাসী তোমার সেই ভাবী আর্য্য ভাই-বোন্‌দের শুনাইবে ও শিখাইবে। সম্মুখে শিক্ষাদানের ভাণ করিয়া পিছন হইতে অর্থ-নৈতিক দাসত্বের লৌহ-নিগড় তাহাদের পায়ে বাঁধিয়া দিবার জন্য নহে, পরন্তু ঐহিক এবং পারত্রিক সর্ব্ববিষয়ে তাহাদিগকে মুক্তির আস্বাদন প্রদান করিবার জন্যই তোমাদের যাইতে হইবে।

প্রচারক নির্ম্মাণের প্রতিষ্ঠান

"এজন্য প্রচারক-শিক্ষার প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন। খ্রীষ্টান মিশনরীরা খ্রীষ্টের বাণী প্রচারের জন্য যোগ্য কর্ম্মী সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এইরূপ প্রতিষ্ঠান বহু গঠন করিয়াছেন। তোমরা আজ পর্য্যন্ত তাহা কর নাই, এরূপ বলা চলিতে পারে। দুই একস্থানে যে দুই একটী চেষ্টা হইয়াছে, তাহাও হয়ত উল্লেখযোগ্য নহে। পদ্ধতিবদ্ধ প্রচার-কার্য্য শিক্ষার জন্য অতি বিরল যে দুই একটী প্রতিষ্ঠান সাফল্যের অরুণ কিরণ কিছু কিছু পাইয়াছে বলিয়া আমরা অনুমান করি, তাহাও খ্রীষ্টান মিশনরীদের সঙ্কীর্ণতা, গোঁড়ামি এবং ধর্ম্মান্ধতার অনুকরণ করার ফলে আর্য্য-সাধনা ও সভ্যতার প্রচারের উদার অধিকারের মূলে নিজেরাই নিজেদের হস্তে যেন কুঠারাঘাত

করিতে উদ্যত হইয়াছে। তোমাদিগকে সেই সঙ্কীর্ণতা বিসর্জ্জন দিতে হইবে। একজন হয়ত হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিবে না, হিন্দুর ধর্ম্মমত ও দর্শনের বিচার-প্রণালীকে নিজস্ব করিয়া লইবে না, হিন্দুর সর্ব্ববিধ আচারকে নিজস্ব আচার-রূপে স্বীকার করিতে সম্মত হইবে না, তথাপি সে মানুষ হউক, প্রকৃত মানুষের যাবতীয় সদ্‌গুণ ও শূরতার বিকাশ তাহার চরিত্রের ও অনুশীলনের মধ্যে ফুটিয়া উঠুক,—ইহাই হইবে তোমার প্রথম প্রার্থনা, ইহাই হইবে তোমার শ্রমের গৌরব, ইহাই হইবে তোমার আত্মোৎসর্গের পরম-লোভনীয় মূল্য।

পতিতকে বক্ষে তোল

"তোমরা নিজেদের বুদ্ধির দোষে, কর্ম্মের ক্রটীতে, দূরদৃষ্টির অভাবে এবং অহমিকার দর্পে ঘরেও বাহিরে চতুর্দ্দিকে কেবল অনার্য্য সঙ্গকে চিরস্থায়ী করিয়া রাখিয়াছ। ছোট জাতি বলিয়া কতকগুলি লোককে এমনই অবজ্ঞা করিয়াছ যে, তাহারা যে নিজেদিগকে তোমাদের সহিত সমধর্ম্ম বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহা যেন কতকটা প্রথা মাত্র। আর, সামান্য প্রয়াসে যাহাদের তোমরা নিজেদের ঘরের মানুষ-রূপে গড়িয়া তুলিতে পারিতে, পরিহার-নীতি অবলম্বন করিয়া তাহাদিগকে ঝড়ের মুখে ছাড়িয়া দিয়াছ। যে-কোনও দিক হইতে আগত পাগলা বাতাস তাহাদিগকে যে-কোনও দিকে টানিয়া নিবে, তোমরা কেবল নীরব দর্শকের মত দাঁড়াইয়া রহিবে। এই

ঔদাসীন্য পরিত্যাগ কর। অচিরে তোমরা সঙ্কল্প কর যে, তোমরা প্রত্যেকটী নারী এবং প্রত্যেকটী পুরুষ বৎসরে অন্ততঃ একটী করিয়া অজ্ঞান মানবকে পূর্ণ জ্ঞানের আদর্শের প্রতি অনুরক্ত করিবে। প্রতিজ্ঞা কর, এমন একটী মাসও তোমরা চলিয়া যাইতে দিবে না, যেই মাসে অন্ততঃ একজন অনার্য্যকেও হৃদয়ের উদারতা, চিত্তের প্রসন্নতা, সর্ব্বভূতে সমদর্শিতা ও ঈশ্বরে অনুরাগ অনুশীলনে সাহায্য না করিবে। এমন একটা সপ্তাহও যেন না যায়, যেই সপ্তাহে তোমরা প্রত্যেকে একজন করিয়া অপাংক্তেয়, অনাচরণীয়, অনাদৃত তথাকথিত শূদ্রকে নিজের সমান অধিকার প্রদান করিয়া গৃহে তুলিয়া না লইতেছ। ছোটকে আর ছোট থাকিতে দিও না। সাদরে তাহাকে কোলে তুলিয়া লও। স্নেহ-ভাষণে তাহার অন্তরের পুঞ্জীভূত অভিমান দূর করিয়া দাও। যে তোমার চিরকালের আপন, তাহাকে সত্যিকারের আপন বলিয়া বক্ষে জড়াইয়া ধর।

পতিতোদ্ধারের বাধা

"তোমাদের পতিতোদ্ধারের বিঘ্ন হইতেছে তোমাদের আর্য্যত্বের অহমিকা। নিজেকে এত শ্রেষ্ঠ বলিয়া জান যে, অপরের প্রাণে তাহা বিয়া ব্যথা বিঁধায়। নিজের মহত্ত্ব, নিজের গৌরব সম্পর্কে তোমরা এত সচেতন যে, নিজের হীনতা, নিজের দীনতা সম্পর্কে অপরে কিছুতেই অচেতন

রহিতে পারে না। তাহারা যে ছোট, একথা যেন তোমরাই খোঁচাইয়া খোঁচাইয়া জানাইয়া দাও। তোমাদের যে কোনও উৎসব বাসরে পতিতেরা নিজেদিগকে নূতন করিয়া পতিত বলিয়া ভাবিতে শিখিবার অবসর পায়।

সাম্যের আবশ্যকতা

"আমি সমাজের মধ্যে সীমাহীন সাম্য প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী। যৌন জীবনের সন্নীতি এবং নৈতিক জীবনের সদাচারকে লঙ্ঘন না করিয়া সমাজ-মধ্যে সর্ব্বজাতির সর্ব্ববর্ণের যতটা সমতা স্থাপন মানুষের পক্ষে সম্ভব, তাহার ষোল আনাই আমার সমর্থনের পোষণ পাইবে। কিন্তু তোমরা যদি প্রত্যেকে বা অধিকাংশ ততদূর অগ্রসর হইতে না পার, আমি তোমাদের সহিত কলহ জুড়িয়া শক্তির অপব্যয় করিব না। একদা তোমাদের সেই শুভবুদ্ধি হইবে, একদা তোমাদের সেই শক্তি আসিবে, এই প্রীতিপ্রদ আশায় বুক বাঁধিয়া আমি সুদীর্ঘকাল প্রতীক্ষা করিতে পারিব। কিন্তু অবিলম্বেই যাহা প্রয়োজন, তাহা হইতেছে হরি-নামের সেবায়, কীর্ত্তনের আসরে, উপাসনার সম্মেলনে ছোট-বড়, নীচ-উচ্চ, পতিত-উত্থিত-নির্ব্বিশেষে সকলকে সমতার পূর্ণ আস্বাদন প্রদান করা। নাম-কীর্ত্তনের মধ্যে সর্ব্বজাতি-সাম্যের দৃষ্টান্ত মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য দেখাইয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার চরণাশ্রিত গোস্বামী প্রভুগণ নিজ নিজ আচরণে তাহার প্রশংসনীয় অনুকরণ করিয়া

গিয়াছেন। এখনও পূর্ব্ববঙ্গের অনেক পল্লীতে নমঃশূদ্র ও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ এক চাটাইতে বসিয়া হরি-নাম কীর্ত্তন করিতে বা বাতাসা-প্রসাদ গ্রহণ করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না। কৈবর্ত্তের বাড়ীতে হরি-সংকীর্ত্তন হইলে এখনও নৈকষ্য কুলীনের সন্তানেরা মৃদঙ্গ কাঁধে করিয়া বা করতাল বাজাইতে বাজাইতে সেখানে যাইয়া উপস্থিত হইতে দ্বিধা জ্ঞান করেন না। কিন্তু তোমার পূজা-মন্দিরে তথাকথিত নীচ জাতির প্রবেশাধিকার হইলে কৈ? তোমার দেবতার পায়ে তোমারই এক পতিত ভ্রাতা বা অবজ্ঞাত ভগিনী মন্ত্রপাঠ-পূর্ব্বক পূজার পুষ্পাঞ্জলি ঢালিবার অধিকার পাইল কৈ? অশুচি কুক্কুর বা শৃগালকে মানুষ যে ভাবে তাড়া করে, তোমার মন্দির-দুয়ারে দাঁড়াইয়া বিগ্রহে দেখিবার জন্য একটু উকিঝুঁকি মারিলে তুমি তেমন করিয়া তথাকথিত অন্ত্যজ-জাতীয় নরনারীকে তাড়া কর। আমার মতে, একটী দিনও বিলম্ব না করিয়া ইহার প্রতিকার করা আবশ্যক।

সমবেত উপাসনায় সাম্য

"আমার প্রবর্ত্তিত সমবেত উপাসনায় আমি যোগদানকারীর নাম-গোত্র জিজ্ঞাসার পাট রাখি নাই। তুমি কি স্নান করিয়া আসিয়াছ? তুমি কি শুচি বস্ত্র পরিধান করিয়া আসিয়াছ? তুমি কি ওঙ্কার-বিগ্রহের চরণে অঞ্জলি দিবার জন্য পুষ্প বিল্বপত্র, তুলসী-চন্দন আনিয়াছ? তুমি কি ভ্রমধ্যে শ্বেতচন্দনের

একটী স্নিগ্ধ ফোঁটা পরিয়াছ? আমরা যখন 'বন্দে সদা সুন্দরম্ শ্রীসদ্গুরুম্' বলিয়া ভক্তি গদ্গদ কণ্ঠে মূর্চ্ছনা তুলিব, তুমি কি তখন আমাদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া আমাদের সুরে সুর মিশাইয়া 'নিত্যাভয়ং' সদ্গুরুকে বন্দনা করিবে? আমরা যখন ব্রহ্মগায়ত্রীর অমর-তানে আকাশ বাতাস মথিত করিব, তখন তুমিও কি তোমার মন-প্রাণ উজাড় করিয়া ওঙ্কারের মহানাদ তুলিবে? আমরা যখন প্রেম-বিগলিত হৃদয়ে প্রণবের মহিমা-সূচক পবিত্র অখণ্ড-স্তোত্র পাঠ করিব, তুমিও কি তখন আমাদের মনে মন মিশাইয়া প্রাণে প্রাণ মিলাইয়া আমাদের ভাবে বিহ্বল হইয়া 'সর্ব্বাম্ অহমিকাং ত্যক্ত্বা' ওঙ্কারকে প্রণাম করিবে? আমরা যখন ব্যক্তিগত ভাবে যাচ্ঞার বিষয় ভুলিয়া যাইয়া পরমেশ্বর নিজ অভিসন্ধি অনুযায়ী আমাদিগকে পরিচালন করুন বলিয়া আত্মসমর্পণ করিব, তুমিও কি তখন সকল কামনা, বাসনা, প্রার্থনা ও দাবী বিসর্জ্জন দিয়া একান্ত ভাবে তাঁহার শরণাগতি ও চরণাশ্রয় লইবে? আমরা যখন বিশ্বব্যাপী ওঙ্কারের সর্ব্বভূত-সমাহারের সর্ব্বতত্ত্ব-সমাহারের সর্ব্ব-রূপ-সমাহারের সর্ব্ব-মন্ত্র-সমাহারের সর্ব্ব-পন্থা সমাহারের স্বীকৃতি সূচক 'হরিওঁ' কীর্ত্তনে রত হইব, তখন তুমিও কি সঙ্গে সঙ্গে গাহিতে থাকিবে 'হরিওঁ', হরিওঁ, হরিওঁ, হরিওঁ?' তাহা যদি হয়, তবে এস কুলীন-তনয়, এস গণিকা-নন্দন, এস বেদজ্ঞ-ব্রাহ্মণ, এস মেথর-দুলাল, তোমরা সকলে আমার দৃষ্টিতে সমান মর্য্যাদার

অধিকারী। আমার বিগ্রহের চরণ-তলে তোমাদের ভক্তি-বেপথু-কম্পিত কোমল পুষ্পাঞ্জলি পড়িতে দেখিয়া আমি কৃতার্থ হইব, তোমাদের হাতে পরিবেশিত প্রসাদীয় বস্তু আনন্দ সহকারে আমি গ্রহণ করিব।"

শ্রীহট্ট

শুক্রবার, ১১ই মাঘ,১৩৪১

(২৫শে জানুয়ারী,১৯৩৫)

শ্রীশ্রীবাবামণি প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। তিনটী স্থানীয় যুবক শ্রীশ্রীবাবামণির সঙ্গ লইয়াছেন।

মাতাপিতার প্রতি কর্ত্তব্য

তন্মধ্যে জনৈক জিজ্ঞাসু প্রশ্ন করিলেন,—মাতাপিতার প্রতি সন্তানের কর্ত্তব্য কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সর্ব্বতোভাবে তাঁদের সেবা এবং সন্তোষ বিধান।

প্রশ্ন।—মাতাপিতার সন্তোষ-বিধান কত্তে গেলে যদি অন্য দিকের কর্ত্তব্যের হানি হয়?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দৃষ্টান্ত দেখাও।

মাতাপিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ

প্রশ্নকর্ত্তা।—যেমন ধরুন, আমি একটী নির্দ্দিষ্ট মেয়েকে

বিবাহ কত্তে ইচ্ছুক। মাতা-পিতা বাধা দিলেন। তখন কি কর্ত্তব্য?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—যে দেশে মাতা বা পিতার সুখের দিকে তাকিয়ে রামচন্দ্র যান বনবাসে, পুরু পরিত্যাগ করেন যৌবন, ভীষ্ম থাকেন চির-কুমার, সে দেশে মাতাপিতা বাধা দিলে কোনও একটী নির্দ্দিষ্ট মেয়েকে বিবাহ ক'ত্তে তোমাকে বিরত হ'তে হবে বৈকি?

প্রশ্ন।—কিন্তু এর ফলে আমার বা সেই মেয়েটীর জীবন যদি বিষময় হয়?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—হোক্, তবু এই বিষের জ্বালার ভিতর থেকে আদর্শের অমৃত বহির্গত হবে।

প্রশ্ন।—সেই মেয়েটীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক যদি এতটা অগ্রসর হ'য়ে থাকে, যে, এর পরে তার বা আমার পক্ষে অন্যত্র বিবাহিত হওয়া আর দ্বিচারী হওয়া এক কথা?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—এক্ষেত্রে তোমাদের দুজনের মধ্যে বিবাহই সঙ্গত, কিন্তু তথাপি মাতাপিতার অনুমতি নিয়ে।

প্রশ্ন।—অনুমতি যদি তাঁরা কিছুতেই না দেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—যেখানে তোমাদের দুজনের প্রকৃত বিবাহ আগেই হয়ে গিয়েছে, সেখানে তাঁরা লৌকিক বিবাহকে আর কয়দিন ঠেকিয়ে রাখ্‌তে পার্ব্বেন? আনুগত্য দিয়ে বিনয় দিয়ে তাঁদের বশীভূত কর্ব্বে। আর তা' যদি কিছুতেই না

পার, তবে দুজনেই পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে চির-কুমার ও চির-কুমারীর ন্যায় জীবন-যাপন কর্ব্বে।

প্রতীক্ষা ও যোগ্যতা

জিজ্ঞাসু কিয়ৎকাল চিন্তা করিলেন। তৎপরে বলিলেন,—কিন্তু বিবাহেচ্ছুক হ'য়েও আমরা দুজনে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে চিরকুমার বা চিরকুমারীর মত জীবন যাপন কত্তে থাক্‌লে, ঘটনার চক্রে যদি দুজনের একজনকে অন্যত্র বিবাহিত হ'তে বাধ্য হ'য়ে যেতে হয়?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তখন যার বিবাহ হয় নি, সে জেনে নেবে যে, অপর ব্যক্তি তার সঙ্গে বিবাহিত হবার যোগ্যই ছিল না। যে যার যোগ্য, সে তার জন্য অনন্ত কাল ধ'রে প্রতীক্ষা কত্তে পারে। যে অযোগ্য, সে প্রতীক্ষায়ও অক্ষম।

বিবাহে পিতামাতার নির্ব্বাচন ও সন্তানের দ্রোহ

প্রশ্ন।—আচ্ছা, অন্য একটী প্রশ্ন করি। কারো বাপমা যদি জেদ করেন যে, তোমাকে অমুক মেয়েই বিয়ে কত্তে হবে বা অমুক ছেলের কাছেই বিয়ে বস্‌তে হবে, তখন কি নির্ব্বিচারে সে আদেশ পালন কত্তে হবে? মনে করুন,

নির্ব্বাচিত মেয়েটী বিকৃতমস্তিষ্ক বা হাবা, কিম্বা নির্ব্বাচিত ছেলেটী দুশ্চরিত্র বা কুৎসিত রোগে আক্রান্ত।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—বিয়ে কত্তে বল্লেই তা' পালন বা অপালন করা চলে না। কেন এই নির্দ্দিষ্ট স্থানে বিবাহিত হবার জন্য বল্‌ছেন, তা' দেখ্‌তে হবে। ঋণের দায় থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য যদি দারিদ্র্য-পীড়িত লাঞ্ছিত পিতামাতা পুত্রের বা কন্যার পক্ষে ক্ষতিজনক সম্বন্ধ স্থির করেন, তা হ'লেও পিতামাতার ত্রুটী তাতে যাই হোক্, পুত্র বা কন্যা আদর্শের হিসাবে এখানে আত্মবলি দেবেন। অথবা কোনও সত্যের দায় থেকে উদ্ধার পাবার মানসে যদি পিতামাতা এরূপ কার্য্য করেন, তবে তাতেও পুত্র বা কন্যার নীরবে আদেশ পালনই আদর্শ-স্থানীয় হবে। কিন্তু বিপৎত্রাণের জন্যও নয়, আদর্শ রক্ষার জন্যও নয়, পরন্তু নিতান্ত সাধারণ বা হীন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যদি বাবা বা মা এরূপ বিবাহের আয়োজন করেন, তবে পুত্র বা কন্যার বিদ্রোহ কর্ব্বার অধিকার আছে। সেই দ্রোহের হেতু কিন্তু আত্ম-তোষণ বা ইন্দ্রিয়-পরিপ্রীণন হ'লে চল্‌বে না। হেতু হওয়া চাই নিখিল জগতের বৃহত্তর কুশলের দাবী।

স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি

প্রশ্ন।—মনে করুন, পিতামাতা একটী সুস্থ, শিক্ষিতা,

সুন্দরী মেয়েই আমার জন্য স্থির করেছেন। কিন্তু যেই বংশ থেকে মেয়েটী আস্‌ছে, সেই বংশটার প্রতি আমার এক মজ্জাগত বিদ্বেষ আছে। এক্ষেত্রে কি করণীয়?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—তোমার বিদ্বেষের স্বরূপ মাতা-পিতার নিকট উদ্‌ঘাটন কর। তবু যদি তাঁরা মনে করেন যে, এ বিবাহ অবশ্যকরণীয়, তবে তাঁদের মতেই সায় দিতে হবে। বরং তুমি সেই বিদ্বিষ্ট বংশটার সঙ্গে সম্পর্কে রাখ্‌বে না। স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি, কোনও কন্যা যদি রত্নস্বরূপিণী হয়, তবে তাকে কদর্য্য কুল থেকেও তুলে এনে ঘরের লক্ষ্মী কর্ব্বে বৈ কি।

বিধর্ম্মী বা বিদেশী কন্যার পাণিগ্রহণ

জিজ্ঞাসু হাসিয়া পুনরায় প্রশ্ন করিলেন,—আচ্ছা, আর একটী প্রশ্ন করি। বাপ মা যদি কাউকে ব'লে বসেন যে তাকে বিধর্ম্মীর বা বিদেশীর মেয়ে বিয়ে কত্তে হবে?

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—সেদিন যে সূর্য্য পশ্চিম দিকে উঠ্‌বে হে। তোমাদের অভিভাবকেরা যেদিন বল্‌তে পার্‌বেন যে, হিন্দু-অহিন্দু, ভারতীয়-অভারতীয় সবার মধ্য থেকে বেছে বেছে ভাল ভাল মেয়ে এনে ঘরে পুত্রবধূ ক'রে তোল, সেদিন যে পৃথিবীতে হিন্দু ছাড়া অন্য ধর্ম্মাবলম্বী অতি অল্পই থাক্‌তে পার্‌বে। তেমন সুবুদ্ধি কি তোমাদের

অভিভাবকদের হবে? মন থেকে সকল পূর্ব্ব-সংস্কার ঝেড়ে ফেলে দিয়ে যেদিন শ্যামিজ, বর্ম্মিজ, জাভানীজ, চায়নীজ, জাপানী, রুষীয়ান, জর্ম্মাণ, বুলগেরিয়ান, ইটালিয়ান প্রভৃতি সব জাতীয় মেয়েকে তোমরা কপালে সিঁদুর লাগিয়ে, ভারতীয় শাড়ী পরিয়ে, ভারতের প্রতি সুগভীর মমত্ব-বুদ্ধির সঞ্চারণা দিয়ে, এই দেশের ভাষায় কথা বলিয়ে, এই দেশের লোকের মত অনাড়ম্বর জীবন যাপন করাতে পার্ব্বে, এই দেশের তুলসী-মঞ্চে এই সব মেয়েদের দিয়ে যেদিন আরতির প্রদীপ জ্বালাতে পার্ব্বে, ভারতের সীতা, ভারতের সতী, ভারতের সাবিত্রীকে যেদিন এদের দিয়ে আদর্শ ব'লে মানিয়ে নিতে পার্ব্বে, সেই দিন ভারতবর্ষ হবে ত্রিভুবন-বিস্তৃত, আর, হিন্দু হবে পৃথিবীর অধিকাংশ নরনারী। অভিভাবকেরা এই বিষয়ে নিজেরা অগ্রণী হ'লেন না ব'লেই ত' তোমাদের মধ্যে যে দুই একজনে বিবাহ-ব্যাপারে বিপ্লবীর মূর্ত্তি ধারণ করেছ, তারা বধূটীকে হিন্দু বা ভারতীয় না ক'রে, তোমরা বরেরাই বরং অহিন্দু এবং অভারতীয় হ'য়ে যাচ্ছ। ফলে তোমাদের মিলন থেকে ভারতীয় জাতির সৃষ্টি না হ'য়ে এক প্রকারের ফিরিঙ্গী জাতের সৃষ্টি হচ্ছে, যারা ভারতে জন্মলাভকে ঘৃণা করে, যারা ইংল্যাণ্ডকে বলে 'হোম', যারা দেশী প্রথায় আহার, উপবেশন, শয়ন বা ভ্রমণকে নিতান্ত গ্রাম্যতাপূর্ণ ব'লে জ্ঞান করে, যারা নিজেদের পিতামাতা কেন বাঙ্গালী

বা ভারতীয় ছিলেন ভেবে মনে মনে অগৌরব বোধ করে।

প্রশ্ন।—হিন্দু বা ভারতীয় যুবকেরা যদি অহিন্দু বা অভারতীয় কনের পাণিগ্রহণ করে, তাহ'লে হিন্দু বা ভারতীয় কুমারীরা যাবে কোথায়? তাদেরও বর চাই?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—দুষ্কুল থেকে স্ত্রীরত্ন গ্রহণের প্রথা সমাজ-বিধিতে প্রচলিত হ'লেই যে লক্ষ লক্ষ লোকে সেই প্রথার অনুসরণ কর্ব্বে, তা' নয়। এই প্রথাকে সমাজ-চল্‌তি করার উদ্দেশ্যই এই হবে যে, আমাদের ছেলেরা যারা সব নানা দেশে নানা প্রয়োজনে বৃহত্তর ভারত সৃষ্টির মানসে শ্রম ক'রে বেড়াচ্ছে, তারা যদি কেউ নিজেদের শ্রমের উপযুক্ত সঙ্গিনী বিদেশিনীর ভিতরে পায়, তবে তা'কে পত্নীরূপে গ্রহণ কর্লে আমরা বিরুদ্ধতা দিব না। সে তাকে গ্রহণ করুক এবং আমাদের মত ক'রে গ'ড়ে তুলুক। আমরা যদি চায়নীজ বা জাপানীজ বধূটীকে নিজেদের বাঙ্গালী বধূর মতই স্নেহের দৃষ্টিতে গ্রহণ করি, তবে সে ত' এই স্নেহের টানেই বাধ্য হ'য়ে বাঙ্গালীর বেশ, বাঙ্গালীর ভূষণ, বাঙ্গালীর স্বভাব, বাঙ্গালীর চরিত্র, বাঙ্গালীর রীতি, বাঙ্গালীর নীতি পরমাহ্লাদ সহকারে গ্রহণ কর্ব্বে। এতে সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে আমাদের প্রাণের যোগাযোগ বর্দ্ধিত হবে। কিন্তু এর ফলে এত বিদেশী আমাদের ঘরে কখনো আস্‌বে না, যাতে আমাদের কন্যাদের বরের অভাব হবে।

হিন্দু কন্যা কর্ত্তৃক অহিন্দু বিবাহ

প্রথম জিজ্ঞাসুর দুইটী বন্ধুও সঙ্গে আসিয়াছেন। প্রথম বন্ধু বলিলেন,—অনেক হিন্দু মেয়েরা মুসলমান বা খ্রীষ্টান বরকে বিবাহ কচ্ছে। এ সম্বন্ধে আপনার মত কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যেই যুবতী কুমারী একজন মুসলমান বা একজন খ্রীষ্টানের সঙ্গে নিজের চরিত্রের সমতা অনুভব কর্ব্বেন, তিনি ত' মুসলমান বা খ্রীষ্টানকে বিবাহ কর্ব্বেনই।

প্রশ্ন।—এর ফল কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—মেয়েটী গিয়ে মনে প্রাণে খ্রীষ্টান বা মুসলমান হবেন এবং তাঁর গর্ভে যারা জন্মাবে, তারা পিতার ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি গ্রহণ কর্ব্বে এটাই স্বাভাবিক।

শ্রীহট্ট

শনিবার, ১২ই মাঘ, ১৩৪২

(২৬শে জানুয়ারী,১৯৩৫)

স্মৃতি তর্পণ

শ্রীহট্ট-শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী সৌম্যানন্দজী মহারাজ আসিয়াছেন শ্রীশ্রীবাবামণিকে আগামী ১৩ই মাঘ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন-প্রাঙ্গণে শ্রীমদ্ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জন্মতিথি

উৎসব উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তৃতা দিবার জন্য আমন্ত্রণ করিতে।

শ্রীশ্রীবাবামণি সানন্দে সম্মত হইলেন। কিন্তু বলিলেন,—দেখুন স্বামীজী মহারাজ, বিবেকানন্দের মত মহাপুরুষের স্মৃতি-তর্পণ বাক্য দিয়ে হয় না, তার জন্য দিতে হয় প্রাণ। আমি বাক্য বর্ষণ ক'রে তাঁর মহিমার মান কতটুকু রাখ্‌ব বা বাড়াব? এইরূপ এক একটা দিনে হাজার হাজার যুবক-যুবতী একই সঙ্গে জীবকল্যাণে সর্ব্বত্যাগের ব্রত গ্রহণ কর্ব্বে, তবে বলা চলে যে, স্মৃতি-তর্পণ হ'ল।

শ্রীহট্ট

১৩ই মাঘ, রবিবার, ১৩৪১

(২৭শে জানুয়ারী, ১৯৩৫)

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের বক্তৃতা

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে শ্রীশ্রীবাবামণি যে বক্তৃতা আজ প্রদান করিলেন, দুঃখের বিষয় তাহার অনুলেখন পাওয়া যায় নাই। বক্তৃতা দুই ঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট কাল ব্যাপিয়া হইল। প্রায় ছয় হাজারের মত শ্রোতা সমবেত হইয়াছিলেন। সভাপতি শ্রীযুক্ত দুর্গেশ্বর শর্ম্মা বলিলেন,—পূজ্যপাদ আচার্য্য শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দজী আজ যে ভাষণ প্রদান কর্ল্লেন, শুনে আমার মনে হচ্ছে, স্বয়ং স্বামী

বিবেকানন্দই যেন নিজে এসে নিজের জীবন-কাহিনী বর্ণনা ক'রে গেলেন।

বক্তৃতার বিদ্যা

একজন শ্রোতা সভাভঙ্গের পরে আসিয়া শ্রীশ্রীবাবামণিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—স্বামীজী, এরূপ বক্তৃতাদান আপনি শিখ্‌লেন কোথায়?

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—বক্তৃতা দিতে কি আর শিখ্‌তে হয়? শিখ্‌তে হয়, মহান্‌ ভাবের কাছে আত্মসমর্পণ কত্তে। বিবেকানন্দ যে অত বড় প্রখ্যাত বক্তা, তার কারণ তাঁর বিদ্যা নয়, তার কারণ, তাঁর অন্তরের অকপট আত্মসমর্পণ। যে নিজেকে যত বেশী বলি দেবে, তার বাক্য তত অধিকতর বলী হবে।

শ্রীহট্ট

সোমবার, ১৪ই মাঘ, ১৩৪১

(২৮শে জানুয়ারী, ১৯৩৫)

ক্ষতির পরিপূরণ

জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"ক্ষতি হইয়াছে বলিয়াই মুষড়িয়া পড়িও না। ক্ষতি

যেমন হইয়াছে, তেমন তাহার পূরণও কোনও না কোনও পথে আসিবে। তোমার যে হৃদয়-বান্ধব আজ চলিয়া গেল, তাহা শুধু পরম-বান্ধবকে তোমার সমীপস্থ করিবার জন্য। তোমার যে প্রাণপ্রিয় পুত্র আজ চলিয়া গেল, তাহা শুধু তোমার নিজের প্রাণের সহিত নিজে সাক্ষাৎকার সংস্থাপনেরই জন্য। তোমার যে বহু বিপুল ধন-দৌলত, সমৃদ্ধি, সম্পদ আজ বিনষ্ট হইল, তাহা তোমার অন্তরের মহত্তম সম্পদের খনিতে তোমাকে আরোপিত করিবার জন্য। চতুর্দ্দিকে যে তোমার সর্ব্বস্ব ছারেখারে গেল, ইহা আজ দেখিতে যতই ভয়ঙ্কর হউক, অদূর ভবিষ্যতে প্রমাণ পাইবে যে, ইহা কেবলই অনর্থ নহে, ইহার ভিতরে বিরাট সার্থকতাও লুকাইয়া ছিল। আজ তুমি যাহা দেখিতে পাও নাই, ভাবী কালে তাহা তোমার চখের সমক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। দুর্ভাগ্যের তাণ্ডব-নর্ত্তন কেবলই তাণ্ডব নহে, ইহার মধ্যেও ছন্দ আছে, তাল আছে, ভাব আছে, লক্ষ্য আছে। দুঃখ তোমাকে বুঝাইয়া দিতেছে যে, তুমি কত ক্ষুদ্র, কত অসহায়। সে তোমাকে তোমার পরম সহায়ের স্নেহের ক্রোড়ে নিয়া ঠেলিয়া দিবে। তোমার যিনি প্রকৃত আপন, তাঁহার বুকের কাছে দাঁড়াইয়া থাকিয়াও এতদিনে তাঁহাকে চিনিতে পারিলে না। নিদারুণ বিপৎ-পাত তোমাকে আপন চিনাইয়া তবে ছাড়িবে।"

বাঞ্ছিতা ও মাতা

অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সমস্যা কঠিন কিন্তু তোমাকে বলিষ্ঠতার পরিচয় দিতে হইবে। নুইয়া পড়িও না, মেরুদণ্ড সরল কর। তোমার বাঞ্ছিতা কিশোরী রূপে গুণে জগতে অতুলনীয়া হইতে পারে, কিন্তু সুন্দরী রমণী, গুণবতী কামিনী জগতে সহস্র সহস্র পাইবে, মা ত' আর একটীর বেশী দুইটী হইবে না। তরুণের প্রেম বড়ই ভঙ্গুর জিনিষ। তোমাদের প্রেমের স্বপ্ন কদাচিৎই দীর্ঘকাল থাকে। আজ যাহাকে সমগ্র প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছ, কাল হয়ত তাহাকেই রাক্ষসী, বাঘিনী, পিশাচী বা মৃত্যুরজ্জু বলিয়া গালি দিতে তোমাদের রসনায় ঠেকিবে না। প্রেম তোমার গভীর হইতে পারে কিন্তু সত্য কি না, খাঁটি কি না, ভেজাল-বর্জ্জিত নিকষিত কাঞ্চন কি না, তাহার ত' পরীক্ষা আজই হইয়া যায় নাই বাছা। আজ যাহাকে মায়ের অমতে বাপের অমতে জোর করিয়া বধূ করিয়া ঘরে তুলিয়া আনিলে, তুমি হয়ত জানই না যে, বিবাহের পরে সে মরিয়া গেলে তাহার শবে মুখাগ্নি করিবার সঙ্গে সঙ্গেই তোমার মন অতৃপ্ত ভ্রমরের ন্যায় নূতন ফুলের মধু-সন্ধান আরম্ভ করিবে। মরা-পোড়ার ঘাটে সদ্যঃস্নানরতা রূপসী তরুণীকে দেখিয়া সদ্যঃপত্নী-বিয়োগ-বিধুর শোকার্ত্ত

স্বামী হঠাৎ নিজের অন্তরের উদ্যানে মলয়ার শিহরণ, কোকিলার কুহরণ অনুভব সুরু করিয়া দিয়াছে, ইহার দৃষ্টান্ত খুব বিরল নহে। যে দুর্ব্বলতা আরও সহস্র সহস্র পুরুষের সুনিশ্চিত রহিয়াছে বলিয়া প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে, তাহার যে লেশমাত্রও তোমাতে নাই, এমন অবাস্তব জেদ করিও না। আমার মতে মাতার আবেদন, তাহার সম্মান, মাতার বাঞ্ছা রক্ষা করার চেয়ে বড় কর্ত্তব্য-তোমার কিছু নাই এবং আমার উপদেশ এই যে, সেই কর্ত্তব্য পালনের জন্যই তুমি ব্রতী হও।"

নিজের কাজ চিনিয়া লও

অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"গ্রাম্য কথায় বলে যে, আকামের চৈৎ-পরব। তোমরা কতকটা তজ্জাতীয় কর্ম্মেই লিপ্ত রহিয়াছ। কোন্ কাজ করিলে তাহা হইতে সত্য-ফলোদয় হইবে, তাহা চিন্তা না করিয়া যখন যে হুজুগ আসিতেছে, তাহাতেই তোমরা অঙ্গ ঢালিয়া দিতেছ। ইহা অতীব মারাত্মক অবস্থা। জগতে কখনও কাজের অভাব হইবে না কিন্তু কোনটী যে তোমার নিজের কাজ, তাহা আগে বুঝিয়া দেখ। যাহা তোমার নিজের কাজ, তাহাতেই নিজেকে ডুবাইয়া দাও। পরের চরকায় তৈল দিয়া

কোনও লাভ হইবে না। নিজের চরকা চিনিয়া লও, নিজের ঘানিতে সর্ষপ ঢাল। জগতে কত কত কর্ম্মী লোকেরই ত' আবির্ভাব ঘটিল কিন্তু নিজের কাজ চিনিল না বলিয়া ইহাদের সকল শ্রম ভস্মে ঘৃতাহুতির মতই নিরর্থক হইল। কোন্ কাজে হাত দিলে তোমার আত্মোৎকর্ষ ঘটিবে, কোন কাজ করিলে তোমার জীবন সার্থক হইবে, কোন্ কাজ করিতে গিয়া মরণ-বরণ করিয়াও তুমি অমরত্ব অর্জ্জন করিবে, তাহা চিনিয়া, তাহা জানিয়া, তাহা বুঝিয়া লইয়া তাহাতেই নিজেকে নিঃশেষে সমর্পণ করিয়া দাও। দুই দিন চুপ করিয়া থাকিয়া ধীর বুদ্ধিতে নিজের কাজটীকে চিনিয়া লও এবং তাহার পরে অশান্ত রণাশ্বের ন্যায় কর্ম্ম সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়।"

জয়-পরাজয়

অপর এক-পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"ক্ষণিকের পরাজয়ে হতভম্ব হইয়া যাইও না। নিশ্চিত জানিও, বিজয়ই তোমার ভাগ্যলিপি,—মাত্র আদর্শের সহিত দৃঢ়প্রযত্নে লগ্ন হইয়া থাক। জগতে হারিয়া গিয়াও অনেকে জিতে, জিতিয়া গিয়াও অনেকে হারে। প্রয়োজন শুধু নিজের কাজটী চিনিয়া লওয়া,—স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।"

নিজের কাজ চিনিবার উপায়

পত্রগুলির যিনি নকল রাখিতেছিলেন, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,— কোনটী আমার নিজের কাজ, তা' চিন্‌ব কি ক'রে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জগতের সকল কর্ম্ম সম্পর্কে আসক্তি বর্জ্জন ক'রে শান্ত চিত্তে অবস্থান করার চেষ্টা কর এবং যাতে কর্ম্মমাত্রেরই প্রতি আসক্তি হ্রাস পায়, তার জন্য নিরন্তর ভগবানের নামের সাধনে আত্মনিয়োগ কর। ফলাভিসন্ধিহীন-ভাবে নামের পরিচর্য্যা কত্তে কত্তে সকল কর্ম্মের প্রতিই একটা অনাসক্ত নির্ব্বিকার ভাব এসে যাবে। সেই সময়ে প্রাণের ভিতরে আপনা আপনি যে কর্ত্তব্য সম্পর্কে প্রেরণা বারংবার জাগ্‌তে থাক্‌বে, জান্‌বে, সেটাই তোমার নিজের কাজ।

যুগপৎ বহু-কর্ম্ম-প্রেরণায় কর্ত্তব্য

প্রশ্ন।—এক সঙ্গে যদি একাধিক কর্ম্মের জন্য এরূপ প্রেরণা জাগতে থাকে?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—সাধন-নিষ্ঠ ব্যক্তির প্রাণে একসঙ্গে অনেকগুলি প্রেরণা জাগে না। আর যদি জাগে, তবে একটার অধীন হ'য়ে অপরগুলি জাগে। কোন্‌টা যে এর মধ্যে কেন্দ্রীয় প্রেরণা, তা' সামান্য অভিনিবেশের ফলেই ধরা যায়। তখন

শাখাপ্রশাখাগুলির সেবাকে মূলের সেবার অনুগত ক'রে কত্তে হয়। একটা জীবনে মানুষ আর কত কাজ ক'রে উঠ্‌তে পারে? দলবদ্ধ কর্ত্তব্যের শ্রেণী দাঁড়িয়ে গেলে, প্রধান-অপ্রধান-পরম্পরায় প্রধানের সেবাতেই নিজেকে নিয়োগ কত্তে হয়।

প্রতিষ্ঠানের ঘুণ

অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"বাঁশকে যেমন ঘুণে ধরে, প্রতিষ্ঠানেরও তেমন ঘুণ আছে। যখন দেখিবে যে, নেতার যে আদেশ পাওয়া মাত্র পালন করিলে একটা বিষম সঙ্কট হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়, সহকর্ম্মীরা নানা যুক্তি দেখাইয়া সেই আদেশ পালনে বিলম্ব বা অবহেলা করিতেছে, তখন বুঝিতে হইবে যে, প্রতিষ্ঠানকে ঘুণে ধরিয়াছে। যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাপতিকে যদি প্রত্যেকটী সামরিক চালের ব্যাখ্যা আগে সাধারণ সৈনিকদের নিকটে করিয়া লইতে হইত, তাহা হইলে পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ জয়ক্ষেত্রগুলি পরাজয়ভূমি-রূপে কুখ্যাত হইত। যখন দেখিবে যে, যাহার উপর যে কাজের ভার ন্যস্ত রহিয়াছে, নেতৃ-স্থানীয় ব্যক্তিদের নিকটে সে সেই কার্য্যের অগ্রধাবন বা পশ্চাদ্‌গতি সম্পর্কে কোনও সংবাদ নিয়মিত ভাবে সরবরাহ করে না কিম্বা সংবাদ চাহিলে বিরক্তি বোধ করে, তখন

বুঝিবে যে, প্রতিষ্ঠানকে ঘুণে ধরিয়াছে। যখন দেখিবে, প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরা নিজেদের নেতার নিকট হইতে প্রতিষ্ঠানের কুশল অকুশল-সম্পর্কিত বহু তথ্য গোপন করিয়া রাখিতে চেষ্টিত এবং নেতার প্রদত্ত লোক-প্রতিষ্ঠাকে নেতারই বিরুদ্ধে প্রয়োগের জন্য লোক-সমাজে ব্যবহারে যত্নবান্, তখন বুঝিবে যে, প্রতিষ্ঠানকে ঘুণে ধরিয়াছে। যখন দেখিবে যে, অল্পগুণযুক্ত ন্যূনশক্তি কোনও সহকর্ম্মীর ত্রুটী সংশোধনের জন্য সঙ্গত সুযোগ প্রদান না করিয়া প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপূর্ণপদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি তাহাকে প্রতিষ্ঠান হইতে তাড়াইয়া দিবার জন্য নিত্য নূতন ফন্দী এবং নির্য্যাতন আবিষ্কার করিতেছে, আর যখন দেখিবে যে, সমধিক-গুণসম্পন্ন বিশেষ-শক্তি-সমৃদ্ধ সহকর্ম্মীর লোক-প্রভাব এবং কর্ম্ম-দায়িত্বের পরিসর-বৃদ্ধি দর্শনে অপর পাঁচ জন সহকর্ম্মী তাহাকে হেয়, অবজ্ঞেয় ও অপাংক্তেয় করিবার জন্য গুপ্ত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছে, তখন বুঝিবে যে, প্রতিষ্ঠানকে ঘুণে ধরিয়াছে।

"তৎকালে তোমাদের কর্ত্তব্য কি হইবে? বিনা বিলম্বে ঝাড় শুদ্ধ সকল বাঁশ তুলিয়া ফেল। লম্বা লম্বা বাঁশগুলির অহঙ্কার-স্পর্দ্ধিত দীর্ঘ শির কাটিয়া ফেল। কিছু শিকড় সহ গোড়ার দিকটা নিয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভিন্ন ভিন্ন মাটিতে যথেষ্ট দূরে দূরে পুতিয়া দেও। কর্ত্তিত মস্তকে গোময়ের ঢিবি

বাঁধিয়া দিয়া তাহাদের দৃষ্টি নিম্নমুখ কর এবং জগতে সকলেই যে একা, এই পরম সত্যকে অনুধাবন করিতে দাও। ইহার ফলে দুই চারিটা বাঁশ মরিয়া যাইবে, কিন্তু যেগুলি বাঁচিবে সেগুলি বাঁচিবার মত বাঁচিবে।

প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিত্ব

"একটা প্রতিষ্ঠান দশ রকমের মানুষ থাকে। একই ঘরের তিনটা ছেলে এক চরিত্রের হয় না, ইহা ত' প্রত্যহ দেখিতেছ। তদবস্থায় দশ জেলার দশটা ভিন্ন পরিবারে দশ রকমের প্রতিবেশ-প্রভাবে পালিত দশ রকমের শিক্ষাদীক্ষা-প্রাপ্ত দশটা ছেলের একই চরিত্র, সামর্থ্য বা রুচি কি করিয়া প্রত্যাশা করা যায়? অথচ সকলে এক রকম না হইলে প্রতিষ্ঠান টিকে না। এই স্থলে প্রত্যেকরই চেষ্টা করা উচিত, নিজ নিজ ত্রুটীগুলি সংশোধন করিয়া গুণগুলির উৎকর্ষ-বৃদ্ধির জন্য চেষ্টিত হওয়া। আরও উচিত, নিজেদের মধ্যে যাহারা একটু অগ্রসর, তাহাদের আচরণের যথাসাধ্য অনুসরণ করা এবং যাহারা একটু অনগ্রসর, তাহাদিগকে অগ্রসর হইবার জন্য সহায়তা করা ও উৎসাহ দেওয়া। দশে মিলিয়া কাজ করিতে হইলে প্রত্যেকেরই নিজ নিজ স্বাধীন চিন্তার গোঁড়ামি কিছু কিছু বিসর্জ্জন দিতে হয়। জনৈক সহকর্ম্মী আমার খাবার থালায় আমার অনভিমতে কেন এক তোলা ধ'নে-পাতা-

বাটা রাখিয়া গেল, অথবা আমি এই জিনিষটা খাই না জানিয়াও কেন আজ ছড়া-কচুর তরকারীই রাঁধা হইল,—এই সব তুচ্ছ ব্যাপার লইয়া মন-কষাকষি করিয়া তিন দিন প্রায়োপবেশন করার মনোবৃত্তি প্রতিষ্ঠান-গঠনের পরিপন্থী। এসব গৃহস্থদের সাজে, যাহারা স্বামি-স্ত্রীতে সারাদিন লাঠালাঠি করিয়া রাত্রি কালে আবার এক বিছানায় শুইয়াই নাক ডাকাইবে। প্রতিষ্ঠান তোমার ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের সহায়ক হউক, কিন্তু তোমার ব্যক্তিত্ব আবার অপরের ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়া তাহার ব্যক্তিত্বকে হত্যা না করে। নিজের উপমায় অপরের মর্য্যাদা বুঝিবার শক্তি যাহাদের নাই, কোন প্রতিষ্ঠানে বাস করিবার তাহারা যোগ্য নহে।

প্রতিষ্ঠান ও শৃঙ্খলা

"শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠানের প্রাণ। কিন্তু শৃঙ্খলার মানেই স্বাতন্ত্র্যের আংশিক বিসর্জ্জন, ব্যক্তিত্বের আংশিক শাসন। সকলের সকল মতলব পূরা বজায় রাখিয়া কোনও শৃঙ্খলা স্থাপিত হইতে পারে না। কতকগুলি সাধারণ নিয়মের অধীন প্রত্যেককেই হইতে হইবে। দৃষ্টান্ত যেমন, ব্যক্তিগত গোঁড়ামি যাহার যাহাই থাকুক, একদল লোকের জন্য একরূপ রান্না হইবে, আর মাঝখান হইতে একজন ব্যক্তি নিজের জন্য পৃথক্ করিয়া একটা অন্য ব্যবস্থা করিয়া লইবে, ইহার নাম শৃঙ্খলা নহে। সকল ব্যক্তি ঘণ্টাটী পড়া মাত্র আসিয়া নিজ নিজ পাতে

বসিবে, আর একজন ব্যক্তি রাত্রি একটা পর্য্যন্ত ঝিমাইয়া উপাসনা করিবে, রাত্রি দুইটায় নিজ ডাইরি লিখিবে এবং রাত্রি তিনটায় নিজের রুটির টুক্‌রা চিবাইতে বসিবে, ইহার নাম শৃঙ্খলা নহে। কাজের ঘণ্টা পড়িলে একদল লোক গাইতি, কোদাল নিয়া মাঠে নামিবে বা সুঁই-সূতা নিয়া দর্জ্জিশালায় ঢুকিবে, আর একজন তাড়াতাড়ি একগাছি ছড়ি হাতে নিয়া ক্ষুধা-বৃদ্ধির পবিত্র সঙ্কল্পে বনের মুক্ত বায়ু আহরণে বাহির হইয়া পড়িবে, ইহার নাম শৃঙ্খলা নহে। পাইখানায় যাইবার সময়ে তাহা না করিয়া নামজপে বসা, খাইবার সময়ে তাহা না করিয়া বেড়াইতে যাওয়া, নাম-জপের সময়ে তাহা না করিয়া বন্ধুগণের সহিত ধর্ম্মালাপ করা, এসব শৃঙ্খলা নহে।

"শৃঙ্খলা যদি স্থাপন না করিতে পার ত' প্রতিষ্ঠান তুলিয়া দাও। বিশৃঙ্খল জনতার আড্ডা পোষণ করিবার জন্য কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তিরই নিজ অর্থের বা সামর্থ্যের অপচয় করা উচিত নহে। শৃঙ্খলাভ্যস্ত পাঁচটী কর্ম্মী যাহা করিতে সমর্থ হয়, বিশৃঙ্খল ব্যক্তিদের বিশাল জনতাও তাহার অর্দ্ধাংশ করিতে সমর্থ হয় না।"

অদ্য সাক্ষাৎকারীদের সংখ্যা অত্যধিক। প্রাতে শ্রীশ্রীবাবামণি কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। কিন্তু বেলা এগারটা হইতে সুরু করিয়া সন্ধ্যা সাত ঘটিকা পর্য্যন্ত সাক্ষাৎকারীর বিরাম ছিল না।

অন্তরের নিষ্ঠুরতা বিদূরণের উপায়

একজন প্রশ্ন করিলেন,—অন্তরের নিষ্ঠুর ভাব দূর করিবার উপায় কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দুইটী সদুপায় আছে। একটী পার্থিব, অপরটী অপার্থিব। পার্থিব উপায় হচ্ছে, শিশুদের সরল সুন্দর মুখের পানে করুণ নয়নে তাকান, আর তার অসহায় অবস্থার কথা স্মরণ ক'রে তার প্রতি চিত্তের কোমল ভাবকে উদ্দীপিত করার জন্য যত্ন নেওয়া। অপার্থিব উপায় হচ্ছে, নিজের অসহায় অবস্থার কথা অবিরাম চিন্তন করা এবং প্রেমময়, করুণাময় শ্রীভগবানের দয়ার্দ্র ও কোমল মন খানার কথা সঙ্গে সঙ্গে ধ্যান করা। এতে অন্তরের নিষ্ঠুর ভাব দূর হ'য়ে যাবে।

অবচেতন মনের প্রতিহিংসা-বোধ ও বাহ্য নিষ্ঠুরতা

প্রশ্নকর্ত্তা।—সাধারণ ক্ষেত্রে মনে আমার তীব্র নিষ্ঠুরতা নির্ম্মমতার ভাব কিছু আসে না, কিন্তু যখনই দেখি কেউ কাউকে আক্রমণ কচ্ছে বা আক্রমণ কত্তে উত্তেজিত কচ্ছে, তখন ইচ্ছা করে যে নিজে গিয়ে বর্শা নিয়ে সেই আক্রান্ত ব্যক্তির উপরে ঝাঁপিয়া পড়ি এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত সে গতাসু

না হবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ত' বর্শা দিয়ে বিদ্ধ কর্ব্বই, পরন্তু সে ম'রে গেলেও যাতে তার দেহকে খোঁচাতে খোঁচাতে একবোরে খণ্ড-বিখণ্ড ক'রে দিতে পারি, সেই দিকে একটা অদম্য ঝোঁক এসে যায়। এখন সেই আক্রান্ত ব্যক্তি মানুষই হোক্, কি একটা ইন্দুরই হোক্, কিম্বা একটা আরসোলাই হোক।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—হয়ত তোমার শিশুকালে তোমার উপরে মানুষের অকথ্য উৎপীড়ন এসেছিল। সেই উৎপীড়নের স্মৃতি তোমার অবচেতন মনে এক নির্ম্মম প্রতিহিংসার আকারে সুপ্ত হ'য়ে রয়েছে। উত্তেজনা পূর্ণ অবসরে সেই প্রতিহিংসাই এইরূপ ভীষণ নিষ্ঠুরতার মূর্ত্তি ধারণ ক'রে আত্মপ্রকাশ করে। এর প্রতিকার কিন্তু তোমারই হাতে। যে বিস্মৃত ব্যক্তিরা একদা তোমাকে বা তোমার মাতাকে বা তোমার পিতাকে বা তোমার প্রতিপালকগণকে তোমার শৈশবে বা বাল্যে উৎপীড়ন ক'রে নানা লাঞ্ছনা-গঞ্জনায় কষ্ট দিয়েছিল, আজ সেই সকল বিস্মৃত ব্যক্তিদের মূর্ত্তি মনে মনে কল্পনা ক'রে তাদিগকে তোমার সমক্ষে উপস্থিত ব'লে জ্ঞান কর এবং বারংবার তাদের জোর ক'রে শুনাতে থাক,—"আমি তোমাদের ক্ষমা কচ্ছি, আমি তোমাদের সকল অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত থেকে মুক্তি দিচ্ছি, তোমরা যে অন্যায় আমার বা আমাদের বিরুদ্ধে একদা আমাকে অসহায় পেয়ে করেছিলে, আজ আমি সসহায় হ'য়ে তার প্রতিশোধ না তুলে তোমাদের

ক্ষমা প্রদান কচ্ছি।" এইভাবে কিছুকাল মানসিক অনুজ্ঞা অভ্যাস ক'রে যেতে থাক্‌লে একদিন হঠাৎ দেখ্‌বে যে, তোমার মনের তীব্র জিঘাংসা আপনা-আপনি ক'মে গেছে।

মানুষের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ দমন

প্রশ্ন।—শুধু তাই নয়, মানুষ জাতির প্রতি আমার অন্তরের এক তীব্র ঘৃণা বিদ্যমান রয়েছে। তাকে দূর করি কি ক'রে?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—বাবাহে, মানুষের মত মহৎও কেউ নেই, নীচাত্মাও কেউ নেই। কুকুর-বিড়ালে যা'রটা খায়, তাকে আঘাত করে না, মানুষে যে পাতে খায়, সে পাতেই অকুণ্ঠিত চিত্তে মলমূত্র ত্যাগ করে। যে মানুষ দেবতারও বরেণ্য, সেই মানুষের ঝাড়েই আবার বিশ্বাসহন্তা, কৃতঘ্ন ও বেইমানের সৃষ্টি হয়। হয়ত তোমার অন্তরে সেই জাতীয় কোনও অবচেতন চিন্তা দৃঢ়ভাবে লগ্ন হ'য়ে আছে। কিন্তু ভয়ের কিছু নেই। যেই মানুষের প্রতি তোমার তীব্র দ্বেষ, তীব্র ঘৃণা, সেই মানুষের মুখমণ্ডলে তাকিয়ে তার মাঝে একটী পদ্মফুল বা গোলাপ ফুলের অবস্থিতি চিন্তা কর্ব্বে। পদ্মফুল বা গোলাপ কারো কোনো অনিষ্ট করে না। বরং ঝিলে বা জঙ্গলে অনাদরে অযত্নে জ'ন্মেও দূর থেকে বিনা প্রতিদানে পথিকের ক্লান্ত চিত্তে শান্তি বিতরণ করে। আজকের তোমার ঘৃণ্য মানুষ কাল এই ফুলের মত সুন্দর হ'য়ে উঠতে

পারে, এই চিন্তা অবিরাম কর্ব্বে। কত্তে কত্তে দেখ্‌বে, অন্তর তোমার ক্রমশঃ পরিচ্ছন্ন হ'য়ে উঠ্‌ছে। এর চাইতেও অধিকতর ফলপ্রদ উপায় হচ্ছে, ভগবান্‌কে দ্বেষঘৃণাতীত পরম স্নেহময় শান্তিস্বরূপ ব'লে ধ্যান করা এবং জগতের সকল মানুষ যে তাঁরই কাছ থেকে তাঁরই স্বভাব অল্পাধিক নিয়ে এসেছে, এই চিন্তা কত্তে থাকা। তৎপরে ব'সে ভগবানের কাছে আকুল প্রাণে প্রার্থনা জানাবে,—"হে ভগবান্, তোমার সৃষ্ট মানুষকে তোমার স্নেহ-কর-পরশে ঠিক্ তোমার মত দয়াল, তোমার মত কোমল তোমার মত প্রেমিক, তোমার মত নিত্যসুখময়, তোমার মত আনন্দঘন কর।" এই প্রার্থনার শক্তিতে তোমার নয়নে প্রেমের অঞ্জন লেগে যাবে, তখন সমস্ত জগতের সমস্ত বস্তুই প্রেমময়, মধুময়, সুখময়, ব'লে উপলব্ধ হবে।

ছোট জাতের প্রতি ঘৃণা বিদূরণের উপায়

অপর একজন প্রশ্ন করিলেন,—মুচি, মেথর, মুদ্দফরাস প্রভৃতি ছোট জাতের প্রতি ঘৃণা বিদূরণ করার উপায় কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রথম উপায় অনুকম্পা, দ্বিতীয় উপায় সহানুভূতি। এসব জাতীর লোক যে নোংরা থাকে, যা' তা' জীবন যাপন করে, এরা যে অশিক্ষিত, অপরিচ্ছন্ন ও নিজেদের হিতাহিত সম্পর্কে অজ্ঞ, এজন্য এদের প্রতি

অন্তরের করুণার ভাবকে জাগরিত কর এবং উপলব্ধি কত্তে চেষ্টা কর যে, যে-সব কারণে এরা এত জঘন্য অবস্থায় জীবন-যাপন কচ্ছে, সেই সব কারণকে দূর করার জন্য তোমারও আপ্রাণ পরিশ্রম স্বীকারের দায়িত্ব আছে। তৎপরে অনুভব কত্তে চেষ্টা কর যে, তুমি যদি মেথরাণীর গর্ভে জন্ম-গ্রহণ কত্তে, তুমি যদি মুচিনীর গর্ভে জন্মগ্রহণ কত্তে, তবে তোমাকে ঐ মেথর-রমণী বা মুচি-রমণীকেই মা ব'লে ডাকতে হ'ত, তারই স্তন থেকে দুগ্ধ পান ক'রে প্রাণ ধারণ কত্তে হ'ত। এভাবে মনে মনে কল্পনা ক'রে নিজের সঙ্গে নীচ জাতীর লোকদের অভেদত্ব প্রতিষ্ঠা কর। এর ফলে ঘৃণা ও বিদ্বেষ দূরীভূত হ'য়ে যাবে।

বেশ্যার দেশসেবা

অপর একজন জিজ্ঞাসা করিলেন,—বেশ্যাদের প্রতি ঘৃণা বিদূরণের উপায় কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কেন, এই ঘৃণা বিদূরিত করার প্রয়োজন কি, তাই আগে বল।

প্রশ্নকর্ত্তা।—তারা যদি দেশেব, দশের সমাজের সেবায় অগ্রসর হয়, তাহ'লে কি ঘৃণাভয়ে আমরা তাদের সেই সহযোগকে উপেক্ষা কর্ব্ব?

শ্রীশ্রীবাবামণি। —তা' কেন কর্ব্বে? দেশ, দশ বা সমাজ তোমার একচেটিয়া সম্পত্তি নয় যে, তুমি ছাড়া অপর কেউ

সেবা কত্তে এলে তাকে সেবা কত্তে বাধা দিবার কোনো অধিকার তোমার আছে। কিন্তু বেশ্যারা যদি সমাজের সেবা কত্তে আসে, তবে আগে তা'দিগকে বেশ্যাবৃত্তি পরিত্যাগ কত্তে হবে। দেশ-সেবীকে আমরা পূজা কর্ব্ব কিন্তু বেশ্যাকে নয়।

প্রশ্নকর্ত্তা।—তারা যদি নিজের অর্থার্জ্জনের প্রয়োজনে নির্দ্দিষ্ট সময়ে বেশ্যাবৃত্তি করে এবং অপর সময়ে দেশের সেবায় রত হয়, তাহ'লে আমারা কি তাদের সঙ্গে সহযোগ কর্ব্ব না?

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—কোনও গণিকা যদি কোনও গুপ্ত রাজনৈতিক দলের কর্ম্মী হয়, তবে কথা পৃথক্। কিন্তু গদাধরের ন্যায় 'ডুঢও খাই, টামাকও খাই',—দেশসেবার ব্যাপারে তা' চল্‌বে না। দেশসেবার জন্যই যদি তার প্রাণ কেঁদে থাকবে, তাহ'লে বেশ্যাবৃত্তি ছেড়ে দেওয়া কেন অসম্ভব হবে, তা' আগে বল। অনেক বিখ্যাত মদ্যপ কি দেশসেবায় নেমে একদিনে মদ ছাড়েন নি? অনেক বিখ্যাত বিষয়ী কি ভগবৎ-সেবা কর্ব্ব ব'লে একদিনে সমগ্র সম্পত্তি ত্যাগ করেন নি? তাঁরা যদি তা' পেরে থাকেন, তবে দেশসেবায় ইচ্ছুকা গণিকাকেও তার ঘৃণ্য ব্যবসায় পরিত্যাগ কত্তে হবে, তাকে পবিত্র ও নিষ্পাপ জীবিকা গ্রহণ কত্তে হবে। জীবিকা যার অপবিত্র, দেশসেবা তার নিষ্কলঙ্ক হ'তে পারে না। চিরকালের

পাপাভ্যাস তাকে দিয়ে দেশসেবার নাম করিয়ে অনেক বৃহত্তর পাপের বীজ বপন করিয়া নেয় মাত্র।

ঘৃণার সদ্ব্যবহার

প্রশ্নকর্ত্তা।—ঘৃণা কি নিজেই একটা অন্যায় নয়? বেশ্যারা পাপ করে ব'লেই কি তাদের ঘৃণা কত্তে হবে?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—ঘৃণা সব সময়েই পাপ নয়, সব সময়েই পূণ্যও নয়। ঘৃণা চিত্তের একটা বৃত্তি। এই বৃত্তির সদব্যবহারের প্রয়োজন। অস্থানে প্রয়োগ কর্ল্লে এই বৃত্তি তোমার অনিষ্ট সাধন কর্ব্বে। যেমন, ব্রাহ্মণ হ'য়ে জন্মেছ ব'লে তুমি অব্রাহ্মণদের ঘৃণা কর। স্বস্থানে প্রয়োগ কর্ল্লে এর দ্বারা তোমার কুশল হবে। যেমন, অকৃতজ্ঞ, বিশ্বাসঘাতক, দেশদ্রোহী, অসতী বা লম্পটকে ঘৃণা না কর্ল্লে তোমার মন ক্রমশঃ অকৃতজ্ঞতা, বিশ্বাসঘাতকতা, দেশদ্রোহিতা, ব্যাভিচার, ও লাম্পট্যের দিকে ঝুঁক্‌বে। এজন্য এ ক্ষেত্রে ঘৃণা তোমার হিতবর্দ্ধক। কামই বল, ক্রোধই বল, ঘৃণাই বল,—সব কিছুরই নিজ নিজ সদ্ব্যবহার কর।

পাপকে ঘৃণা ও পাপীকে ঘৃণা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মহাপুরুষ যীশুখ্রীষ্টের মূল্যবান্ উপদেশ রয়েছে,—"পাপকে ঘৃণা কর, পাপীকে নহে।" সেই উপদেশ আমরা অবশ্যই বিস্মৃত হ'তে পারি না। কেউ

একজন পাপ করেছে ব'লেই তাকে আমরা ঘৃণা কর্ব্ব না। সে যেই আপত্তি-জনক কার্য্যের অনুষ্ঠান করেছে, তাকে আমরা ঘৃণা কর্ব্ব এবং সেইরূপ কুকার্য্য নিজেরা যাতে কখনও না করি, তার জন্য সদা সতর্ক থাক্‌ব। আমাদের মনোভাব হওয়া চাই নিশ্চয়ই এই রকম। কিন্তু ব্যবহারের দিক্ দিয়ে পাপকে আর পাপীকে পৃথক্ ক'রে নেওয়া কি সহজ কথা? প্লেগ-রোগকে ভয় কর্‌ব, প্লেগ রোগীকে নিশ্চয়ই বিদ্বেষ কর্ব্ব না কিন্তু প্লেগরোগী যখন আমার বিছানায় এসে শুয়ে পড়্‌ল, তখন কি প্লেগ-রোগটাকে সে নিজের বাড়ীতে রেখে আসে? রেখে আস্‌লে ত' ল্যাঠা চুকেই যেত কিন্তু সে তা রেখে আস্‌তে সে পারে না। গণিকা সম্পর্কেও সে কথা। সমাজ-সেবক-সমিতির অফিসে এসে সে দিনের ভিতরে যে দশ ঘণ্টা সময় লোকসেবার্থ বাস করে, সেই দশঘণ্টা সময় সে গণিকাবৃত্তি করে না, একথা সত্য। কিন্তু নিজ গৃহে গণিকা বৃত্তির অনুশীলনের ফলে তার দেহে এবং মনে অন্যের উপরে সংক্রামণক্ষম যে সকল বিষ আসে, সেইগুলি কি সে সমিতিতে আসার কালে নিজ গৃহে ফেলে রেখে আসে? সুতরাং গণিকাকে ঘৃণা তুমি না কর্লে ও তার বৃত্তির জন্যই তার প্রতি ঘৃণার ভাব থাকা স্বাভাবিক। এই ঘৃণা যে তোমাদের আত্মরক্ষার সহায়ক। "পাপীকে ঘৃণা করিও না",—এই কথার মানে কখনো এই হতে পারে না যে, যত ইচ্ছা সে পাপানুষ্ঠান করুক, তাকে সম্মান কর্ব্বে, পূজা দেবে,

আলিঙ্গন-পাশে বাঁধ্‌বে। "পাপীকে ঘৃণা করিও না",—এই কথার প্রকৃত মানে এই যে, সে যত নিকৃষ্ট স্তরের অপরাধেরই অনুশীলন করুক, যে মুহূর্ত্তে সে নিজ নিকৃষ্ট আচরণ-সমূহ পরিত্যাগ কর্‌বে, সেই মূহূর্ত্তে তাকে সাদরে, সম্বর্দ্ধনা-সহকারে, সানন্দে গ্রহণ কত্তে প্রস্তুত থাক্‌বে। তার আজকের পাপের জন্য সে সমস্ত জীবন ভ'রেই তোমার ঘৃণার পাত্র হ'য়ে থাক্‌বে কেন?

শুদ্ধ-চেতার জীবসেবা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—শুদ্ধ-চেতার সমাজ-সেবাই সমাজকে স্পর্শ করে, অপরের সমাজ-সেবা প্রহসনে পরিণত হয়। আবার, জীবিকা যার যত শুদ্ধ, তার চিত্ত থাকে তত শুদ্ধ। অসংযমীর জীব-সেবা কলুষে পঙ্কিল। পরস্বাপহারীর জীবসেবা দুর্নীতির প্রসারক। কৃতঘ্নের জীবসেবা নিষ্ফল প্রয়াস। ইচ্ছা করলেই কি মানুষ খাঁটি খাঁটি জীবসেবা কত্তে পারে? তার অন্তরের অশুদ্ধতা তার বিরাট ত্যাগে, বিরাট দানে, বিরাট উৎসর্গে এসে বড় বড় ফাঁক সৃষ্টি ক'রে দেয়। একটী সত্য ঘটনা বল্‌ছি। কাশীধামে একজন ধনী ব্যবসায়ী প্রত্যহ এক হাজার খানা ক'রে নববস্ত্র ব্রাহ্মণ ও বিদ্যার্থীদের দান কত্তেন। যাতে এই দানকার্য্যের ভিতরে কোনও কর্ম্মচারীর অপচেষ্টায় চুরি-চামারী না ঢুক্‌তে পারে, তার জন্য তিনি নিজ হাতে সাদা থান মেপে নিজ হাতে কাপড় ফেঁড়ে ফেঁড়ে

দিতেন। দান-প্রার্থীরা যে যা' পেত, সেই তা' সাদরে গ্রহণ ক'রে ধনী দাতাকে আশীর্ব্বাদ কত্তে কত্তে প্রস্থান কত্ত। একদিন একটী ব্রাহ্মণের ছেলে একখানা বস্ত্র দান-স্বরূপে গ্রহণ করেছে। ছেলেটী স্থূলকায়। বস্ত্রখানা পরতে গিয়ে সে দেখ্‌ল যে, কাপড়ে তার ঠিক্ ঠিক্ মত বেড় হয় না, সে তখন কাপড়খানা মেপে দেখ্‌ল যে, এখানা দশ-হাতী নয়, নয়-হাতী। সে ভাব্‌ল, দাতা বোধ হয় ভুল ক'রে দশ হাতের বদলে নয় হাত কাপড় ফেঁড়ে দিয়েছেন। একটি সরু ছেলের কাপড়ের সঙ্গে নিজের কাপড়খানা বদল ক'রে সে প'রে দেখ্‌ল যে, এখানাতেও বেড় পাওয়া যায় না। মেপে দেখ্‌ল এখানারও দৈর্ঘ্য মাত্র নয় হাত, দশ হাত নয়। তখন একে একে আরও দান-গ্রহীতাদের কাছে গিয়ে ছেলেটী তাদের কাপড় মাপতে আরম্ভ কর্ল্ল। দেখা গেল, সবগুলিই নয়-হাতী। অথচ, কোনও কর্ম্মচারী যদি কাপড় মেপে দেয়, তাহ'লে হয়ত চুরী কর্ব্বে বা কম দেবে, এই ভয়েই ধনী দাতা নিজ হাতে মেপে মেপে দশ-হাতী কাপড় ফেঁড়ে ফেঁড়ে দিচ্ছেন। এখন ভেবে বল ত' ব্যাপারখানা কি? দাতা কি ইচ্ছা ক'রেই লোককে নয়-হাতী কাপড় দিচ্ছিলেন? দাতা কি দশ-হাতী দিচ্ছি ব'লে জেনে শুনেই নয়-হাতী কাপড় ফাঁড়ছিলেন? না, তা নয় তিনি সরল মনে প্রাণের আবেগে প্রত্যেককে দশ-হাতী কাপড়ই দিচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁর চিরকালের অভ্যস্ত চৌর্য্যপটু হস্ত আজ তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা কচ্ছে।

একদা যখন কাপড়ের বস্তা পিঠে নিয়ে দুয়ারে দুয়ারে ফেরী ক'রে কাপড় বেচ্‌তেন, সেই দিন যেমন হাত-সাফাই ক'রে ক্রেতাকে দশ-হাতী কাপড় দিচ্ছি ব'লে নয়-হাতী কাপড় দিয়ে স্বেচ্ছায় ঠকাতেন, আজ তাঁর মনোবৃত্তি সেইরূপ নয়। কিন্তু চিরকালের অভ্যস্ত হাত আজ দান-পুণ্যের অনুষ্ঠান-কালেও সেই আগের মতই চলেছে। এক এক হাত কাপড় মাপ্‌বার কালে একটু একটু ক'রে ফাঁকি থেকে যাচ্ছে, যা' দাতা নিজেও টের পাচ্ছেন না।

শ্রীহট্ট

মঙ্গলবার, ১৫ই মাঘ, ১৩৪১

(২৯শে জানুয়ারী,১৯৩৫)

প্রকৃত সত্যনিষ্ঠা

উপদেশ-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সরলতা ও সত্যনিষ্ঠা, এই দুইটীই মহৎ গুণ। কিন্তু কোন্‌টী যে কোন্‌টীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তা' নির্ণয় কঠিন। সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তির ভিতরে অনেক সময়ে একটী অতি মারাত্মক দোষ আস্‌তে দেখা যায় যে, তিনি কেবলি চেষ্টা করেন, মানুষ যেন তাঁকে, তিনি যা' তার চেয়ে একটুও বেশী ক'রে না ভাবে বা একটুও কম ক'রে না দেখে। একজন সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, তিনি লক্ষপতি কিনা, এক কথায় তিনি এর জবাব দিতে পার্ব্বেন না। হয় তাঁকে বল্‌তে হবে, "আমি লক্ষাধিক পতি",

নইলে তাঁকে বল্‌তে হবে, "আমি উনলক্ষপতি"। কারণ, নিরানব্বই হাজার নয় শত নিরানব্বই টাকা পনের আনা তিন পাই যদি তাঁর সম্পদ হ'য়ে থাকে, তবে তাঁকে লক্ষপতি বল্‌লে বেশী বলা হবে। আবার একলক্ষ টাকা এক পাই যদি তাঁর সম্পদ হ'য়ে থাকে, তা হ'লেও তাঁকে লক্ষপতি বল্লে কম বলা হবে। গোঁড়া সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিকে যদি জিজ্ঞাসা কর যে, তিনি বাজারে যাচ্ছেন কিনা, তাহ'লে তাঁর পক্ষে জবাব দেওয়া শক্ত হবে। কেননা, বাজার ত' তিনি যাচ্ছেনই, কিন্তু আগে স্কুল হ'য়ে তারপরে বাজারে যাবেন। তিনি যদি বলেন,—"হাঁ, বাজারে যাচ্ছি", তাহ'লে আগে বাজারের কাজ সেরে, তবে তাঁকে স্কুলে যেতে হয়। আর যদি তাঁকে যেতে হয় খেলার মাঠে, তবু তিনি "হাঁ" কিম্বা "না" জবাব দিতে গিয়ে বিপদে পড়্‌বেন। খেলার মাঠে যেতে হ'লে ত' বাজারের মাঝ দিয়েই যেতে হয়, সুতরাং "না" তিনি বল্‌তে পারেন না। আবার, খেলার মাঠে যাওয়াই তাঁর লক্ষ্য এবং প্রয়োজন, বাজার তাঁর লক্ষ্যও নয়, বাজারে তাঁর প্রয়োজনও নেই, সুতরাং "হাঁ"ও বল্‌তে পারেন না। সত্যনিষ্ঠার খুঁতখুঁতি যাঁদের থাকে, তাদের চেয়ে সরল লোকগুলি ভাল। সরল লোকগুলির কথায় বা আচরণে হয়ত একটু ত্রুটী থাকে, অসম্পূর্ণতা থাকে, কিন্তু তারা সহজ বুদ্ধিতে যাকে যা' ব'লে মনে করে, তা সম্পর্কে তাই করে বা ভাবে। কিন্তু সত্যনিষ্ঠার খুঁতখুঁতি-বিশিষ্ট লোকগুলি নিজের সত্য-নিষ্ঠার দৃঢ়তা সম্পর্কে সর্ব্বদা এত

অধিক পরিমাণে সজাগ থাকে যে, প্রকৃত সত্য অনেক সময়ে তাদের অহং-এর নীচে চাপা প'ড়ে যায়। যে সত্য অহংকে প্ররোচিত করে, সে সত্য সরলতার চেয়ে হীন। সত্যনিষ্ঠার উদ্দেশ্য কি অহংকে জাগান, না, ভগবানের ভিতরে অহং-চেতনাকে ডুবান? যে সরল, যে অকপট, তার যদি বাক্যে বা আচরণে ক্ষুদ্র দোষ, ক্ষুদ্র ত্রুটী, ক্ষুদ্র চ্যুতি থাকেও, ভগবান্ তা' ক্ষমা করেন। কিন্তু অহং-পরায়ণ সত্যবাদী সত্যের নাম ক'রে অহং-এরই পূজা করে, সত্যের নয়। সুবিনীত সত্যশীল ব্যক্তিই প্রকৃত সত্যনিষ্ঠ।

দেহাবসান ও আমিত্ব

আর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দেহের ধ্বংসের পরে আমাদের কি হবে, এই ত' প্রশ্ন? দেহাবসানের পরে আমরা আমাদের প্রাণের দয়িত পরমপ্রভুর সঙ্গে মিশে যাব, তাঁর সঙ্গে আমাদের যে চির-বিচ্ছেদ, তার জ্বালা দূর হবে। কিন্তু আমিত্বের সংস্কার যতক্ষণ না লয় পায়, ততক্ষণ তাঁর সাথে পূর্ণ মিলনের প্রকৃত রসাস্বাদন করা যায় না। বারংবার জন্ম আর মরণের মধ্য দিয়ে চল্‌তে হয়। সুতরাং এই দেহের অবসানের পূর্ব্বেই দেহবুদ্ধিবর্জ্জিত হ'য়ে ভগবৎ-পাপপদ্মে নিজের আমিত্বকে বলি দিতে হয়। যার আমিত্ব ও অভিমান যত-ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, সে ভগবানের তত সমীপবর্ত্তী।

মৃত্যু তোমার শুন্‌বে কথা

শ্রীশ্রীবাবামণি সদ্যোরচিত একটী সঙ্গীত আবৃত্তি করিয়া বলিলেন,—

মৃত্যু তোমার শুন্‌বে কথা,
ভাব্‌ছ কিরে তাই?
তোমার কথায় চলার গরজ
তার যে মোটেই নাই।
অশ্রুজলে সিক্ত নয়ন,
বিষণ্ণ মুখ, আর্ত্ত রোদন,
এসব দেখে ভুল্‌বে কি সে,
থাম্‌বে কি সে ভাই?
রাজায় প্রজায় সমান আদর,
তা'র কেহ নাই আপন কি পর;
যার যখনি সময় হবে,
তখন তারেই চাই।
কান্না-কাটি দিলাম ছেড়ে,
এই দাঁড়ালাম শঙ্কা ঝেড়ে,
যখন খুশী আসুক মরণ,
ভয়-ভাবনা নাই,—
দয়াল প্রভুর চরণখানি
একটু যদি পাই।

মৃত্যুর নিষ্ঠুরতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মৃত্যু অতীব নিষ্ঠুর, অতীব ভয়ঙ্কর। মৃত্যু কারো উপরোধ মানে না, কারো অনুরোধ রাখে না। শিশু তার মাতৃস্তন আঁক্‌ড়ে ধরে কাঁদছে, বৃদ্ধ তার ধ্বংসাবশিষ্ট বংশের শেষ দুলালের গলা জড়িয়ে অশ্রু বিসর্জ্জন কচ্ছে, ফুলের মত সুন্দর যুবক তার প্রিয়তমার ক্রোড়ে মাথা রেখে নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে, কারাগার হ'তে পলায়িত আতঙ্ক-গ্রস্ত বন্দী কণ্টক-বনের মধ্য দিয়ে শত আঁচড়ে ছিন্নচর্ম্ম হ'য়ে ছুটে যাচ্ছে একবার শেষবারের মত তার চিরদুঃখিনী মায়ের কাণে 'মা' কথাটী উচ্চারণ করার জন্য,—কিন্তু মৃত্যু কারো জন্য দয়া রাখে না, মায়া রাখে না, কারো প্রতীক্ষা করে না। সে বড়ই নিষ্ঠুর, বড়ই কঠোর। কাল তুমি মলয়ানিল-আন্দোলিত চন্দন-তরুর শাখা-প্রান্তে প্রাণের বিহগীকে নিয়ে এসে নূতনমাত্র বাসা বেঁধেছ, আজই হয়ত এই কোকিলার কুহরণ চিরতরে স্তব্ধ হয়ে যাবে। আজ তোমার বসন্ত-উদ্যানে গোলাপ-কলিকা ফুটি ফুটি ক'রে আর ফুট্‌ল না, হয়ত এখনি তার সকল পাপড়ি ঝরে পড়্‌বে। এমন অকবি, এমন অরসিক মৃত্যু।

মৃত্যু-জয়ের উপায়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু সময় হ'লে সবাইকেই

যখন যেতে হবে, তখন আর এ নিয়ে কেঁদে কেটে লাভ নেই। অন্তরের জাড্য দূর কর, ভয় পরিহার কর, দুর্ব্বলতা অপসারিত কর। একমাত্র পরমপ্রভুর চরণ-কোণে অন্তরের সমগ্র নিষ্ঠা অর্পণ ক'রে মৃত্যুভয়কে জয় কর। মৃত্যু অপর সকলকেই ভীত-ত্রস্ত কত্তে পারে, পারে না প্রেমিককে। প্রেমিক হও। সমগ্র প্রাণ দিয়ে ভগবানকে ভালবাস। প্রেমিকের চক্ষে মৃত্যু হচ্ছে মিলন-বাধার অপসারণ। এই দেহ আর দেহের প্রতি আত্মবোধ, এরাই হচ্ছে ভগবানের সঙ্গে মিলনের প্রধান বাধা। এরাই হচ্ছে জটিলা আর কুটিলা। তাই প্রেমিক ব্যক্তি মৃত্যুকে বড়ই স্নেহের নয়নে দেখেন, ভীতির দৃষ্টিতে নয়।

উপনিবেশ স্থাপন ও সাধারণ লোক

জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"নানা স্থানে বনে পর্ব্বতে যাইয়া নূতন নূতন উপনিবেশ স্থাপন সম্পর্কে আমি যে কথাগুলি মাঝে মাঝে তোমাদের নিকটে লিখিতেছি, তাহার প্রতি তোমাদের খুব সাগ্রহ লক্ষ্য পড়িতেছে বলিয়া আমার মনে হইতেছে না। তোমরা ভাবিতেছ যে, তোমাদের ন্যায় অখ্যাত, অজ্ঞাত, ক্ষুদ্রশক্তি ব্যক্তিরা এইরূপ কাজে হাত দিয়া সফল-প্রযত্ন হইতে পারে না। একজন সেনাপতির কথা কি তোমরা শুনিয়াছ, যিনি বিদেশ

জয় করিতে গিয়া জাহাজ হইতে নামিয়াই সর্ব্বপ্রথমে নিজের জাহাজগুলিকে স্বহস্তে অগ্নিদগ্ধ করিয়া দিলেন? উদ্দেশ্য এই যে, জাহাজগুলি অক্ষত ও অটুট অবস্থায় বিদ্যমান থাকিলেই একটু বিপদ দেখিবামাত্র সৈন্যমণ্ডলী দেশে ফিরিয়া যাইতে চাহিবে। আর, জাহাজগুলি বিধ্বস্ত হইয়া গেলে শত বিপদে পড়িলেও দেশে ফিরিয়া যাইবার কোনও উপায় থাকিবে না, অতএব প্রাণ বলি দিয়া হইলেও উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করিতে হইবে। এইরূপ দৃঢ় মনোভাবসম্পন্ন হইয়া যদি তোমরা কতিপয় ব্যক্তি সম্মিলিত হও, তাহা হইলে আজ যাহা নিতান্ত উপহাসের ব্যাপার, কাল তাহা ঐতিহাসিক গৌরবে পরিণত হইবে। দেশের বড় বড় নেতারা এই দিকে লক্ষ্য দিতেছেন না বলিয়াই তোমাদের ঘাবড়াইবার প্রয়োজন নাই। সকল সময়েই দেশের শ্রেষ্ঠ নেতারা নূতন ও মহৎ কার্য্যের প্রবর্ত্তন করেন না। ইহার ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তও আমি দেখাইতেছি। 'মে ফ্লাওয়ার' নামক ক্ষুদ্র পোতে করিয়া যেদিন ইংল্যাণ্ডের কয়েকজন 'প্রটেষ্টান্ট' অকূল সমুদ্র পাড়ি দিয়া আমেরিকা রওনা হইলেন, তখন তাঁহাদের সঙ্গে দেশের নেতা কয়জন ছিলেন? কয়জন ছিলেন রাজনীতিবিদ, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক বা ধর্ম্মগুরু? তাঁহাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ছিল কি এবং মূলধন ছিল কত? একখানা ক্ষুদ্র পোতে ছাগল-ভেড়ার মত গাঁজাগাঁজি করিয়া একশতটী নরনারী সমুদ্র পাড়ি দিয়া পাঁচ মাস কাল ঝড়-ঝঞ্ঝার বেগ

সহিয়া অতীব স্বল্প সম্বলে আসিয়া ত্রিশটী বর্ব্বর আততায়ী আদিম জাতির মাঝখানে নামিলেন। ইংল্যাণ্ডের কোন্ নেতা, কোন্ জ্ঞানী, কোন্ ধনী বা কোন্ রাজা বলিতে পরিবেন যে, ইহাদিগকে তাঁহারা একটী কাণাকড়ি নগদ দিয়া কিম্বা মুখের একটী অলস ভাষণ দিয়াও উৎসাহিত করিয়াছিলেন! অথচ, ইংল্যাণ্ডের তখন স্বর্ণযুগ। রাজনীতি ক্ষেত্রে বারলে, সেসিল প্রভৃতি, দুঃসাহসিক কর্ম্মের ক্ষেত্রে র‍্যালে, ড্রেক প্রভৃতি, উন্নত চিন্তার ক্ষেত্রে বেকন প্রভৃতি তখন ইংরেজ জাতির মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিতেছেন, আর্থিক দিক্ দিয়া ইংল্যাণ্ড তখন অতীব সমৃদ্ধ এবং সুবৃহৎ কর্ম্মের ভার বহনে সমর্থ। কিন্তু কোনও প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ইংরাজ সেই দিন এই আমেরিকাগামী 'পিউরিটান'দের পিছনে আসিয়া দাঁড়ায় নাই। আশ্রয়হীন, সহায়হীন, সম্বলহীন, ভবিষ্যতের সম্পর্কে সুনিশ্চিত আশার রশ্মিহীন এই তীর্থযাত্রীরা সেদিন যে ভাবে গিয়া আমেরিকাতে নূতন সভ্যতার পত্তন করিয়াছেন, তোমরাও অন্য স্থানে তদ্রূপ কার্য্য করিতে পার।

আমেরিকার উপনিবেশ স্থাপনকারীদের অপরাধ

"কিন্তু এই সকল উপনিবেশ স্থাপনকারীদের আচরণের ভিতরে একটা গুরুতর অপরাধ ছিল, একটা অমার্জ্জনীয় পাপ ছিল, যাহার অনুসরণ তোমরা করিবে না। তাহা

হইতেছে, জাতি-বিদ্বেষের পাপ। ইংল্যাণ্ডে ইঁহারা 'প্রটেষ্টাণ্ট' বলিয়া 'ক্যাথলিক' জন-সাধারণের নিকট নিদারুণ নিপীড়ন পাইয়া বড় দুঃখে চিরতরে স্বদেশ ও জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু যাহাদের দেশে আসিয়া ইঁহারা উপনিবেশ স্থাপন করিলেন, তাহাদের প্রতি ইহারা জাতিবৈর পরিত্যাগ করিলেন না, তাহাদের সহিত ইহারা মৈত্রী স্থাপন করিতে পারিলেন না। তাহাদিগকে ইহারা ভিটা-মাটিচ্যুত করিলেন, দেশত্যাগী করিলেন, নিজেদের শক্তি ও সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে ইহারা আক্রান্ত পশুর ন্যায় তাড়া করিয়া বেড়াইলেন, তাহাদের অধিকাংশকে গোষ্ঠী গোত্রে পৃথিবী হইতে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিলেন, যাহার ফলে ঐ বংশের ঐ জাতির একটী ব্যক্তিও আজ পৃথিবীর বুকে দাঁড়াইয়া নিজ জাতির নিজ বংশের প্রতিনিধিত্ব করিতে পারিবে না, আর, যাহারা নিশ্চিহ্ন হইল না, তাহারা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় স্বাধীনতার আবাসস্থলেও শ্বেতাঙ্গের সহিত এক ট্রামে চড়িতে পারিবে না, শ্বেতাঙ্গ-কন্যা বিবাহ করিতে পারিবে না, শ্বেতাঙ্গেরা খুশীমত 'লিঞ্চিং' করিয়া তাহাদের মারিয়া ফেলিলে তজ্জন্য কোনও শ্বেতাঙ্গ কারাদণ্ড ভোগ করিবে না, কোনও শ্বেতাঙ্গের শাসন হইবে না। যাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের উৎপীড়নে স্বদেশ ছাড়িয়া অজ্ঞাত বিদেশে চলিয়া গিয়াছিলেন, আজ তাহাদের বংশধরেরা মুখে সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার বড় বড় বুলি আওড়াইয়া নিগ্রোদের

নির্য্যাতন করিতেছে, রেড-ইণ্ডিয়ানদের প্রায় বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছে। এই মহাপাপের শাস্তি একদা ইহাদিগকে ভোগ করিতে হইবে। সুতরাং অন্তরের স্বাভাবিক প্রেমবুদ্ধি হইতে যদি এই জাতীয় আচরণ হইতে প্রতিনিবৃত্ত না হইতে পার, তাহা হইলে অন্ততঃ ভবিষ্যতের শাস্তির ভয়েও প্রতিনিবৃত্ত হইও।

পাহাড়িয়াদের সহিত মিলনের আদর্শ

"পাহাড়িয়াদের ভিতরে তোমরা প্রবেশ করিবে, তাহাদিগকে নির্ব্বংশ করিবার জন্য নহে, তাহাদের সহিত মিশিবার জন্য, তাহাদিগকে নিজেদের সহিত মিশাইবার জন্য, একদা যেমন করিয়া উত্তরপশ্চিম হইতে আগত আর্য্য ভারতের অনার্য্যদের অনেককে নিজেদের ভিতরে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ভারতে স্থায়ী বাস স্থাপনের পরে নবাগত শক, হূণ, ইয়ুচি, পারদ, পহ্লবী, গ্রীক প্রভৃতিকে নিজেদের শক্তিশালী উদরে জীর্ণ করিয়া লইয়াছিলেন। পাহাড়িয়াদের ভিতরে তোমরা প্রবেশ করিবে নিজেরাও পাহাড়িয়া হইয়া যাইবার জন্য, তবে নিজ নিজ সভ্যতা-সংস্কৃতি ভুলিয়া যাইয়া নহে এবং পাহাড়িয়াদিগকে তাহাদের নিজ নিজ হিতকর বিশেষত্ব হইতে বঞ্চিত করিয়া নহে, পরন্তু তাহাদের নিজস্ব মেরুদণ্ডর উপরে তাহাদিগকে দাঁড়াইতে দিয়া তাহাদের ভিতরে তোমাদের

আশা, আকাঙ্ক্ষা, আদর্শের শ্রেষ্ঠ নির্য্যাসটুকু প্রবেশিত করাইয়া এবং তাহাদের মধ্যে তোমরা নিজেরা তাহাদের এক এক জন আপনার জন হইয়া, তোমাদের মধ্যে তাহাদের এক এক জনকে তোমাদের আপনার জন করিয়া। বিশ্বমিলনের বাণী লইয়া তোমরা তাহাদের সহিত সংযোগ সাধন করিবে, চরিত্র ও সতীত্বের অভয় ও অবিনশ্বর আদর্শকে করিবে প্রধান সহায় এবং খাঁদা নাক, ছোট চোখ, কাটা চুলকে মিলনের অন্তরায় হইতে দিবে না।

বৈষ্ণব গোস্বামীদের কৃতিত্ব

"তোমাদের পূর্ব্বাচার্য্যেরা ইহার দৃষ্টান্ত রাখিয়া যান নাই, এমত মনে করিও না। বৃন্দাবন ও নবদ্বীপের বৈষ্ণবাচার্য্য গোস্বামী-প্রভুদের শিষ্যানুশিষ্যেরা একদা সর্পশ্বাপদসঙ্কুল মণিপুর পর্ব্বতে প্রবেশ করিয়া সমগ্র রাজ্যকে রাজ্য বৈষ্ণব-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। তাঁহারা তৈমুরলঙ্গ বা চেঙ্গিস্ খাঁর মত ধনলোভে এই দুর্গম গিরি-কান্তার অতিক্রম করেন নাই, কিম্বা নেপোলিয়ান বা আলেক্জাণ্ডার দি গ্রেটের মত যশোলোভেও নহে, একমাত্র ধর্ম্মপ্রচারের পবিত্র উদ্দীপনায় তাঁহার গভীর অরণ্য নির্ভয়ে অতিক্রম করিয়াছেন এবং হস্তিপদতলে বা ব্যাঘ্রের দশন-পংক্তি সম্পর্কে একেবারে উদাসীন থাকিয়া, মনুষ্যভুক্ বিশাল অজগরকে বিন্দুমাত্র ভয়

না করিয়া হরিনামে বন মাতাইয়া মন মাতাইয়া টিডিড, টামু, ইম্ফল, ডিমাপুর ভ্রমণ করিয়াছেন। ইঁহাদের চরণাঙ্ক অনুসরণ কর। মণিপুরীদিগকে ইঁহারা নিজ নিজ জাতীয় বিশিষ্টতা হইতে বঞ্চিত করেন নাই কিন্তু প্রেমধর্ম্মের অবদানে ধনী করিয়াছেন। তবে, ইঁহারা অধিকাংশেই দারত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন, তোমাদের মধ্যে অনেককে দারগ্রাহী হইয়াও ধর্ম্মের সেবা করিতে হইবে।

বৈষ্ণব ধর্ম্মের ধারাবাহিক প্রচার বন্ধ হইবার কারণ

"বৈষ্ণব গোস্বামীদের এই কৃতিত্ব দীর্ঘকাল সমান পরাক্রমে আত্ম-প্রকাশ করে নাই। পশ্চাতে রাষ্ট্রের পরিপোষণ না থাকিলে ধর্ম্মপ্রচার সমবিক্রমে চলে না। এই কারণেই পূর্ব্ব-বঙ্গের অগণিত অনার্য্য দেখিতে না দেখিতে মুসলমান হইয়া গেল, বৈষ্ণব মহাত্মাদের প্রেমধর্ম্ম গ্রহণ করিল না। ইহা ছাড়া মুসলমান ধর্ম্মের প্রচার-কার্য্যের ঐহিক্য স্থায়িত্ব সম্পাদনে আর একটী ব্যাপার বিশেষ পরিপোষণ করিয়াছে যে, পুরাতন মুসলমান নূতন মুসলমানের সহিত রক্ত-সম্বন্ধ স্থাপন করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না। যাহাদের গার্হস্থ্য জীবন যাপনের প্রয়োজন আছে, তেমন ব্যক্তিরা তোমার ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে তুমি যদি তেমন নারীকে পতি না দিতে পার, কিম্বা তেমন

পুরুষকে পত্নী না দিতে পার, সে তোমার সমাজের সহিত লগ্ন হইয়া থাকিবে কোন্ সিমেণ্টের জোরে? বিবাহ হইতেছে, সামাজিক জোড়াই-কার্য্যের সিমেণ্ট। যেখানে একটা বিশাল অমুসলমান সমাজ হইতে মাত্র একজন আসিয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিল, সেখানেই মুসলমান সমাজ পুরুষ হইলে তাহাকে একটী স্ত্রী, স্ত্রীলোক হইলে তাহাকে একটী স্বামী দিতে চাহিয়াছে এবং দিতে পারিয়াছে। বৈষ্ণব গোস্বামীরা তাহা পারেন নাই। উল্লিখিত দুইটী কারণে, (—যাহাদের মধ্যে একটী হইতেছে রাজনৈতিক, অপরটী হইতেছে সামাজিক), বৈষ্ণব গোস্বামী প্রভুদের প্রচার-কার্য্য অব্যাহত বিক্রমে চিরকাল চলিতে পারে নাই। কিন্তু চিরকাল চলিবার পন্থা তোমাদের খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। ধর্ম্মের সহিত রাজনীতিকে মিশ্রিত করিবার অন্ধকার যুগ ক্রমশঃ চলিয়া যাইতেছে। কিন্তু সমাজ ব্যবস্থায় উদারতা ব্যতীত কোনও ধর্ম্ম বিশ্ব-বিশাল ব্যাপক বিস্তার পাইবার প্রত্যাশা করিতে পারে না।"

শ্রীহট্ট

বুধবার, ১৬ই মাঘ, ১৩৪১

(৩০শে জানুয়ারী, ১৯৩৫)

শেষ রাত্রে উঠিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি পত্র লিখিতে বসিলেন।

প্রতি গ্রামে ব্যায়ামাগার

জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"প্রত্যেকটী গ্রামে এবং প্রত্যেক সহর ও গ্রামের প্রত্যেকটী পাড়ায় একটী করিয়া ব্যায়ামাগার স্থাপিত হউক, ইহা একান্তই প্রার্থনীয় মনে করি। মনকে সহজে প্রফুল্ল করিবার পক্ষে উপযোগী স্থানেই ব্যায়ামাগার স্থাপিত হওয়া উচিত।

ব্যায়ামাগারের সভ্য

"ব্যায়ামাগারের সভ্য-নির্ব্বাচন ব্যাপারে একটু সতর্কতা অবলম্বন করা অত্যাবশ্যক বলিয়া জ্ঞান করি। যাহাকে তাহাকে সভ্যরূপে গ্রহণ করিয়া ভবিষ্যতের জন্য প্রতিষ্ঠানের দুর্নাম অর্জ্জন এবং সমাজের অকুশল বর্দ্ধন কোনও কাজের কথা নহে। যাহারা নিজ নিজ চরিত্রকে নিষ্কলঙ্ক রাখিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবে, যাহারা নিজেদের বাহুবলকে সৎকার্য্যে প্রয়োগ করিতে উদ্যত এবং অসৎকার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত রাখিতে সঙ্কল্পারূঢ় হইবে, এমন ব্যক্তি ব্যতীত অপরকে তোমাদের ব্যায়ামশালায় ব্যায়ামানুশীলনের জন্য প্রবেশ করিতে দিও না।

ব্যায়ামাগার ও রাজনীতি-চর্চ্চা

"ব্যায়ামাগারগুলিকে বিদ্যালয়ের তুল্য জ্ঞান করিতে

হইবে। এইগুলির ভিতরে রাজনীতির চর্চ্চাকে ঢুকিতে দেওয়া ভাল হইবে না। রাজনীতির চর্চ্চা বড়ই দলাদলি-প্রিয়তা সৃষ্টি করে। দলাদলি-প্রিয়তা ব্যায়াম-চর্চ্চাকারীর অনুশীলন-নিষ্ঠা দ্রুত নষ্ট করিয়া দেয়। কীর্ত্তনের আসর, নামজপের ঘর, বিদ্যালয় ও ব্যায়ামশালা প্রভৃতি স্থানের মধ্যে দলাদলিকে ঢুকিতে দেওয়ার মত মারাত্মক ব্যাপার আর কিছুই নাই।

ব্যায়ামাগার ও সাম্প্রদায়িকতা

"ব্যায়ামাগারের ভিতরে সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্রয়ও আমার নিকটে বড়ই বিপজ্জনক বলিয়া মনে হয়। ব্যায়ামানুশীলকারীর সমক্ষে থাকিবে মানবতার শ্রেষ্ঠ আদর্শ, সে হইবে বিশ্বমানবের অকপট সেবক, যে সমাজ বা সম্প্রদায়ের ভিতরে সে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেই সমাজ বা সম্প্রদায়ের প্রতি তাহার প্রাথমিক কর্ত্তব্য অতীব প্রধান হইলেও সে বিশ্বসমাজের সহিত নিজ সমাজের সামঞ্জস্য ও সংযোগের দিকে অন্ধ থাকিবে না, থাকিতে পারে না। এই কথা স্মরণে রাখিতে হইবে।

ব্যায়াম-চর্চ্চা ও রুগ্নের সেবা

"শুধুই ব্যায়ামের চর্চ্চা অনেক সময়ে চরিত্রের মধ্যে অকারণ পরুষতা, কাঠিন্য, নির্ম্মমতা ও দাম্ভিকতার উৎপত্তি

ঘটাইয়া থাকে। ব্যায়মানুশীলনকারীর স্মরণে রাখা কর্ত্তব্য যে, সে সমাজের সেবক, উৎপীড়ন তাহার ধর্ম্মের বাহিরে, অপরকে রক্ষা বা ত্রাণই তাহার ব্রত, বিনয়ই তাহার ভূষণ। এই জন্য তাহার পক্ষে কোনও রোগী-শুশ্রূষা-কারী সমিতির সহিত সংশ্রবান্বিত থাকা অত্যুত্তম। রুগ্ন ব্যক্তিদের সেবা করিতে গিয়া সংসারের অনিত্যতা স্মরণে আসিবে, নিজের দৈহিক বল বা বিক্রম সম্পর্কে বৃথা দম্ভ হ্রাস পাইবে এবং পরদুঃখবিগলিত-হৃদয়ে অন্যের ব্যথা-বেদনার দিকে দৃষ্টি দিবার সুযোগ ও প্রয়োজন ঘটিবে। ইহাতে চরিত্রের কাঠিন্য ও পরুষতা হ্রাস-প্রাপ্ত হইবে।

ব্যায়াম-চর্চ্চা ও সাহস

"ব্যায়াম-চর্চ্চা শরীরের বল ও পটুত্ব বর্দ্ধিত করে, এজন্য অনেক সময়ে সাহস বর্দ্ধনেরও গৌণ কারণস্বরূপ হয়। কিন্তু সাহস জিনিষটার প্রকৃত উৎপত্তিস্থল বুদ্ধিতে এবং হৃদয়ে, বাহুতে নহে। অনেক বড় বড় ব্যায়ামবীরকে একজন নীল পাগড়ী-ওয়ালা পুলিশ দেখিলে ভয়ে জড়-সড় হইতে দেখা যায়। কোনও কোনও ব্যায়াম-বীর দুই হাতে দুইখানা মটর-কার ধরিয়া রাখিতে পারেন, কিন্তু রাত্রিকালে একাকী শ্মশানে যাইতে সাহস পান না। ইহা হইতেই প্রমাণিত হইবে যে, সাহসের উৎপত্তিস্থান মাংস-পেশী নহে। সন্তান জলে পড়িয়া

গেলে সন্তরণে অনভিজ্ঞা চির-রুগ্না দুর্ব্বলা জননীকে স্রোতস্বতীর জলে ঝাঁপ দিতে দেখা যায়। এস্থলে সাহসের সৃষ্টি হৃদয়ে, প্রেমে, ভালবাসায়। একটী ম্যালেরিয়ায় জীর্ণশীর্ণ দশ বছরের বালকও বন্দুকের গুলির সাম্‌নে অনায়াসে বুক পাতিয়া মৃত্যু-বরণ করিতে পারে, যদি কেহ তাহাকে বুঝাইয়া দিয়া থাকে যে, এই ভাবে নির্ভয়ে বুক পাতিয়া গুলি খাইয়া মরিতে পারিলে দেশের স্বাধীনতা আসিয়া যাইবে। এই ক্ষেত্রেও সাহসের উৎপত্তিস্থল বুদ্ধিতে বা বিবেকে, বাহুতে নহে। প্রত্যেক ব্যায়াম-চর্চ্চাকারীর পক্ষে হৃদয় ও বুদ্ধির অনুশীলনের দ্বারা নিজের সাহস বর্দ্ধনের চেষ্টা করা উচিত।

আপত্তিকর সাহস

"এক প্রকারের সাহস আছে, যাহা নিদারুণ ক্রোধ বা মজ্জাগত বিদ্বেষ হইতে উৎপন্ন হয়। একজন বা এক দল লোক সম্পর্কে তোমার সীমাহীন প্রতিশোধ-প্রবৃত্তি রহিয়াছে। তাহাদের সম্পর্কে তোমার ঘৃণার অন্ত নাই। এমন ব্যক্তিদের অনিষ্ট-সাধনের জন্য প্রয়োজন হইলে তুমি ফাঁসী-কাষ্ঠে ঝুলিতে প্রস্তুত আছ, আন্দামানে যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন সহিতে তোমার ভয় নাই। এই জাতীয় সাহস সকল সময়েই সাহসের মর্য্যাদাবর্দ্ধক হয় না। এই জাতীয় সাহসের মধ্যে অনেক সময়ে এক প্রকারের কাপুরুষতা লুক্কায়িত থাকে। কোনও

ব্যায়মানুশীলনকারীদের পক্ষে এই জাতীয় সাহসের অনুশীলন কর্ত্তব্য নহে।

ব্যায়ামাগার ও পাঠাগার

"হৃদয় ও বুদ্ধির ব্যাপকতা-বিধানের উপায়-রূপে সদ্‌গ্রন্থ পাঠকে প্রত্যেক ব্যায়ামানুশীলনকারীর পক্ষে অবশ্য-করণীয় কাজ-রূপে গ্রহণ করা উচিত। ব্যায়মগার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যের সহিত সমতুল ভাবধারার পরিপোষক গ্রন্থাবলীর একটী সযত্ন সংগ্রহ বিধান করিয়া ব্যায়ামশালার সহিত সংলগ্নই একটী পাঠাগার থাকা আবশ্যক। চপলতা, জাতি-বিদ্বেষ, স্বার্থপরতা, পাশবিকতা ও কুটিলতার প্রশ্রয়দায়ক সাহিত্য এই গ্রন্থাগারে থাকিবে না। পাঠাগার ও ব্যায়ামাগার যে একটী আর একটীর অনুপূরক, এগুলি যে লোক-দেখান ভড়ং নহে, চাঁদা আদায় করার সুবিধার জন্য বাহ্যিক আড়ম্বর মাত্র নহে, এই কথা স্মরণ রাখিতে হইবে।

ব্যায়াম-প্রদর্শনীর আবশ্যকতা

"সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে নিজেদের ব্যায়াম-কৌশল প্রদর্শন করিয়া আত্ম-প্রসাদ অর্জ্জন এবং দর্শকগণের মধ্যে ব্যায়ামানুশীলনের আগ্রহ-বর্দ্ধন একটী লোকহিতকর অনুষ্ঠান বলিয়াই আমি মনে করি। কিন্তু শুধু ব্যায়ামের প্রদর্শনী

করিয়াই ক্ষান্ত না রহিয়া ইহাকে সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান-প্রসারের অন্যতম অঙ্গ-রূপেও গ্রহণ করা উচিত। যে-কেহ যে ইচ্ছা করিলে অনুশীলনের ফলে ব্যায়াম-প্রদর্শকগণের তুল্যকক্ষতা অর্জ্জন করিতে পারে, এই বিশ্বাস সকলের অন্তরে অবিলোপ্য ভাবে প্রবেশিত করিয়া দিবার ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক।

পেশাদার ডনগীর

"কিন্তু এই সকল প্রদর্শনীর আপত্তিজনক একটা দিকও আছে। গ্রীক নাট্যকার ইউরিপাইডিস তাঁহার লোক-স্মৃতি-বিলুপ্ত নাট্যবিশেষের একাংশে ব্যবসাদারী ডনগীরদের সম্পর্কে যাহা লিখিয়াছেন, আমি তাহার ভাবার্থটুকু এইখানে লিপিবদ্ধ করিতেছি। তিনি বলিতেছেন,—'গ্রীকদেশ জুড়িয়া সহস্র দুর্ভাগ্য বাজের মত ছোঁ মারিয়া চলিয়াছে, কিন্তু পেশাদার ডনগীরদের দঙ্গল দেশের যে অনিষ্ট করিতেছে, তাহার তুল্য কিছুই নহে। ইহারা ভাল ভাবে জীবন যাপন করিতে জানে না, জানে শুধু উদর আর রসনার দাসত্ব করিতে। দারিদ্র্যের মধ্য দিয়া সংগ্রাম করিয়া কি করিয়া বড় হইতে হয়, তাহা ইহারা জানে না, যে ভাবে চলিলে দুর্ভাগ্যের বিরুদ্ধে লড়াই করা যায়, সেভাবে চলিতে ইহারা শিখে নাই। যৌবন-বিভা-দীপ্ত এই সকল জীবন্ত মর্ম্মর-মূর্ত্তি সহরের বীথি শোভিতা করে কিন্তু যখন বার্দ্ধক্য আসে, তখন জীর্ণতন্তু ছিন্ন জামার মতন

ধ্বংস পায়। এই সকল লোককেই সম্মান প্রদর্শনের জন্য আমরা ক্রীড়াক্ষেত্রে দলে দলে সমবেত হই এবং ইহাদিগকে উদর পূর্ণ করিয়া ভোজন করাই কিন্তু ইহাদের উত্তম ঘুষি-বিদ্যা বা চরণ-পটুত্ব কিম্বা লোহার চাক্তি নিক্ষেপের অপূর্ব্ব বাহু-বিক্রম, এসব দেশের কোন্ সেবায় আসে? গৃহে যখন শত্রুর আক্রমণ ঘনাইয়া আসে, ইহারা কি দৃঢ়মুষ্টিতে শত্রু নিপাত করে? ইস্পাত-নির্ম্মিত তরবারির সম্মুখে পড়িয়া ইহাদের সকল পটুত্ব পলায়ন করে। সুতরাং ইহাদিগকে বিজয় কিরীটে ভূষিত না করিয়া আমাদের উচিত সেই সকল ব্যক্তি ও জ্ঞানী ব্যক্তিকে সম্মানিত করা, যাহারা বুদ্ধিতে স্থির, ন্যায়বিচারক, সুসংযত-চেতা, যাহারা নিজেদের মুখের বাক্য দিয়া অপরের অনিষ্টজনক কার্য্যের প্রতিরোধ করিতে পারেন এবং এই ভাবে আত্ম-কলহ ও শত্রুর সহিত সংগ্রাম হইতে দেশকে বাঁচাইয়া চলিতে পারেন। কারণ, এই জাতীয় কার্য্যই নগরীর সম্মান ও গ্রীকজাতির মর্য্যাদা বর্দ্ধন করে।' মহাকবি ইউরিপাইডিসের এইরূপ তীক্ষ্ণ মন্তব্য করিবার প্রকৃত হেতু কি চিন্তা করিয়া দেখিও। ডন বা কুস্তি-কসরৎ দেখাইয়া লোকের চক্ষে তাক্ লাগাইয়া দিব এবং টিকিট বেচিয়া পেট চালাইব, এই জাতীয় লোকের সংখ্যা যখন কোনও জাতির ভিতরে অত্যধিক হয়, তখন সেই জাতি হুজুগবিলাসী অপদার্থের দলে পরিণত হয়। দেশের সম্মান ও জাতির

স্বাধীনতা রক্ষণের জন্য যাহারা বল সঞ্চার করে, তাহাদের পক্ষে নিজেদের পৌরুষ ও বীর্য্য যথাসাধ্য প্রচ্ছন্ন রাখার পন্থাই উত্তম। বৃহত্তর প্রয়োজনে যাহাকে শক্তি ব্যয় করিতে হইবে, ক্ষুদ্রতর প্রয়োজনে সে আত্মপ্রকাশ করে না। আর, পেশাদার ডনগীরেরা প্রায়ই স্বাধীনতার যুদ্ধে সৈনিক হইতে চাহে না বা পারে না। তোমরা কেহই পেশাদার ডনগীর হইতে চেষ্টা করিও না।

ব্যায়ামকারীর পারিবারিক কর্ত্তব্য

"প্রত্যেক ব্যায়ামাভ্যাসকারীর কতকগুলি পারিবারিক কর্ত্তব্যও রহিয়াছে। তুমি ব্যায়ামাগারে গিয়া নিয়মিত ব্যায়াম অনুশীলন করিবার সুযোগ পাইতেছ, কিন্তু তোমার পরিবারস্থ অনেকগুলি নারী ও পুরুষ এই সুযোগ পাইতেছেন না। এই জন্য তোমার চেষ্টা করা উচিত হইবে যেন আনুষ্ঠানিক-ভাবে তোমার গৃহই পরিবারস্থ সকলের ব্যায়াম-অনুশীলনের কেন্দ্র-রূপে গৃহীত হইতে পারে। তোমার কুমারী ভগিনী-গুলির প্রতি এই বিষয়ে তোমার দায়িত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তুমি নিজে যখন ব্যায়াম করিয়া বল অর্জ্জন করিতেছ, তখন তোমার এই বিষয়ে নিশ্চয়ই উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকা উচিত যে, তোমার ভগিনীরও এতটা দৈহিক বল ও মানসিক সাহস অর্জ্জন করা কর্ত্তব্য, যেন বাগে পাইয়া অসতর্ক মুহূর্ত্তে

কোনও লম্পট তাহাকে বশীভূতা করিবার প্রয়াস পাইয়া সফল-প্রযত্ন না হইতে পারে। কোনও ব্যায়ামকারীর ভগিনীর স্বাস্থ্য বা মনের অবস্থা এমন হওয়া উচিত নহে যে, একাকিনী দূর পথ পর্য্যটন করিতে হইলে একজন পুরুষ-রক্ষী না হইলেই আর নিজ সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সে চলিতে পারিবে না।

ব্যায়ামকারী ও মাতৃ-পিতৃ-চরণ-বন্দনা

"ব্যায়ামাভ্যাসকারীদিগকে প্রায়ই নিজের ছোট ভাই-বোন্‌গুলির উপরে ক্রুদ্ধ শাসন ও কঠোর উৎপীড়ন চালাইতে দেখা যায়, পিতা বা মাতার প্রতি বিনয়-বর্জ্জিত উদ্ধত ব্যবহারও ইহাদের মধ্যে অত্যধিক পরিমাণে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। উভয়েরই প্রতীকার এক। প্রত্যহ প্রাতে ও সায়াহ্নে মাতৃ-পিতৃ-চরণ-বন্দনার নিয়ম প্রবর্ত্তিত করা। ইহাতে আশাতীত সুফল পাইবে।"

ভক্তি-বিশ্বাস ও নামের সেবা

অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"নিজের প্রাণের বিশ্বাসকে নিজের প্রাণের ভক্তি দিয়াই

পরিবর্দ্ধিত কর, নিজের প্রাণের ভক্তিকে নিজের প্রাণের বিশ্বাস দিয়াই বলবতী কর। অপরের সঙ্গ দ্বারা ইহা করিবার জন্য লালায়িত হইও না, কেননা জগতে অধিকাংশ তথাকথিত বিশ্বাসীরা মনে মনে অবিশ্বাসী, জগতে অধিকাংশ তথাকথিত ভক্তরা মনে মনে অভক্ত। অবিশ্বাসীর সংসর্গে অন্তরে অবিশ্বাস আসে, অভক্তের সংসর্গে ভক্তির মূল শিথিল হয়। প্রকৃত ভক্ত বা প্রকৃত বিশ্বাসীকে দয়া করিয়া পরমাত্মা কোনও সময়ে তোমার সমক্ষে আনিয়া দিলে তাঁহার মুখের কথা শুনিবার আগেই তোমার প্রাণে ভক্তি-বিশ্বাসের জোয়ার বহিতে থাকিবে। ভক্ত এবং বিশ্বাসী চিনিবার ইহা এক অপূর্ব্ব কৌশল। কিন্তু প্রকৃত ভক্ত ও প্রকৃত বিশ্বাসী যখন জগতে সর্ব্বদাই অতি অল্প-সংখ্যক হইয়া থাকেন, তখন মঙ্গলময় মহানামের পবিত্র সংসর্গের মধ্য দিয়াই নিজের অন্তরের ভক্তি-বিশ্বাসকে শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন করিবার জন্য চেষ্টিত হও। নাম ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু পরমাত্মার সহিত অভেদবস্তু, সুতরাং নামের সেবায় ভক্তি অবশ্যই পরিবর্দ্ধিত হইবে। নাম সর্ব্ববিশ্বাসের আশ্রয়ীভূত প্রত্যক্ষ ইষ্ট-মূর্ত্তির রূপান্তর মাত্র, সুতরাং নামের সেবা করিলে বিশ্বাস আপনিই প্রবল হইবে। একেবারে অভক্ত বা একেবারে অবিশ্বাসী জগতে কেহই নাই। তোমার ভিতরে যে কণামাত্র বিশ্বাস বা ভক্তি রহিয়াছে, নামের সেবার সংবর্দ্ধনে তাহা মহাসাগর-তুল্য বিপুল বিস্তার লাভ করিবে। নামকেই আশ্রয় কর, মানুষের সংসর্গের মুখপানে

তাকাইয়া তাকাইয়া সময় এবং সুযোগ নষ্ট করিও না। নদী-স্রোতের মত জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় চলিয়া যাইতেছে, একবার গেলে আর ত' ফিরিয়া আসিবে না।

সঙ্গদান ও গ্রহণ

"অন্তরে যখন ভক্তি-বিশ্বাসের প্রাচুর্য্য অনুভব করিবে, তখন অল্প-বিশ্বাসী ও অর্দ্ধ-বিশ্বাসীদিগকে তোমার হিতপ্রদ ও প্রেমময় সঙ্গ প্রদান করিয়া তাহাদের অন্তরের ভক্তি-বিশ্বাসকে প্রবলতর করিবার চেষ্টা পাইও। অপরকে সাহায্য করিয়া আমরা নিজেদেরই হিত সাধিয়া থাকি। কিন্তু অবিশ্বাসীর সঙ্গ করিও না। যাচিয়া সাধিয়া গায়ে পড়িয়া যাহারা অবিশ্বাসী, অভক্ত, কুতার্কিক ও ধর্ম্মদ্বেষী ব্যক্তিদের সঙ্গ করে, তাহাদের দুর্গতির সীমা থাকে না। বিশ্বাস ও অবিশ্বাস উভয়ই অত্যন্ত সংক্রামক বস্তু। অপরকে যেমন তুমি ইহা দিতে পার, অপরের কাছ হইতে তেমন তুমি ইহা নিতেও পার। এই কারণে, তোমার বিশ্বাসের অপেক্ষা যাহার অবিশ্বাস প্রবল, তাহার সঙ্গ করিবে না এবং তোমার বিশ্বাস অপেক্ষা যাহার অবিশ্বাস শিথিল, তাহাকে সঙ্গদানপূর্ব্বক উপকৃত করিতে ছাড়িবে না। অর্দ্ধ-বিশ্বাস অর্দ্ধ-অবিশ্বাস লইয়া পল্লীতে কত নরনারী বাস্তব্য করিতেছে, প্রাণে তাহাদের শান্তি নাই, কি যেন চাহি, কি যেন পাইতে হইবে বলিয়া অন্তরের ভিতরে বিপুল পিপাসা জাগিয়াছে কিন্তু সঙ্গের অভাবে নিজের প্রয়োজনকে চিনিয়াও

চিনিতে পারিতেছে না। ইহাদের প্রতি তোমার কর্ত্তব্য কত গভীর, ইহা তুমি ভুলিয়া যাইতে পার না। নিজের প্রাণকে বিশ্বাসের বলে বলীয়ান্ করিয়া লইবার পরে এই সকল সাহায্য-যোগ্য নরনারীর সন্নিকটে যাইয়া তোমাকে দাঁড়াইতে হইবে। চিরকালের পাষণ্ডকে আমূল পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়া নব-জীবনের অমৃত-রসায়ন পান করাইতে সকলে পারে না। কিন্তু এই সকল অর্দ্ধ-অন্ধ অর্দ্ধ-চক্ষুষ্মানকে সঠিক পথে টানিয়া আনিতে তোমরা প্রত্যেকে পারিবে। শুধু চাই নিজের অন্তর-জোড়া যথার্থ ভক্তি এবং অকপট বিশ্বাস।

অন্তরের সাধ

"বিশ্বাসীর সুপবিত্র সুন্দর হৃদয়, কোনও ভয়কে জানে না, কোনও বিঘ্নকে মানে না। নিখিল জগতে যেদিকে আঁখি ফিরাইব, সেই দিকেই আমি বিশ্বাসীর এই নির্ভয় মুখচ্ছবি নেহারিতে চাহি। ইহা আমার অন্তরের এক অতি প্রবল গোপন সাধ। তোমরা কি সকলে মিলিয়া আপ্রাণ সাধন সাধিয়া, আমৃত্যু শ্রম করিয়া আমার এই ঐকান্তিক সাধটী পূরাইবে?"

সদা আত্ম-প্রস্তুতি ও সময়-নিষ্ঠা

অপর এক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তোমরা আমাকে তোমাদের অঞ্চলে আমন্ত্রণ করিয়াছ দেখিয়া আমি প্রীত হইয়াছি। তোমাদের এই আহ্বান আমার প্রতি তোমাদের প্রেমের পরিচায়ক এবং ইহা দ্বারা দেশবাসীর প্রতিও তোমাদের প্রেম সূচিত হইতেছে। কেন না, আমাকে তোমরা দেশের হিতের জন্যই চাহিতেছ, আমোদ আহ্লাদ করিয়া কাল কাটাইবার জন্য নহে। কিন্তু শ্রীহট্টের গুরুতর শ্রমে আমার শরীর এতই ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছে যে, আমি এখনই তোমাদিগকে কোনও সঠিক সিদ্ধান্ত জানাইতে সাহসী হইতেছি না যে, কবে এবং কি ভাবে তোমাদের ওখানে আসিয়া উপস্থিত হইব। যাওয়া সম্ভব হইলে স্বল্প সময়ের খবরে যাওয়া হইবে। সুতরাং তোমার কর্ত্তব্য হইবে, স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে এমন শৃঙ্খলার সহিত যাবতীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া রাখা যেন খবর পাওয়া মাত্র তুমি প্রত্যেকটী অনুষ্ঠানের সুবন্দোবস্ত অতি অল্প সময় মধ্যে করিয়া ফেলিতে পার। দিনের পর দিন আমার যেমন কাজ বাড়িয়া যাইতেছে, তেমন সঙ্গে সঙ্গে সময়ের মূল্যও বাড়িয়া যাইতেছে। কোথাও যাইয়া বৃথা একটী ঘণ্টাও না নষ্ট হয়, ইহা আমার এক বিশেষ উৎকণ্ঠা হইয়াছে। যুদ্ধ জগতে প্রতিদিন বা প্রতি বৎসর হয় না। তথাপি সেনা-বিভাগের উচ্চ নীচ প্রত্যেক কর্ম্মচারী যে কোনও অবস্থার জন্য প্রস্তুত থাকে। যে দেশের সেনাবাহিনী এই বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রস্তুত, জগতের

ইতিহাসে সেই দেশই সাধারণতঃ প্রধান গৌরব-সমূহ অর্জ্জন করিতেছে। তোমাদের ভিতরেও সেইরূপ সৈনিকোচিত প্রস্তুতির ভাব বিদ্যমান থাকা দরকার। তোমাদের সেবার জন্য যাহারা কায়-মনঃ-প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন, ইহা দ্বারা তাঁহাদের পক্ষে অল্প সময়ে এবং অল্প শ্রমে অধিক সেবা দিয়া যাইবার সুযোগ-সুবিধা বর্দ্ধিত হইবে। যাঁহার কাছ হইতে সেবা চাহ, তাঁহাকে সাধ্যপক্ষে বৃহত্তম সেবা দিবার সুযোগ করিয়া দেওয়াই তোমাদের সঙ্গত। তবে, একটা বিষয়ে সকলকেই আশ্বাস দিও যে, আমাকে কোনও টাকার থলি উপহার দিতে হইবে না কিম্বা পাথেয় নামেও কিছু দিবার চেষ্টা করিতে হইবে না। যাইব আসিব আমি আমার নিজ দায়িত্বে, কিন্তু যে স্বল্প সময়টুকু আমি তোমাদের মধ্যে থাকিব, সেইটুকুর যাহাতে প্রকৃষ্ট সদ্ব্যবহার হইয়া যাইতে পারে, আমি ততটুকুর পরিপূর্ণ সুবন্দোবস্ত চাই। ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় বক্তৃতারম্ভ করিব, ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় আসন-মুদ্রার ক্লাস বা প্রশ্নোত্তর-সভাগুলি করিব, লোকের বাড়ীতে বা প্রতিষ্ঠান-সমূহে যাইতে আমার আপত্তি নাই, কিন্তু পূর্ব্বাহ্নে যাঁহার সহিত যেরূপ ভাবে যে সময়ে এবং যতটুকু কালের জন্য নির্দ্ধারণ হইবে, কোনও অবস্থাতেই তাহার ব্যতিক্রম করা হইবে না,—এই সব ব্যবস্থা তোমাদেরই করিতে হইবে। স্থানীয় জনসাধারণ-সম্পর্কিত কর্ত্তব্যগুলি সারিয়া আমাকে

আহার-নিদ্রার ফাঁকে দৈনিক ত্রিশ হইতে পঞ্চাশখানা পত্রের জবাব দিতে হয়। এই কারণেই কঠোর সময়-নিষ্ঠা যদি কাহারও মনঃপীড়া উৎপাদনের হেতুও হয়, তবু তাহাই মানিয়া চলিতে হইবে। তোমাদের ওখানকার সজ্জনদের জিজ্ঞাসা কর, তাঁহারা প্রস্তুত আছেন কিনা।"

আমিষ ও নিরামিষ

জনৈক আশ্রমাধ্যক্ষ সাধু ব্যক্তির সহিত আলাপ-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সাধু, সন্ন্যাসী, যতি, ব্রতী, তপস্বী, ব্রহ্মচারী ও বিধবার পক্ষে এদেশে নিরামিষ আহারই গ্রহণীয়। আরবে বা ইউরোপে সাধক-মাত্রেই নিরামিষ আহার কত্তে বাধ্য নন। তবে জীবের প্রতি করুণা-বুদ্ধিতে বিগলিত-হৃদয় অনেক মহানুভব ব্যক্তি আহারে জীবহিংসা সাদরে সব দেশেই বর্জ্জন ক'রে থাকেন। আমার নিজের তুচ্ছ একটা শরীরের পোষণের জন্য আমি যদি জীবহিংসা না করি, তবে তা' নিশ্চয়ই প্রশংসার বিষয় হবে। কিন্তু শরীর-পোষণের প্রয়োজনে, নিতান্তই স্বাস্থ্যরক্ষার দাবীতে যদি কেউ নির্লোভ মনে পরিমিত ভাবে মাছ বা মাংস সেবন করেন, তবে তার বিরুদ্ধে সম্মার্জ্জনী-হস্তে রুদ্র রূপ ধারণ করার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখি না। কে কি খায় আর কে কি খায় না, তা' নিয়ে তাকে ঘৃণা বা বিদ্বেষের দৃষ্টিতে না দেখাই সঙ্গত। কোন্‌টা কার খাদ্য আর কোন্‌টা কার অখাদ্য, তা'

অনেক সময়েই পূর্ব্বপুরুষদের আচার দিয়েই নির্দ্ধারিত হয়। একজন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ মৎসকে অবাধে একটী নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য ব'লে মনে করেন কিন্তু এই সেদিন পর্য্যন্তও পেঁয়াজ কখনো তাঁর হেঁসেলে ঢুক্‌তে পেত না। অথচ অন্য কোনও প্রদেশে গেলে হয়ত দেখ্‌তে পাবে যে, উৎকট নিরামিষাশী সজ্জনটী অনায়াসে এবং গোগ্রাসে পলাণ্ডু ভক্ষণ কচ্ছেন। যার পূর্ব্বপুরুষেরা মৎস্যাশী বা মাংসাশী, তার পক্ষে নিরামিষ খাওয়া অনেক সময়েই কষ্টকর। বাঙ্গালীরা মাংস অতি অল্পই খায়, মাংসের প্রতি বিশেষ রুচি সাধারণ বাঙ্গালীর নেই, অথচ এমন দেশ আছে, এমন জাতি আছে, যেখানে এবং যাদের ভিতরে মাংসকেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ খাদ্য ব'লে গণনা করা হয়। কিন্তু তাদের মধ্যেও এমন উপদেশ শুনা যায় যে, জীবহিংসা যদি কত্তেই হয়, তবে সংখ্যায় যত কম জীবের প্রাণান্ত ঘটাতে পার, তারই চেষ্টা ক'রো। মাংসটীর প্রতি বাঙ্গালীর ভক্তি কম, যদিও বাঙ্গালীদের মধ্যে শাক্ত বা কালী-ভক্তের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। মা-কালীর ভক্ত হ'য়েও মাংসাস্বাদনের প্রতি যারা আসক্ত নয়, তারা কিন্তু মাছটার সত্যই পরম ভক্ত। এদের যদি জোর ক'রে মৎস্যসেবন বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়, তবে এরা একটা অত্যাচার হ'ল ব'লে মনে কর্ব্বে। অতএব, বাঙ্গালী ব'লে কাউকে অপছন্দ কত্তে হয় কর গে, কিন্তু মছলীখোর ব'লে ঘৃণা করার মধ্যে

কোনও যুক্তি নাই। সাধু ব্যক্তি লোভকে বর্জ্জন কর্ব্বেন, এইটী হচ্ছে সাধুত্বের একটী পরম সর্ত্ত। লোভ যিনি বর্জ্জন করেছেন, তিনি যদি মাছ মাংস প্রয়োজন-বোধে নিতান্ত সীমিত-পরিমাণে সেবন করেন, করুন গে। কিন্তু লোভ যিনি পরিত্যাগ ক'রেছেন, তিনি যদি সঙ্গে সঙ্গে লোভনীয় বস্তুটীকেও পরিত্যাগ ক'রে চলতে পারেন, তবে সোণায় সোহাগা।

আশ্রমীয় ছাত্র-নিবাসে মৎস্য-মাংস

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আশ্রমীয় সাধুরা যখন ছাত্র-নিবাস খোলেন, তখন তাঁদের কাছে এই প্রশ্নটী বড় বেয়াড়া ভাবে এসে হোঁচট খেয়ে পড়ে। বিদ্যার্থীরা নানা অঞ্চল থেকে, নানা রকমের পরিবেশ থেকে এখানে এসেছে,—এরা কি সবাই নিরামিষ খাবে, না, দু-একজন দু-এক হাতা মাছের ঝোল বা দু-এক টুকরা ঝোলের মাছ পাবে? প্রচুর দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, ছানার সুব্যবস্থা থাকলে প্রশ্নটী তেমন গুরুতর আকার ধারণ কত্তে পারে না। কারণ ঝোলের সাধ ক্ষীর দিয়ে মিটান যেতে পারে। কিন্তু কোথায় সেই বিদ্যার্থিভবন, যেখানে প্রচুর গব্য-সামগ্রীর সমারোহ আছে বা হবে? সপ্তাহান্তে, পক্ষান্তে বা মাসান্তে একদিন একটু অভ্যস্ত খাদ্য না মিললে

ছাত্রদের অসুবিধা হবে কিনা, এটা ছাত্রদের স্বাস্থ্য-পরীক্ষকেরা নিশ্চয়ই বলতে পার্ব্বেন। ডাক্তার বল্‌বেন,—প্রোটিন চাই, ডালের প্রোটিনে কুলুবে না, জান্তব প্রোটিন চাই। অর্থাৎ হয় মাছ, নয় মাংস খাওয়াও। মাংস একবার হেঁসেলে ঢুক্‌লে আর সহজে বেরুতে চাইবে কিনা, একটা সমস্যা। আর মাংস ঢুক্‌লে পেঁয়াজ-রসুনের প্রবেশাধিকার রুদ্ধ করা যাবে কিনা, এটাও বিবেচ্য। হাসপাতালের পথ্য ব'লে মাঝে মাঝে মৎস্য চালান সুবিধাজনক। কিন্তু শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক মহাশয়রা যদি মাছের মুড়াগুলি নিজেদের জন্য একচেটিয়া ক'রে রাখেন, তবে ছাত্র-বিক্ষোভ অবশ্যম্ভাবী। এর ফল অতীব জটিল এবং অনিশ্চিত। এই দিক্ দিয়ে দেখ্‌তে গেলে মাছ-মাংসকে আশ্রমীয় তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ছাত্র-নিবাস থেকে দূরে রাখার চেষ্টাই সর্ব্বোত্তম। অবশ্য একথা বলা যেতে পারে যে, নদীমাতৃক ও জলাভূমি-সমৃদ্ধ জেলাগুলিতে নিরামিষ আহার নিশ্চয়ই মৎস্যাহারের চেয়ে অধিকতর ব্যয়বহুল। নিরামিষ ও আমিষ আহারের স্বাস্থ্য-পোষকতার দিক দিয়ে পার্থক্যের বিচার ছেড়ে দিলেও কোন্ খাদ্য কোন্ দেশে সস্তা অথচ অধিকতর সহজলভ্য, একথাটী ভাবতেই হয়। কারণ, এসব বিদ্যার্থিনিবাসের ছাত্ররা প্রায় সকলেই নিতান্ত গরীবের ছেলে।

বিধবা ও নিরামিষ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এমন শাক্ত পরিবারও দেখেছি, যাঁদের বাড়ীতে প্রতি অমাবস্যায় কালীপূজা হয়, বারো মাসে বারোটী ছাগ-নন্দন মায়ের পূজায় বলি হয়। গৃহস্থ সপরিজনে সেদিন মাংস-প্রসাদ পান, প্রতিবেশীরাও বঞ্চিত হন না। মাংসের যে কয়টা টুকরা জন প্রতি মিলে, তার পাঁচগুণ মিলে বড় বড় নৈনিতাল আলুর টুকরা। অনেক-গুলি আলু খেয়েও ভোজনকারীরা মনে করেন,—প্রচুর মাংস খেলাম। এমন বাড়ীতেও দৈবক্রমে বিধবা রমণী দুই একজন থাকেন, যাঁরা কঠোর-নিয়ম-পালনকারিণী ও সদাচারে নিষ্ঠাবতী। বছরে বারো বার বারোটী পাঁঠার মাংস উদরস্থ ক'রেও কেউ ঐ নিভৃত-চারিণী বিধবাটীর প্রতি তুচ্ছতার দৃষ্টিতে তাকাতে পারেন না, যিনি মৎস্য স্পর্শ করেন না, মাংসের ঘরে প্রবেশও করেন না। সধবা অবস্থায় তিনিও মাংস খেতেন, পেলে প্রচুরই খেতেন কিন্তু বৈধব্য ঘটার সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিমেষে একটী নূতন মানুষে রূপান্তরিত হ'য়েছেন। তাঁর শুচিতা, স্নিগ্ধতা, পবিত্রতা একটী আলাদা রাজ্যের বার্ত্তা বয়ে নিয়ে আসছে, যার ফল দ্রষ্টা-মাত্রেরই উপরে সংযম, আহারের সংযম, দৃষ্টির সংযম, বাসনার সংযম। শুদ্ধ-চরিতা বিধবারা এভাবে সকলের অজ্ঞাতে শুদ্ধাচারের একটা বিশেষ মান বা Standard স্মরণাতীত যুগ থেকে প্রতিটি গ্রামে

প্রতিটি সমাজে রক্ষা ক'রে যাচ্ছেন, অবিমৃষ্যকারীরা যাকে লঙ্ঘন ক'রে এগিয়ে যেতে সাহস পাচ্ছে না। প্রমত্ত লম্পটের মাতৃ-পিতৃ-বিয়োগ ঘট্‌ল ত' ঐ বিধবার আচার-নিষ্ঠার অনুবর্ত্তন ক'রে তাকে শ্রাদ্ধান্তকাল পর্য্যন্ত থাক্‌তেই হবে। বিধবারা বড়ই অসহায় কিন্তু অনাথা, নিঃসহায়া বিধবা যে সদাচারকে তার জীবনের আচরণ দিয়ে ধ'রে রেখেছে, তাকে তেমন প্রত্যেক লোককে অনুসরণ কত্তে হচ্ছে, এদেশে যারা পিতৃমাতৃ-শ্রাদ্ধ কত্তে চায়, এদেশে যারা সাধু, সন্ত, যতি, ব্রতী, ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী ব'লে পরিচয় দিতে চায়। নিজেদের অজ্ঞাতসারে শব্দহীনা বিধবারা এভাবে সমগ্র সমাজের উম্মার্গগামিতাকে শাসন ক'রে সংযত করে চলেছে। বিধবার এই কর্ত্তৃত্ব বা এই দায়িত্ব, এই কৃতিত্ব বা এই মহিমা যতকাল অব্যাহত থাক্‌বে, ততকাল ভারতে নিরামিষ আহারের প্রতি শ্রেষ্ঠত্বাভিমানী ব্যক্তিমাত্রেরই পক্ষপাত অবশ্যম্ভাবী।

বিধবা-বিবাহ ও নিরামিষ

সাধু মহারাজ বলিলেন,—বিধবাদের আজকাল ত' বিবাহ হচ্ছে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বিধবার আজকাল বিবাহ হচ্ছে, একথা ঠিক কিন্তু তা' কোনও কোনও ক্ষেত্রে মাত্র হচ্ছে, সর্ব্বক্ষেত্রে হচ্ছে না। যে বিধবার পুনর্বিবাহ হ'ল,

তাকে আর বিধবা ব'লে জ্ঞান করার তো কোনও যুক্তি থাকে না। সে সধবা। সে নিশ্চয়ই সধবার আচার অনুষ্ঠান নিঃসঙ্কোচে পালন কর্ব্বে। তাতে বাধা দেবার ত' কেউ নেই। বাধা কেউ দিতে গেলে সে হাস্যাস্পদই হবে। অতীতের দাম্পত্য-জীবন এবং তার বিয়োগান্ত যবনিকার কথা বিস্মৃত হ'য়ে তাকে তার নূতন পতির প্রতি পূর্ণ বিশ্বস্ততা নিয়ে সংসারী কত্তে হবে, এটাই হবে তার পক্ষে ধর্ম্ম। ফলে, একজন শুদ্ধাচারিণী বিধবার কৃচ্ছ্র ও সংযমের সাধনা দ্রষ্টাদের মনে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে যে সাত্ত্বিক প্রভাব ও প্রেরণা বিস্তার কর্ত্ত, তার পক্ষে সেটার আর অবকাশ রইল না। লক্ষ লক্ষ বিধবারাও যদি পত্যন্তর গ্রহণ ক'রে পুনঃ সধবা হন, তবু একদল বিধবা জগতে থেকেই যাবেন, যাঁরা কোনও অবস্থায়ই আর সংসারে সধবা সাজতে চাইবেন না। তাঁরা নিজেদের আচার-আচরণের মধ্য দিয়ে সংযমকে দৃষ্টান্ত-রূপে ধ'রে রাখবেন এবং তাঁদের আহার-সংযম দেশে নিরামিষ আহারকে শ্রেষ্ঠত্বের সিংহাসনে স্থায়ী ভাবে প্রতিষ্ঠিত ক'রে রাখবে।

বিধবা-বিবাহ ও সধবা-বিবাহ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অবশ্য প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা-বিবাহ-আন্দোলনের জন্ম হ'য়েছিল করুণা থেকে। চিরকাল বৈধব্যানলে দগ্ধ ক'রে

ক'রে দুগ্ধপোষ্য বালিকাদিগকে জীবন্তে অঙ্গার ক'রে দেওয়ার সামাজিক কুরীতির তিনি উচ্ছেদ চেয়েছিলেন। তাঁর চেষ্টা বিফল হয় নি, তিনি অনেক বিধবার চোখের অশ্রু মুছে দিতে সমর্থ হয়েছেন। কিন্তু করুণার দাবীতে নয়, সমানাধিকারের দাবীতে এর পিছনে পিছনে সতর্ক পদসঞ্চারে আর একটী আন্দোলনের উৎপত্তি ঘটেছিল। তার নাম সধবা-বিবাহ-আন্দোলন। এই আন্দোলনকে সফল করার জন্য বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকারকে আগে আইনসঙ্গত ক'রে নিতে হবে এবং তারপরে দেখা যাবে যে, ঘর বেঁধে দীর্ঘকাল একত্র বাস করার পরেও দম্পতীরা পরস্পর থেকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হচ্ছেন। তারপরে যেই মৌমাছির যেই ফুল বা যেই ফুলের যেই মৌমাছি, তারা পরস্পর মিলিত হয়ে পুনরায় আর একটা মৌচাক পাতবার চেষ্টা কচ্ছেন। এর ফল ভাল হবে, না মন্দ হবে, তা' অনুমান ক'রে বলার প্রয়োজন নেই, তার দৃষ্টান্ত পাশ্চাত্য দেশে যথেষ্ট পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু এখানেও এঁদের সকল সুখের কাঁটা হচ্ছেন, সদাচারিণী বিধবা, যাঁরা প্রচার বা আন্দোলন কি ক'রে কত্তে হয়, জানেন না, কিন্তু যাঁরা সমগ্র জীবন জু'ড়ে কষ্ট ও দুঃখ সহ্য ক'রেও শুচিতার আদর্শে একনিষ্ঠ হয়ে লেগে আছেন। যতদিন ভারতের বৈধব্য-সম্পর্কিত সৎসংস্কারগুলিকে ধ্বংস করা না যাবে, ততদিন পাশ্চাত্যের কোনও প্লাবনই ভারতকে অভারতে

পরিণত কত্তে পার্ব্বে না। এই জন্যই আমি সাধু, সন্ত, যতি, ব্রতীদের জয়গান না গেয়ে ভারতীয় বিধবার দেবী-মূর্ত্তিটীরই অবিরাম জয়গান গাই।

সাধুত্বের লক্ষণ

সর্ব্বশেষে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সাধুত্ব একটী সদ্‌বস্তু এবং তার লক্ষণগুলিও সৎ। পরমেশ্বরে অকপটে বিশ্বাস করা, জগতের প্রাণি মাত্রকেই পরমেশ্বরের সন্তান ব'লে জ্ঞান করা, পরদুঃখে কাতর হ'য়ে যার দুঃখ যে ভাবে দূর করা যায়, সেই ভাবে দুঃখ বিদূরণের চেষ্টা করা, অজ্ঞানকে জ্ঞান দেওয়া, হতাশকে আশা দেওয়া, দুর্ব্বলকে বল দেওয়া, অক্ষমকে সহায়তা দেওয়া, সংশয়াচ্ছন্নকে সুনিশ্চিত বিবেক-বুদ্ধি প্রদান করা, অসৎকে সৎপথে পরিচালিত করা এবং কারো জন্য এসব কর্ম্লে, তার মধ্যে নিজের কোনও লৌকিক স্বার্থের সংশ্রব না রাখা,—এগুলিই হচ্ছে সাধুত্বের লক্ষণ। আমরা সবাই যাতে প্রকৃত সাধু হ'তে পারি, তার জন্য পরমেশ্বরের চরণে আমাদের প্রার্থনা। সাধুর বেশ ধারণ ক'রে, সাধুর নাম ধারণ ক'রে, অসাধুর জীবন যাপন করার মতন দুঃখদ ব্যাপার জগতে আর কিছুই নাই। শ্রীভগবান্ আমাদের প্রত্যেককে প্রকৃত সাধু করুন, শুধু ধ্বজাধারী প্রবঞ্চক ক'রে যেন না রাখেন।

শ্রীহট্ট

১৮ই মাঘ, শুক্রবার, ১৩৪১

(১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৫)

শ্রীশ্রীবাবামণির শ্রীহট্টের বক্তৃতাবলি সমগ্র দেশের ভিতরে যেন তীক্ষ্ণ শায়কের ন্যায় প্রবেশ করিয়াছে। বক্তৃতার উচ্চ উৎকর্ষ ইহার জন্য যেমন দায়ী, শ্রীহট্টবাসীর স্বাভাবিক সদ্‌গুণও ইহার জন্য তেমন দায়ী। মৌলবীবাজার, করিমগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, প্রভৃতি মহকুমা হইতে পর্য্যন্ত শ্রোতারা শ্রীহট্ট সহরে আসিয়াছেন মহাপুরুষের উদাত্ত কণ্ঠের অভয়-বাণী শুনিতে এবং ঐ সকল স্থানে যাইবার জন্য উপর্য্যুপরি আমন্ত্রণ আসিতেছে।

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হইল দর্শনার্থী ব্যক্তিদের অকপট আত্ম-নিবেদন। ইচ্ছা করিলে শ্রীশ্রীবাবামণির সহিত যে-কেহ নিভৃতে দেখা করিতে পারেন, শ্রীযুক্ত দুর্গেশ্বর শর্ম্মা সেই ব্যবস্থা রাখিয়াছিলেন।

সূর্য্যোদয় হইতেই অদ্য দর্শনার্থীদের বেজায় ভিড়, অথচ অদ্য রবিবার নহে। শ্রীশ্রীবাবামণি প্রাতর্ভ্রমণ হইতে ফিরিয়া আসিয়াই দর্শনার্থীদের একজনের পর একজনকে লইয়া ব্যস্ত হইলেন।

চলাই তোমার সাধনা

একজন প্রশ্ন করিল,—জীবনে কত আশার বাসাই

বাঁধলাম, একটা আশাও পূর্ণ হ'ল না। এভাবে ব্যর্থতায়ই কি আমার জীবন যাবে?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তুমি যখন জন্মেছিলে, তখন কি তোমার ইচ্ছায় গরীবের ঘরে জন্ম নিয়েছিলে? তোমার পিতা যে তোমার শিক্ষা ও জীবনগঠনের জন্য প্রচুর অর্থব্যয় কত্তে পারেন নি, সেটা কি তোমার নিজের কোনও দোষ? কর্ম্মক্ষেত্রে নেমে তুমি যে নিজের জীবন-পথ নিজে চিনে নিতে পারো নি, তা কি তোমার ইচ্ছাকৃত কোনও ত্রুটীতে? কতলোকের কাছে পরিস্থিতি খুবই অনুকূল হ'য়ে ধরা দেয়, তোমার পক্ষে তা' ঘটে নি, প্রতি পদে তোমাকে বিপুল জঞ্জালের স্তূপ সাফ ক'রে ক্রমশঃ পথের দিকে এগুতে হয়েছে, এজন্য কি তুমি দায়ী?

প্রশ্নকর্ত্তা।—না।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—তথাপি তুমি কেবলি এগুবার চেষ্টা করেছ, তিল তিল ক'রে এগিয়েছ এবং বহু বৎসরের পরিশ্রমের ফলে যখন দীর্ঘ পথ অতিক্রম ক'রে এসেছ ব'লে আত্মপ্রসাদ অর্জ্জন করেছ, তখন দেখতে পাচ্ছ যে, তোমার পিছনে-ফেলা সরু সরু সেতুগুলি একটার পর একটা ক'রে জলশায়ী হয়ে পড়ছে, তোমার পিছে পিছে যারা আসবে ব'লে তোমার মনে ছিল ভরসা, তারা এক এক জনে এক একটা সেতু পর্য্যন্ত পৌঁছে তার ভগ্ন বা জীর্ণ দশা দেখে

তোমার পশ্চাদনুসরণ পরিহার করেছে এবং কাছাকাছি জায়গায় যেখানে অন্য দিকে যাওয়ার কোনও পথের দাগ দেখেছে, সেই দিকে পদসঞ্চালন কচ্ছে। ফলে তুমি অনুভব ক'রে ব্যথিত হচ্ছ যে, জগতে তুমি একা।

প্রশ্নকর্ত্তা।—হাঁ।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—কিন্তু আসল সত্যটা এই যে, চারিদিকে জনতার ভিড় যত বেশীই দেখতে পাও, চলবার কালে তুমি একান্তই একা। আর, তুমি যে চল্‌ছ, এটা তোমার নিজের ইচ্ছায় নয়, পরমেশ্বরের নিয়ন্ত্রণে। সুতরাং নিজের একাকিত্বের অবশ্যম্ভাবিতা স্মরণে রেখে পথ চল আর এ চলা তোমার জন্য নয়, আমার জন্য নয়, পরমেশ্বরের অভিপ্রায়-পূরণের জন্য, এই তত্ত্বটী উপলব্ধিতে আনবার চেষ্টা কর। তখন দেখবে, আশারও প্রয়োজন নেই, হতাশারও অবকাশ নেই, সার্থকতা আর ব্যর্থতার দ্বন্দ্ব-কোলাহলও নেই। জন্মেছ যাঁর ইচ্ছায়, মরতে হবেও তাঁরই ইচ্ছায়, নিজের ইচ্ছায় তোমার আদিও নয়, অন্তও নয়, অবিরাম চলতে হবে শুধু এই বিষয়ে সজাগ থেকে যে, তুমি যেন নিজের ইচ্ছায় এমন কিছু না কর, যার ফল অনুশোচনা, যার ফল পরপীড়ন, যার ফল বহু মানবের, বহু জীবের ক্লেশ ও দুঃখ। অবিরাম চলাই তোমার সাধন, ব'সে থাকা নয়। চন্দ্র চল্‌ছে, পৃথিবী চলছে, কোটি কোটি গ্রহ-নক্ষত্র সবাই চল্‌ছে।

আপন চেনাই জীবনের সার্থকতা

প্রশ্নকর্ত্তা।—হাত চলে না, পা চলে না, মন চলে না, সব হতাশায় ভারী হ'য়ে আছে। আর চল্‌বই বা কোথায়? গলা ধাক্কা খেয়ে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাওয়ার নাম ত' আর চলা নয়।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—গ্রহ-নক্ষত্র সবাই চলছে নিজ নিজ কক্ষপথে। তাদের কক্ষই তাদের টেনে নেয়। গ্রহগুলির তোমারই মত সদসদ্‌বিচারের শক্তি আছে ব'লে এখনো জানা যায় নি। কিন্তু তোমার সদসদ্‌বিচারশক্তি আছে। এই জন্যেই তোমাকে নিয়ত বিচারের আশ্রয় নিতে হবে যে, কোন্‌টী তোমার পথ, কোন্‌টী তোমার পথ নয়। বিচার-বিবেচনা, চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান, অনুধ্যান কত্তে কত্তে সহসা তোমার ভিতরে সহজাত এক প্রজ্ঞার আবির্ভাব ঘটবে, সে তোমাকে স্পষ্ট ক'রে বলে দেবে, কোনটী তোমার কক্ষপথ, অর্থাৎ কে তোমার আপন। চলতে হবে আপন পথে, পরের পথে নয়। পৃথিবী চন্দ্রের কক্ষপথে ঘোরে না, চন্দ্রও পৃথিবীর কক্ষপথে আসে না, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি প্রভৃতি সবাই নিজ নিজ কক্ষপথেই চলে। কেবল চেষ্টা ক'রে আপন চিনে নাও। আপন চিনলেই জীবন থেকে হতাশা দূর হ'য়ে যাবে, প্রাণ মন প্রেমে ভ'রে যাবে, অচল হস্তপদাদি সচল হবে।

প্রতিটি বস্তুতে লক্ষ্য দাও আর বিচার কর যে, এটী তোমার আপন কি না। যতক্ষণ আপন খুঁজে না পাও, ততক্ষণ ধৈর্য্য ধ'রে কেবল খুঁজতেই হবে। খুঁজতে খুঁজতে পাবে। এক জন্মে যা' হল না, তা' দশ, বিশ, পঁচিশ, পঞ্চাশ, একশত জন্মে হ'লেও হবেই। হবে, এটা সুনিশ্চিত জেনে কেবল খোঁজ।

ধর্ম্ম ও আপনত্ব

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আপন খুঁজে বের করবার উৎকট ও একাগ্র তপস্যার নাম ধর্ম্মাচরণ বা ধর্ম্মসাধনা। আর আপন একবার খুঁজে পেলে দেখ্‌বে বিশ্বের সবাই তোমার আপন। কোটি ব্রহ্মাণ্ডের কেউ বা কিছুই তোমার পর নয়। আপন জন, আপন জিনিষ বা আপন স্বরূপ যে একবার চিনে, অনন্ত কোটি কল্পকালের সকল সৃষ্টি ও বিলয় তার আপন হ'য়ে যায়, পর ব'লে কোনো বস্তু বা অনুভব তার আর থাকে না। এই জায়গাটীতে তুমি পৌছুবে, এ জন্যই তুমি তুমি জন্মেছ, আমি জন্মেছি, তুমি চলবে, আমিও চল্‌ব, তুমি মরবে, আমিও মর্‌ব।

মধ্যবয়সী জনৈক ভদ্রলোক একটী গোপনীয় বিষয় নিবেদন করিতে আসিয়াছেন। পূর্ব্বেই তিনি পত্র দ্বারা সাক্ষাৎকারের সময় নির্দ্ধারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি আদেশ

করিলে গৃহ জনহীন হইল এবং তিনি তাঁহার মানসিক অশান্তি-সমূহের বিস্তারিত বিবরণ দিলেন।

সন্দেহের সন্তাপ

সমস্ত শুনিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সহচর বা সহচরীদের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা যদি দূর হয়ে যায়, তবে জীবন বিষময় হয়। সন্ন্যাসীদের সঙ্ঘমধ্যে বাস ক'রেও যদি একজন অপর সতীর্থদের সন্দেহ-ভাজন হয়, তবে তার জীবন বিষময় হয়ে যায়। অপরের স্নেহদৃষ্টি তার উপরে ধাবিত হ'লেও সে মনে মনে ভাবে এই বুঝি কি সন্দেহটাই তাকে করা হচ্ছে। আবার, সন্দেহকারীরাও নিজেদের দৃষ্টিকে অনাবশ্যক ভাবে নিয়ত ঐ একটী লোকের উপরে উদ্যত রাখ্‌তে রাখ্‌তে শেষে এমন ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে যায় যে, সেই একটী ব্যক্তির একখানা নববস্ত্র লাভ হ'লেও ভাবে যে, কোনও গুপ্ত প্রণয় এর ভিতরে আছে, বিদেশ থেকে কোনও বন্ধু একখানা পত্র লিখ্‌লেও ভাবে যে, এই পত্রের প্রত্যেকটী অক্ষরের পিছনে কি যেন একটা গুপ্ত ভাষা রয়েছে। এই সন্দেহ-বায়ু থেকে একজনের চিঠি অন্যের নিয়ে গোপনে পড়া, একজনের বালিশ-কম্বল অন্যের দ্বারা গোপনে তল্লাসী করা, এসব অন্যায় কাজের সূচনা হয়। সন্দিগ্ধ ব্যক্তিও জীবনকে দুর্ব্বহ ব'লে ভাব্‌তে থাকে আর সন্দেহ-কারীদের চরিত্রের পতন ত' অনেক সময়ে রোধই করা যায় না।

সন্দিগ্ধতার দুর্গতি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নামটী বদ্‌লে একটী সত্য ঘটনা বল্‌ছি। তা' থেকে ব্যাপারটা বুঝ্‌বে। কিছুকাল আগে গুপ্ত বিপ্লবান্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বীরেন রায় নামে একটী ভদ্রলোক পুলিশের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য কিছুকাল লুকিয়ে ছিলেন। সেই সহরেরই কোনও এক সাধুদের মঠের একজন তরুণ সন্ন্যাসীকে তিনি ঘটনাটা সব বল্লেন। বীরেন রায় বিবাহিত ছিলেন এবং তার একটী কুমারী কন্যাও ছিল। কন্যাটী পিতার জন্য আহারীয় প্রস্তুত ক'রে রাখ্‌ত, আর এই তরুণ সন্ন্যাসী সত্যানন্দ অপরাহ্নে ভ্রমণের ছলে সেই গৃহে গিয়ে ভদ্রলোকের খাবার জিনিষগুলি লুকিয়ে লুকিয়ে নিয়ে এসে ভদ্রলোকের প্রচ্ছন্ন নিবাসে পৌছে দিতেন। দু'চার দিন এভাবে চলার পর মঠের অন্য সাধুদের সন্দেহ এল। গোপনে অনুসরণ ক'রে ক'রে তারা দেখ্‌তে পেল যে, তরুণ সন্ন্যাসীটী রোজই সন্ধ্যার ঘনান্ধকারে একটী তরুণীর কাছে যায় এবং সেখানে কতক্ষণ সে থাকে, কোন্ পথে সে বেরিয়ে আসে, কিছুই ধরা যায় না। সবাই মিলে তুমুল আন্দোলন সুরু ক'রে দিল যে, সত্যানন্দ মঠের সদাচার নষ্ট কচ্ছে, নারীঘটিত প্রণয়ের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ে নিজেরও সর্ব্বনাশ কচ্ছে, মঠেরও সুনাম নষ্ট করার আয়োজন কচ্ছে। ভাল সন্ন্যাসীরা তাকে ডেকে সাবধান ক'রে দিলেন যে, সন্ধ্যার পরে বেশীক্ষণ

ধ'রে মঠের বাইরে থাকা চল্‌বে না। সত্যানন্দ করে কি। সে শেষ রাত্রে উঠে প্রচ্ছন্ন-নিবাসী বীরেন্দ্র রায়ের আহারীয় পৌঁছে দিতে লাগ্‌ল। অন্য সন্ন্যাসীদের মধ্যে হেমানন্দ সকলের চাইতে উগ্র, ক্ষমাহীন ও চপল। সে সেই শেষ রাত্রিতেও সত্যানন্দকে অনুসরণ কত্তে লাগ্‌ল। একদিন হেমানন্দ আত্মগোপনকারী ভদ্রলোকের কন্যা কণিকাকে সত্যানন্দের সঙ্গে গোপনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বল্‌তে দেখ্‌ল। শেষ রাত্রির প্রায়ান্ধকারে স্তিমিত প্রদীপের আলোতে কণিকার মুখখানা যেন স্বর্গের অপ্সরীদের মত সুন্দর দেখাতে লাগ্‌ল। বাস্, এতদিনের শক্ত ক'রে কৌপীন-আঁটা একটী নিমেষে তার ব্যর্থ হ'য়ে গেল। সত্যানন্দের নামে কুৎসা রটনার বুদ্ধি সে ছেড়ে দিল। কেবল কণিকার মুখখানা আর একবার দেখ্‌বার জন্য সে বিহ্বল হ'য়ে সত্যানন্দের পিছনে পিছনে যেতে লাগ্‌ল। রোজই যায়, রোজই দেখে, রোজই অন্তরের উদ্দাম কামনা কেবল উদ্বেল হ'তে উদ্বেলতর হতে থাকে। মনে মনে ভরসা, কেউ রাস্তা-ঘাটে দেখে ফেল্লে তখন বলা যাবে যে, প্রাতর্ভ্রমণ কচ্ছে। তাতে তার বিশ্বাস না হ'লে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে শেষ পর্য্যন্ত এও ত' বলা যাবে যে, সত্যানন্দকে অনুসরণ কচ্ছে, বেটা জুচ্চোর এসে সাধু সেজে মঠে ঢুকেছে। কিন্তু বীরেন রায়কে দীর্ঘকাল আর প্রচ্ছন্ন-নিবাসে থাক্‌তে হ'ল না। কি ভাবে যেন তাঁর পুলিশি ফাঁড়া কেটে গেল। বীরেন রায় নিজ গৃহে ফিরে এলেন। আর ত'

তাঁর জন্য আহারীয় নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না। সত্যানন্দ আর শেষ রাত্রে সেই গৃহে যায় না। কিন্তু রূপ-পিপাসা হেমানন্দের হৃদয়ে ক্ষুদ্র কীটের মতন প্রবেশ ক'রে এখন ত' একেবারে বাঘের মত ছোবল মেরে মেরে হৃৎপিণ্ড চিবিয়ে খাচ্ছে। কণিকাকে না দেখ্‌লে তার প্রাণ বাঁচে না। কণিকার কাছে তার যেতেই হবে। সে দুঃসাহস ক'রে কণিকার ঘরে গিয়ে প্রবেশ কর্ল্ল। বাতি জ্বালিয়ে সে শায়িতা কণিকার মুখ দেখ্‌তে লাগ্‌ল। দূর থেকে উঁকি মেরে যে মুখখানাকে তার মনে হয়েছিল স্বর্গের অপ্সরীর কমলানন, এখন তা' দেখে তার মনে ঘৃণার উদ্রেক হ'ল। মনে মনে সে আশ্চর্য্যান্বিত হ'ল যে, এই রূপেরই আকর্ষণে সত্যানন্দ মাসের পর মাস অভিসার ক'রে এসেছে। মনে মনে সে আরও আশ্চর্য্য হ'ল যে, দূর থেকে চুপি চুপি দেখ্‌বার সময়ে যে মুখখানা মনে হয়েছিল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুষমায় মণ্ডিত, তাই কিনা সামনে আস্‌তেই একটা বমনোৎপাদক কদর্য্য-মূর্ত্তিতে পরিণত হয়েছে। অন্তরের ঘৃণায় এবং বিরক্তিতে হেমানন্দ যখন কণিকার কক্ষ ত্যাগ কর্‌বার আয়োজন কচ্ছে, এমন সময়ে বীরেন রায় ঘুম থেকে জেগে উঠে হেমানন্দকে ধরে ফেল্লেন। বল্লেন,—'এই সময়ে এখানে তুমি কেন সন্ন্যাসী?' হেমানন্দ বল্ল,—'কোনো মন্দ উদ্দেশ্যে আসিনি, আমাকে ছেড়ে দিন্।' বীরেন রায় বল্লেন,—'তোমাকে ছেড়ে দেব সব জেনে শুনে। আগে তোমার পরিচয় দাও।' হেমানন্দ নিজের কোনও পরিচয়ই

গোপন করা লাভজনক মনে কর্ল্ল না। কোন্ বংশে জন্মে কোন্ মঠে এসে সাধু হয়েছে, এম, এ, পাশ ক'রে ভাল চাক্‌রী পেয়েও তা' না ক'রে মা-বাপকে কাঁদিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে এসেছে,—সবাই হেমানন্দ অকপটে প্রকাশ কর্ল্ল। বীরেন রায় বল্লেন,—'কিছু মনে ক'রো না সন্ন্যাসী, তোমাকে আমি এখন এই ঘরেই বেঁধে রাখ্‌ব। তোমার মঠে গিয়ে সব খবর আগে জেনে আসি, তারপরে হয় ছেড়ে দেব, নয় পুলিশে দেব।' হেমানন্দ আর্ত্তনাদ ক'রে উঠ্‌ল। কিন্তু কে কার কথা শোনে? বীরেন রায় হেমানন্দকে আচ্ছা ক'রে পিঠমোড়া বেঁধে রেখে চলে গেলেন। কণিকা জিজ্ঞাসা কর্ল্ল,—'আপনি একজন সংসার-ত্যাগী সাধু হ'য়ে নিদ্রিতা রমণীর কক্ষে প্রবেশ কর্ল্লেন কেন বলুন ত'! লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে। বাবা যদি মনে করেন যে, আপনার সঙ্গে আমার আগে থেকেই ভাব ছিল, তবে ত' আর এই জীবনেও আমাকে বিশ্বাস কর্ব্বেন না। কেন আপনি আমার এমন সর্ব্বনাশটা কর্ল্লেন, বলুন ত'? হেমানন্দ বল্ল,—'দেখ, সম্যক্ খুলে বল্‌ছি। সত্যানন্দ তোমার কাছে প্রত্যহ আসত দেখে আমি তাকে সন্দেহ ক'রে ক'রে তার পিছন ধরি।' কণিকা বল্ল,—'কি সন্দেহ?' হেমানন্দ কুণ্ঠিত কণ্ঠে বল্ল,—'কোনো রমণীর সাথে তার প্রেম আছে।' দৃপ্ত কণ্ঠে কণিকা বল্ল,—'ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ, সত্যানন্দজী যে আমার মায়ের সহোদর ভাই, আমার মামা। তাঁকে নিয়ে এমন অন্যায় কথা ভাব্‌তে

আপনার মতন একজন সাধুর লজ্জা হ'ল না?' হেমানন্দ বল্ল,—'খুবই অন্যায় হ'য়ে গেছে ব্যাপারটা। তোমার পায়ে পড়ে বল্‌ছি, আমাকে তুমি ছেড়ে দাও, আর আমি জীবনে আমার কোনও সতীর্থকে এমন ক'রে অন্যায় সন্দেহ কর্ব্ব না। অন্যকে সন্দেহ কত্তে কত্তে যে সন্দিগ্ধ অন্যায়টা আমার ভিতরেই এসে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে যাবে, এমন কল্পনাও কখনো কত্তে পারি নি। আমায় ছেড়ে দাও।' কণিকা বল্ল,—'বাবা সামনে থাক্‌তে থাক্‌তে যদি এসব কথা আপনি খুলে বল্‌তেন, তবে ছেড়ে দেবার জন্যই আমি সুপারিশ কত্তাম। কিন্তু এখন তাঁর অগোচরে আপনাকে ছেড়ে দিতে গেলে বাবা আমার উপরে এই সন্দেহ কর্ব্বেন যে, কদিন তিনি পুলিশের ভয়ে প্রচ্ছন্ন হ'য়ে ছিলেন আর তাঁর দেওয়া শিক্ষা-দীক্ষা সব ব্যর্থ ক'রে দিয়ে তাঁর চরিত্রবতী আদর্শবাদিনী কন্যা একটা সন্ন্যাসীকে এনে প্রেমিক জুটিয়েছে। আমি আমার বাবার কাছে অত ছোট র'য়ে যেতে পার্ব্ব না। আমাকে ক্ষমা করুন। আপনার বাঁধন যখন খুলতে হয়, বাবাই খুল্‌বেন।' এদিকে সত্যানন্দকে আর মঠের মোহন্তকে নিয়ে বীরেন রায় হাজির। সত্যানন্দ হেমানন্দকে বল্‌ল,—'ছিঃ ভাই, তোমার এমন কাজ?' মোহন্ত মহারাজ বল্লেন,—'এখনি গেরুয়া ছাড়। শাদা কাপড় পর। আজই তোমার কণিকাকে বিয়ে কত্তে হবে। রাজি থাকো ত' উত্তম, নইলে তোমাকে পুলিশে দেওয়াই সাব্যস্ত হয়েছে। কোর্টে আমি নিজে তোমার বিরুদ্ধে

সাক্ষ্য দিয়ে তোমাকে জেল খাটিয়ে ছাড়ব।' হেমানন্দ জেল ও কলঙ্কের চাইতে বিয়ে করাটাই পছন্দ কর্‌ল, কিন্তু এই আফশোষ সে এখনো করে যে, একটা কদাকৃতি মেয়েকে তার চির-জীবনের সঙ্গিনী কত্তে হয়েছে।

ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন,—তারা সুখে আছে?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—হয়ত আছে, হয়ত নাই। এমন ঘটনার নায়কদের গল্প শুনেই দূরে সরে আসা উচিত। তারপরে আর কি কি হ'ল জানবার কৌতূহলে লাভ কি ? তবে, আমাকে একটা সত্য ঘটনাকে একটু বিকৃত ক'রে বল্‌তে হয়েছে, নইলে দোষ হয়।

সন্দেহ-বায়ুর লক্ষণ

ভদ্রলোক বলিলেন,—কিন্তু আমার ব্যাপার ত' কোনও সন্দেহের ব্যাপার নয় বাবামণি। আমি যে নিজ চোখে দেখেছি, আমার স্ত্রী ব্যাভিচারিণী।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মানুষের দৃষ্টিতে অনেক বিভ্রম থাকে। বদ্ধমূল সন্দেহ নিয়ে রাত্রি জাগ্‌ছ, তোমার স্ত্রী তোমার শয্যাপার্শ্বে শুয়ে আছে, তবু তোমার পক্ষে এমন দৃশ্য হঠাৎ দেখে ফেলা বিচিত্র নয় যে, তোমার স্ত্রী দিব্যি সাজগোজ ক'রে দুয়ার খুলে বাইরে চলে গেল। ছুটে তুমি পিছনে পিছনে গেলে। দেখ্‌লে দুয়ার ত' বন্ধই আছে। অন্তরের সন্দেহ এত প্রবল যে, তবু মনে হ'ল না, তুমি ভুল দেখেছ।

নিজেই দরজা খুলে বাইরে গেলে, গিয়ে দেখ্‌লে তোমার স্ত্রী আর একজন কার সাথে দূরে এক বৃক্ষতলে কথা বল্‌ছে। সেই বৃক্ষতল অবধি ধাওয়া কল্লে। দেখ্‌লে সেখানে কিছুই নেই। ফিরে এলে ঘরে। দেখ্‌লে তোমার স্ত্রী তোমারই শয্যায় শায়িতা, দেখ্‌লে তোমার স্ত্রী নিদ্রার ঘোরে দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেল্‌ছে। দেখ্‌লে তার পা, কিন্তু ধূলা-বালি বা শিশিরের চিহ্নও নেই। দেখ্‌লে তার কাপড়, জামা, মুখ,—কিন্তু সন্দেহ কর্ব্বার কিছুই নেই। তবু তোমার সন্দেহ গেল না যে সে ভ্রষ্টা, সে ব্যভিচারিণী, সে বিশ্বাস-হন্ত্রী। সন্দেহ-বায়ু নামে যে একটা রোগ আছে, এ রোগের এটাই লক্ষণ।

ভদ্রলোক বলিলেন,—যতক্ষণ বাড়ীতে থাকি, একটী নিমেষের জন্যও স্ত্রীকে চোখের আড়াল হ'তে দেই না। অফিসে যাবার সময়ে বাড়ীর গেইটে তালা বন্ধ ক'রে চাবী সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাই। সত্যই সন্দেহ-বায়ু আমার প্রবল। কিন্তু অফিস থেকে ফিরে এসে দেখি, স্ত্রীর কপালে সিন্দুর যেন কতকটা লেপ্‌টে গেছে, পরণের কাপড়-চোপড় যেন কুঁকড়ে গেছে, মাথার চুল যেন এলোমেলো হ'য়ে গেছে। তখনই সন্দেহ আরে বেড়ে যায়। মনে হয়, দেওয়াল টপকে এই বাড়ীতে আর কেউ এসেছিল। তখন স্ত্রীকে ধ'রে বেশ কতক্ষণ প্রহার না করা পর্য্যন্ত আর মনের শান্তি হয় না। সে অনেকক্ষণ কান্নাকাটি কর্ল্লে পরে তখন তার প্রতি কেমন

একটা মায়া-মায়া ভাব হয়। তখন বলি, দেখ, তোমাকে ভালবাসি ব'লেই ত' অত মারি। তুমি রাগ্ ক'রো না।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এই সন্দেহের কোনও ভিত্তির প্রয়োজন হয় না। এটা শূন্যের উপরেই গৃহ-নির্ম্মাণ করে। কিন্তু সন্দেহ-বায়ুর মূল হচ্ছে যে, স্ত্রীর উপরে সুগভীর ভালবাসা, এটা ধ্রুব সত্য। তোমার সন্দেহ-বায়ু কমাতে হ'লে স্ত্রীর উপরে তোমার ভালবাসাও কমাতে হবে।

স্ত্রীর প্রতি সন্দিগ্ধতা কমাইবার উপায়

ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন,—কিন্তু তার উপায়?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—উপায় অতি সহজ। তুমি হিন্দুর ছেলে, পূর্ব্বজন্ম পরজন্ম ত' বিশ্বাস কর। আজ যে তোমার স্ত্রী হ'য়ে তোমার ঘরে বাস কচ্ছে, গত জন্মে সে তোমারই স্ত্রী ছিল, এমন কখনো সর্ব্বক্ষেত্রে হ'তে পারে না। পতি ও পত্নীর গভীর একনিষ্ঠ প্রণয়ের মধ্য দিয়েই যেখানে দেহাবসান এবং উভয়েরই জীবনের পুণ্যের মান যেখানে সমান, মাত্র সেখানেই একই দম্পতী বারংবার স্বামী-স্ত্রী হ'য়ে জন্ম নিতে পারে। অন্যত্র তা' সম্ভব নয়। তোমার সঙ্গে তোমার স্ত্রীর বর্ত্তমান জীবনে যেরূপ আদা-কাঁচকলা-সম্পর্ক দেখা যাচ্ছে, তাতে কোনও গণ্ডমূর্খও এই কল্পনা কত্তে সাহসী হবে না যে,

তোমরা দুজনে পূর্ব্ব জন্মেও স্বামি-স্ত্রী ছিলে। যা অনুমানে বেশ বুঝা যাচ্ছে, তাকেই পূর্ণ সত্যরূপে বিশ্বাস কর। বিশ্বাস কর, এই স্ত্রী পূর্ব্বজন্মে তোমার স্ত্রী ছিল না। তখন সে একজন মেথরের স্ত্রী ছিল। সেই মেথর স্বামীকেই সে প্রাণপণে সেবা যত্ন কত্ত এবং সেই পুণ্যে সে এবার ব্রাহ্মণের কন্যা হ'য়ে জন্মেছে। কিন্তু সেই মেথরের আরও দু তিনটী ভার্য্যা ছিল, তাদের সে হিংসা কত্ত। আর, সেই পাপেই এসে তোমার স্ত্রী হ'য়ে নিয়ত তোমার লাথি-ঝাটা খাচ্ছে। এই ভাবে তার অতীত সম্পর্কে চিন্তা কর। যখন সে মেথরের পত্নী ছিল, তখন সে শত প্রলোভনেও শ্রেষ্ঠতর, উচ্চতর, সুন্দরতর, পরিচ্ছন্নতর অন্য পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হয় নাই। কারণ, যার যেমন পতিই লাভ হউক, সে তার প্রতিই সেবাপরায়ণ ও একনিষ্ঠ থাক্‌বে, এইটীই ভারতবর্ষের চিরন্তনী শিক্ষা। এই ভাবে তাকে তোমার পূর্ব্বজন্মের পরস্ত্রী ব'লে জ্ঞান কর এবং অতীতে সে তার পূর্ব্বজন্মের পতির সঙ্গে একনিষ্ঠ ভালবাসায় বাস করেছে, এইরূপ চিন্তা কর্‌বে।

ভদ্রলোক বলিলেন,—করা শক্ত।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—শক্ত হ'লেও কত্তে হবে। তারপরে ভাবতে থাক্‌বে, তার প্রাক্তন দ্বিতীয় জন্মে সে ছিল এক বারবিলাসিনী। যে তার কাছে যেত, তারই সে পরিপূর্ণ সেবা কর্ত্ত। কিন্তু যেদিন সে যার অর্থ নিত, সেদিন সে

তাকে ছাড়া অন্য পুরুষের মনোরঞ্জন কর্ত্ত না। সময়-নির্দ্দেশে সে কোনও পুরুষের কাছ থেকে টাকাকড়ি নিলে, সেই সপ্তাহ, সেই মাস বা সেই বৎসর পার হ'য়ে যাওয়ার আগে শত অভাবে পড়্লেও সে অন্য পুরুষের অনুবর্ত্তিনী হ'ত না। তার চরিত্রের এই সততার জন্যই সে তার পরবর্ত্তী জন্মে আর গণিকা হ'য়ে আসে নাই, হ'ল মেথরের পত্নী। যখনি নিজের পত্নীর প্রতি প্রবল সন্দেহবশতঃ তাকে প্রহার কর্ব্বার জন্য তোমার শরীরের শিরা-উপশিরা ক্ষেপে উঠ্বে, তখনই ভাব্বে যে, কার উপরে ক্ষেপেছ? সে আগের জন্মে, তার মেথর-স্বামীকে দিয়েছে সেবা। তারও আগের জন্মে দিয়েছে শত শত নাগরিককে সেবা। যখন যেমন দেহ নিয়ে জন্ম হয়েছে, একই নারী তখন তেমন ভাবে সতী ও অসতীর জীবন-যাপন করেছে। তবে আর স্ত্রীর-প্রতি তোমার সন্দেহ ক'রে লাভ কি? সে তার কর্ম্মের ফল আগামী জন্মে ভুগ্বে। তুমি সন্দেহ কচ্ছ না, তবু সে পাপ কাজ কল্লে নিম্নগতি পাবে। তুমি সন্দেহ কচ্ছ, তবু সে পাপ কাজ না কর্ল্লে উচ্চগতিই পাবে। তার ভাবী গতি ত' তার কর্ম্ম দ্বারা নির্দ্ধারিত হবে। তার কর্ম্মের দ্বারা তোমার গতি নির্দ্ধারিত হবে না। তবে আর এসব কথা চিন্তা ক'রে লাভ কি? এভাবে বিচার কত্তে কত্তে দেখ্বে যে, তোমার মন শান্ত হ'য়ে গেছে।

ভদ্রলোক কতক্ষণ চক্ষু বুজিয়া বসিয়া রহিলেন। তারপরে বলিলেন,—যা' বল্ছেন বাবামণি, সুযুক্তিই মনে হচ্ছে। কিন্তু এতেও যদি মনের উদ্বেগ না কমে?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তারও উপায় বল্ছি, শোন। প্রাক্তন তৃতীয় জন্মে তোমার স্ত্রী ছিল শূকরী। সতীত্ব-অসতীত্বের কোনও প্রশ্নই নেই, পশুর আইন-কানুন মানুষের আইন-কানুন থেকে আলাদা। তার প্রয়োজন একমাত্র শূকর-কুলের সংখ্যা-বৃদ্ধির জন্য গর্ভধারণ। ভিতরে কোনও সুস্পষ্ট সুখ-কামনাও নাই। প্রকৃতির নিয়মানুসারে গর্ভধারণের যোগ্য কাল এলেই সে নিজেকে যে-কোনও শূকরের ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির উপকরণ-রূপে তার কাছে সঁপে দিচ্ছে। একবার মুখ ফিরিয়ে তার দেখ্বারও প্রয়োজন নেই যে, কে তার গর্ভে সন্তানাধান কত্তে গিয়ে নিজে সুখ আহরণ কচ্ছে। পিতা হউক, ভ্রাতা হউক, পুত্র হউক, পিতামহ হউক, পৌত্র হউক বা একেবারে রক্ত-সম্বন্ধহীন অন্য কোনও শূকর হউক, তার গর্ভধারণের প্রকৃতি-সিদ্ধ সময়ে যে এসে কাজটুকু করে দিয়ে যেতে পারে, তার প্রতিই সে কৃতজ্ঞ। তাকে উপলক্ষ্য ক'রে অন্যে এসে সুখাস্বাদন ক'রে যাচ্ছে, এর প্রতি তার ভ্রূক্ষেপও নেই কিম্বা এজন্য কোনও শূকর তার প্রিয়াপ্রিয়ও নয়। চিন্তা কর, তোমার স্ত্রী তার পূর্ব্বতর তৃতীয় জন্মে ঠিক্ শূকরীই ছিল। ভাবতে ভাবতে দেখ্বে যে, এক নারীর প্রতি বহু

পুরুষ উপগত হ'লে তোমার আর মনে কোনও দাগই কাটে না। করুক না, যতগুলি পুরুষ ইচ্ছা, তোমার স্ত্রীতে রমণ, তাতে তোমার কিছুই আসে যায় না। রক্তমাংস রক্তমাংসের স্বভাব অনুবর্ত্তন কচ্ছে, তা' নিয়ে তোমার মাথা ঘামানোর কি প্রয়োজন?

ভদ্রলোক বলিলেন,—এরূপ চিন্তা অতীব দুরূহ।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অভ্যাস কর্ল্লে অতীব সহজ। এসব চিন্তা অভ্যস্ত হ'য়ে যাবার পরে তুমি যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণের চূড়ালা উপাখ্যানের চিন্তাটী কর্ব্বে। ঋষি শিখিধ্বজ দেখ্‌লেন, তাঁর স্ত্রী একটী নবযুবকের সঙ্গে প্রগাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ হ'য়ে ঘুমুচ্ছে। অন্যের হ'লে ঈর্ষ্যা হ'ত। কিন্তু তিনি ভাব্‌লেন,—এই কয় দিন আগে যিনি ঋষি কুম্ভ-রূপে ছিলেন জলন্ত ব্রহ্মজ্ঞানের সুস্থির দৃষ্টান্ত, তিনিই দেহের রূপান্তর ক'রে নারী শরীর ধারণ করার পরে ইন্দ্রিয়-সুখের জন্য এমনই পাগল হ'লেন যে, অনুরাগী স্বামী কাছে থাক্‌তেও তিনি পরপুরুষ-সঙ্গ না ক'রে পার্ল্লেন না। আরে, যেতে দাও, এটা ত' রক্তমাংসের ধর্ম্ম, রক্তমাংস নিজ দুর্ব্বলতার অনুসরণ কর্ব্বেই, তার জন্য ব্রহ্মস্বরূপ আমার আত্মায় কেন বিকার আস্‌বে? কত্তে দাও ওকে সুখ সম্ভোগ, নিজে চল আশ্রমে, সেখানে গিয়ে ঈশ্বরের ধ্যানে নিমগ্ন হও। কেমন, পারবে না এভাবে চিন্তা কত্তে?

ভদ্রলোক বলিলেন,—পার্ব্ব।

তোমার সহিত বিশ্বের প্রতি আত্মার সম্বন্ধ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোমার আত্মার সঙ্গে কেবল তোমার স্ত্রীর আত্মাটীরই সম্বন্ধ নয়। তোমার সহিত বিশ্বের প্রতি আত্মার সম্বন্ধ। তোমার স্ত্রীর শরীরটী সম্পর্কে তোমার অত্যধিক লালসার দরুণ তোমার স্ত্রীর আত্মার সঙ্গে তোমার যা' সম্পর্ক, তাও তুমি জান্‌তে পাচ্ছ না, বিশ্বের সকল আত্মার সঙ্গে সম্পর্কের কথা ত' দূরে আস্তাম্। এ জন্মে যাকে স্ত্রী ব'লে জান্‌ছ, সে পূর্ব্বজন্মে হয়ত তোমার সপত্নী ছিল এবং তুমি একটী পুরুষ না থেকে ছিলে একটী নারী। তোমার বর্ত্তমান স্ত্রী ছিল যেই মেথরের পত্নী, তুমিও তার পত্নীই ছিলে। স্বামীর উপরে অধিকার নিয়ে দুই সতীনে কলহ কত্তে, আর আজ সেই দুই জনেই অন্য অজুহাত সৃষ্টি ক'রে কলহ দিয়ে সংসারকে অশান্তির আগারে পরিণত কচ্ছ। কি বল, এমন কি হ'তে পারে না?

ভদ্রলোক বলিলেন,—পারে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তারও পূর্ব্বজন্মে হয়ত তোমার স্ত্রীরই ন্যায় তুমি এক বার-বিলাসিনী ছিলে এবং গণিকা-পল্লীতে একজন অপর জনের প্রতিবেশিনী ছিলে। ওর গৃহে ধনীদের সমাগম হ'ত আর তোমার গৃহে গরীব লোক আসত। তার জন্য তুমি ওকে হিংসা কত্তে। সেই হিংসাই

এসে এই জন্মে তোমার সন্দেহ-বায়ুতে পরিণত হয়েছে এবং যাকে তোমার আদর করা উচিত, তাকে উৎপীড়ন করার প্ররোচনা তোমাকে দিচ্ছে। এমন কি হ'তে পারে না?

ভদ্রলোক বলিলেন,—পারে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তারও পূর্ব্বজন্মে তুমি ছিলে শূকরী, তোমার স্ত্রীও ছিল শূকরী। তুমি সেই শূকরীর গর্ভে তার কন্যা হ'য়ে জন্মেছিলে। কিন্তু প্রকৃতির নিয়মসিদ্ধ গর্ভ-গ্রহণ-কাল এলে তোমার নিকটে উৎকৃষ্ট শূকরেরা না এসে সবাই তোমার এখনকার স্ত্রী ও তখনকার মা শূকরীর নিকটেই যেতে লাগ্‌ল। এতে ক্রুদ্ধ হ'য়ে তুমি তার সঙ্গে সর্ব্বদা কলহ করেছ এবং তারই জের তোমার বর্ত্তমান জন্ম পর্য্যন্ত চলেছে। এমন কি হ'তে পারে না?

ভদ্রলোক চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আত্মার কোন লিঙ্গ নাই। স্ত্রী বা পুরুষ শুধু দেহটাই হচ্ছে। আত্মা কখনো পুরুষও নন, কখনো স্ত্রীও নন, তিনি লিঙ্গাতীত। প্রতি আত্মা প্রতি আত্মার আপন। প্রতি আত্মার সঙ্গে বিশ্বের প্রতি আত্মার অন্তরঙ্গ প্রেমের সম্বন্ধ। জগতের প্রতি আত্মা প্রতি আত্মাকে ভালবাস্‌বে, এটাই আত্মার স্বভাব। তোমার স্ত্রীর দেহ ধারণ ক'রে যিনি তোমার গৃহে আছেন, যাঁর সামাজিক কর্ত্তব্য হচ্ছে তোমার রান্না করা, বিছানা পাতা, সেবা করা, তোমার ঔরস নিজ গর্ভে ধারণ করা, তোমার পুত্রকন্যাকে মানুষ করা, তিনি

নিজে কিন্তু গর্ভও ধারণ করেন না, সন্তানও প্রসব করেন না। তোমার দেহ দ্বারা তাঁর দেহে সন্তানোৎপাদনের তোমার অধিকার সামাজিক অধিকার মাত্র। কিন্তু যেমন তোমার আত্মার প্রতি, তেমন তাঁরও আত্মার প্রতি, বিশ্বের প্রতি-আত্মার প্রীতি ও নৈকট্য অনুভব করার অধিকার রয়েছে, কারণ এটাই বিশ্বের চরম ও পরম সত্য।

ভারত-নারীর সতীত্ব

ভদ্রলোককে খুবই আশ্বস্ত মনে হইল। তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দেখ, সমাজের বিচারে এবং পুরুষানুক্রমিক সংস্কারে যাকে নারীর সতীত্ব ব'লে আখ্যা দেওয়া হয়েছে, সেই বিষয়ে ভারতের নারী জগতে আদর্শস্থানীয়া। এ কথায় এক কণাও ভুল নেই। কোনো কোনো পাশ্চাত্য লেখকের লেখায়ও দেখেছি, ব্রাহ্মণেরা ধূর্ত্ত এবং প্রবঞ্চক, হিন্দু মাত্রেই মিথ্যাবাদী ও চোর, ভারতের নারীকে অতি সহজেই পরপুরুষের সঙ্গে সহবাস কত্তে রাজি করান যায়, পাশ্চাত্য মেয়েদের মত চরিত্রের দৃঢ়তা তাদের নেই,—এই সব কথা ব'লে ব'লে যিনি কয়েক শত পৃষ্ঠার বিরাট বই লিখেছেন, তিনি সেই এক নিঃশ্বাসেই আবার বল্‌তে বাধ্য হয়েছেন যে, তাঁর মতে যেই সকল দেশ ভারতবর্ষের চাইতে অনেক উন্নততর সভ্যতার অধিকারী, সেই সকল দেশের তুলনায়ও এই ভারতবর্ষ নারীর সতীত্ব-

গৌরবের দিক্ দিয়ে শ্রেষ্ঠতর। সহস্র প্রকারের নোংরা অভিযোগ এই নারীদের সম্পর্কেই কত্তে যার লেখনী বিন্দুমাত্র নিরুৎসাহ হয় নি, তার পক্ষে পাশ্চাত্য দেশের নারীদের চাইতেও ভারতের নারীদের সতীত্ব-মহিমা অধিক ব'লে স্বীকার করার মধ্যে নিশ্চয় বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। তোমরাও বিশ্বাস ক'রো যে, ভারতের নারীর সতীত্ব-বোধ স্বভাবতঃ অতীব প্রবল।

সতীত্বের মহিমা

ভদ্রলোক চলিয়া গেলেন। অন্যেরা আলোচনার্থে আসিলেন। তাঁহাদের নিকটে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভারত-নারীর সতীত্ব-বোধ অতি প্রবল ব'লেই হিন্দু জাতির নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাবার বহু সঙ্গত কারণ থাকা সত্ত্বেও সে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে মুছে যায় নি। সতীত্ব নামে এই একটী জিনিষের গৌরব তোমরা যতকাল কত্তে পার্ব্বে, ততকাল তোমাদের ধ্বংসের সম্ভাবনা অল্প।

দরিদ্র-পরিবারে নারীর সতীত্ব

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু গরীবের ঘরে স্থানাভাব বশতঃ একই প্রকোষ্ঠে রাত্রিকালে অনেক লোক ঘুমায়। সতীত্ব-বোধ মেয়েদের খুব প্রবল থাক্‌লেও এই কুব্যবস্থায় ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনেকের সতীত্ব যায়। এর জন্য দায়ী এ

সকল মেয়েরা নয়। প্রত্যেক দেশেই প্রত্যেক সমাজেই, প্রত্যেক শাস্ত্রেই অগম্যাগমন অতি দূষণীয় ব'লে বিবেচিত হয়। যাতে এ পাপ সমাজ-মধ্যে না প্রবিষ্ট হতে পারে, তার জন্য অল্পাধিক দণ্ড, শাসন বা নিন্দা সব সমাজেই আছে। কিন্তু যাদের মধ্যে দৈহিক মিলন দোষাবহ, তাদের যদি দিনের পর দিন মাসের পর মাস একই প্রকোষ্ঠে রাত্রি-যাপন কত্তে হয়, তা হ'লে সেই ঘরে পরিবারস্থ অন্যান্য লোকেরা ঘুমুলেও এর মধ্য দিয়ে ফুলধন্বা কামদেব তাঁর কার্য্য ক'রে যেতে পারেন। এ সকল স্থলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরুষরাই আক্রমণকারী আর নারীরা লজ্জায় জড়সড় অবস্থায় প'ড়ে তাদের নিরীহ শিকার। এই কারণে এ দেশে যতগুলি সতীত্ব-হানি ঘটে, তার প্রতীকার আমরা শুধু প্রতি পরিবারে শয়ন-ব্যবস্থাটুকুর একটু সংস্কার সাধন ক'রেই কত্তে পারি। সংসারের সহস্র ব্যয় ও অপব্যয় যদি চল্‌তে পারে, তা' হ'লে পরিবারস্থ কোনও কোনও পুরুষকে আলাদা ঘরে শুতে দেবার জন্য ব্যবস্থা করা সকল ক্ষেত্রেই অসম্ভব নয়।

সম্পন্ন পরিবারে নারীর সতীত্ব

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ধনীদের গৃহে অবশ্য শয়ন-গৃহের অপ্রতুলতা নেই। সুতরাং এই কারণে অনিচ্ছায় কোনও নারীর সতীত্ব-মর্য্যাদা হ্রাস পাবার কোনও সম্ভাবনা নেই। কিন্তু সেখানে বিপদ আসে অন্য দিক থেকে। ধনিগৃহের

নারীর হাতে থাকে না কাজ, বিলাস আর ব্যসনেই তারা থাকে প্রমত্ত, উপন্যাস, নাটক, প্রেমসঙ্গীত, নৃত্য-কলা ইত্যাদি ক'রে বহু সুকুমার শিল্প আর সাহিত্যের তারা করে চর্চ্চা। কিন্তু পৃথিবীর সুকুমার-শিল্পসমূহ দৃঢ়-চরিত্র প্রবল-নীতিজ্ঞান-সম্পন্ন অটুট চিত্ত-বীণার কোমল তারগুলিকেই করে স্পর্শকাতর। ফলে গুণিজনের সঙ্গে পরিচয় অনেক সময়ে সংসারের শান্তি-নাশক পাপের বীজাণু বহন ক'রে নিয়ে আসে। অন্নাভাব নাই, অর্থাভাব নাই, স্থানাভাব নাই, তবু নারী এখানে অসতী হয় এবং নিজের অসতীত্বকে পাপ বা অপরাধ ব'লে মনে না ক'রে তাকে অন্তরের সহজ সরল প্রকাশ ব'লে গুণব্যাখ্যা দিতে থাকে। অন্তরে অনুতাপ নেই ব'লে এই সকল নারীরা গণিকাদের চাইতেও ভয়ঙ্কর।

সুন্দরের সহিত সত্য ও শিবের মিলন

জনৈক সহচর প্রশ্ন করিলেন,—কিন্তু এর প্রতীকার কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নৃত্যে, সঙ্গীতে, শিল্পে এরা সৌন্দর্য্যকে দেখ্‌তে গিয়েই নিজেদের ভিতরে অনুচিত স্পর্শকাতরতার সৃষ্টি করে। এদের সতীত্ব-প্রতিভা থেকে স্খলনের মূলগত কারণ এই খানে। নৃত্যে, সঙ্গীতে, শিল্পে যে সৌন্দর্য্যকে এরা খুঁজে বেড়াচ্ছে, তার মাঝে যে সত্য এবং

শিবও বসে আছেন, এই ধ্যানটুকু থেকে তারা বিচ্যুত। তাই এই সৌন্দর্য্যানুশীলন মানসিক স্খলন ও দৈহিক পাপকে প্রশ্রয় দিতে পাচ্ছে। সুন্দরের সাথে সাথে শিবময় শুভময় মঙ্গলময়কে, সত্যময়, ঋতময় স্বরূপাবস্থিতকে তারা দেখুক প্রতিটি চারুকলায়, সঙ্গীতে, নৃত্যে;—পাপ, অপরাধ, অন্যায়, চিত্তদাহী সন্তাপ, সংসারদাহী সন্দেহানল, সমাজদাহী কুদৃষ্টান্ত সব চিরতরে দূর হ'য়ে যাবে। সুন্দরের উপাসনাই মনুষ্য--জীবনের চূড়ান্ত কথা নয়। সুন্দরের সহিত সত্য ও শিবের আপাদ-মস্তক মিলন ও পূর্ণ সমন্বয়ই হ'ল জীবনের পরিপূর্ণতার প্রমাণ।

বেলা দুই ঘটিকার সময়ে শ্রীহট্ট এইডেড হাইস্কুলের প্রাঙ্গণে শ্রীশ্রীবাবামণির বক্তৃতারম্ভ হইল। পূর্ণ দুই-ঘণ্টা-কাল বক্তৃতা চলিল। প্রত্যেকটী ছাত্র মন্ত্র-মুগ্ধবৎ শুনিতে লাগিল।

নব-ভারতের নিকটে বাণী

মেঘমন্দ্রে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—অতীতের বৃশ্চিক-দংশন তোমাদের জীবনের উপরে অত্যাচার চালাবার অধিকার থেকে বঞ্চিত হোক্। এমন পৌরুষ-সহকারে তোমরা তোমাদের জীবনকে পুণর্গঠিত করার জন্য অধ্যবসায়ী হও, যেন অতীতের সমস্ত গ্লানি বিস্মৃত স্বপ্নের মত অনাদরে দূরে সরে যায়। হে ভারতের নবযুবক, শক্তি-সঞ্চয় কর, অতীতের অপচয়ের যথাযোগ্য পরিপূরণ কর, ঋষির ভারতে ঋষির

পুত্র-কন্যারা কেমন ক'রে যে নূতন জীবন গঠন করে, তার আদরণীয় দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা ক'রে যাও। হতাশা এবং অবসাদ, অবিশ্বাস এবং দুর্ব্বলতা প্রতিষ্ঠা ক'রে যাও। হতাশা এবং অবসাদ, অবিশ্বাস এবং দুর্ব্বলতা আলস্য এবং শ্রমকুণ্ঠা,—এইগুলিকে অবিলম্বে পদতলে চেপে নিষ্পেষিত কর। তাদের আর মাথা তুলে দাঁড়াতে দিও না। তোমাদের বিপুল বিক্রমের সমক্ষে প'ড়ে তারা আর্ত্ত চীৎকার কত্তে কত্তে চিরতরে ধ্বংস হ'য়ে যাক্। জাগো ভারতের বীরপুত্র, সম্মুখে তোমাদের পৃথিবী-ব্যাপী বিপুল দিগ্বিজয়ের কর্ম্মতালিকা উন্মেষিত হয়েছে, হস্ত-প্রসারণ ক'রে এই কর্ম্ম-তালিকাকে শক্ত ক'রে ধর, প্রতিজ্ঞা কর, ভারতের চিরন্তনী কীর্ত্তি অধিকতর উজ্জ্বল ক'রে তোমরা নূতন ক'রে জগতের বুকে প্রতিষ্ঠা কর্ব্বে। ভারতের মাটিতে জন্মগ্রহণ ক'রে ভারতকে যে ভালবাসে না, সে কখনো মানুষ নামের যোগ্য নয়। তোমরা মানুষ হও। নিজেদিগকে ভারত-মাতার সন্তান ব'লে জ্ঞান কত্তে শেখ। দেশ-জননীর প্রতি তোমাদের অলঙ্ঘনীয় কর্ত্তব্যের কথা তোমরা চিন্তা কর। সেই মহৎ কর্ত্তব্যের বিশালতা হিসাব ক'রে দেখ। সেই কর্ত্তব্য যত বিশাল হোক্, যত বিরাট হোক্, তাকে পূর্ণতঃ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর রূপে উদ্‌যাপন করার দায়িত্ব যে তোমাদের, এই কথা অন্তরের অন্তরে সুস্পষ্ট রূপে অনুধাবন কর, ভাবো, বোঝো এবং তদনুযায়ী চল। নব-জীবনের নূতন কর্ত্তব্য-পথে তোমরা অতীতের কোনও

অনুশোচনাকে এসে পথ-কণ্টকবৎ বিঘ্ন-উৎপাদন কত্তে দিও না। দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, শঙ্কা, কুণ্ঠাগুলিকে উৎপাটন কর সমূলে, নির্ব্বংশ কর তাদের ঝাড়। সঙ্কল্পের দুর্ব্বার শক্তিতে শক্তিমান হ'য়ে হে ভারতের নবযুবক, নূতন ভারত গড়ার মহাকার্য্যে অবতীর্ণ হও। নব-ভারতের নিকটে এই হচ্ছে আমার একমাত্র বাণী।

মাতৃভক্তি, দেশপ্রেম ও বিশ্বপ্রেম

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দেশপ্রেমের কথা বল্‌তে গিয়ে তোমাদের কাছে অরুচিপ্রদ হ'লেও অন্য দিকের আর একটী কথা আমি তোমাদের বল্‌ব। দেশকে ভালবাসার মানে হচ্ছে দেশের মানুষকে ভালবাসা, নিজের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি কমিয়ে দেশের মানুষের সুখ-সাধনের চিন্তায় ব্যাকুল ভাবে নিমগ্ন হওয়া এবং সেই শুভচিন্তার অনুপ্রেরণায় নিরন্তর সৎকর্ম্মান্বিত থাকার চেষ্টা করা। 'আমি দেশ-প্রেমিক',—একথা বল্লেই কেহ দেশ-প্রেমিক হ'য়ে যায় না। 'তোমরা সবাই দেশের সেবায় লেগে যাও',—একথা ব'লে বক্তৃতা দিয়ে বেড়ালেও কেউ দেশপ্রেমিক হয় না। স্বদেশ-প্রেম-রূপ একটা জলন্ত আবেগ নিজের অন্তরে উপলব্ধি ক'রে নিয়ে সেই আবেগের আবেশে স্বার্থগন্ধহীন দেশব্যাপী পরোপকারে নিয়ত নিজেকে নিরত ক'রে রাখার নাম দেশ-সেবা। আমি আমার স্বদেশের

প্রতি অনুরাগী ব'লে অন্যের স্বদেশের প্রতি আমি বিদ্বেষ-ভাব পোষণ কর্ব্ব, এটা প্রকৃত এবং বিশুদ্ধ স্বাদেশিকতার লক্ষণ নয়। আমার দেশ সমগ্র পৃথিবীরই একটা অংশ, অতএব আমার দেশের হিতচিন্তার কালে আমি অন্য দেশের প্রতি বিদ্বেষের চর্চ্চা কত্তে পারি না। আমি আমার মাকে ভালবাসি বলেই দেশকে ভালবাসার প্রশ্নটা এসেছে আর আমি আমার দেশকে ভালবাসতে পারলে নিশ্চয়ই নিখিল বিশ্বের সমস্ত অধিবাসীকে, সকল জাতিকে, সকল ধর্ম্মাবলম্বীকে, সকল মতানুসারীকে মানুষ-রূপে নিশ্চয়ই ভালবাসতে পারব। যে নিজের মাকে ভালবাসতে পারে না, তার দেশপ্রেম মেকি এবং ভেজাল, যে বিশ্ববাসীকে ভালবাসতে পারে না, তার স্বদেশ-প্রেম অসম্পূর্ণ এবং হীনাঙ্গ। বিদ্বেষের সঙ্গে বিন্দুমাত্র বিমিশ্রিত না ক'রে যে স্বদেশ-প্রেম, তার চর্চ্চা কত্তে হ'লে কৌপীনের ডোর শক্ত ক'রে বাঁধতে হয়, ব্রহ্মচর্য্য পালন কত্তে হয়।

ভ্রম-সংশোধন

এইখান হইতে (১৬ই মাঘ, ১৩৪১) ২০৫ পৃষ্ঠায় উপর হইতে ১২ পংক্তির পরে এবং নীচ হইতে ১০ পংক্তির উপরে পড়িতে হইবে।

বেলা দুই ঘটিকায় সুর্ম্মা ভ্যালি টেকনিক্যাল স্কুলে

শ্রীশ্রীবাবামণির বক্তৃতারম্ভ হইল। অধ্যক্ষ শ্রীপি, সি, দত্ত তাঁহার ভাষণে বলিলেন,—আচার্য্য স্বরূপানন্দ শ্রীহট্ট আসিয়া ধারাবাহিক বক্তৃতাবলি প্রদান করিয়া এতদঞ্চলের মানুষের প্রাণে নূতন প্রেম ও উদ্দীপনা জাগাইয়াছেন। আমার ছাত্রগণ সেই অভাবনীয় অবদান হইতে বঞ্চিত না হয়, এইটুকুই আমার কাতর মিনতি।

শক্তি-কেন্দ্রের সহিত যুক্ত হও

শ্রীশ্রীবাবামণি ভাষণ-প্রসঙ্গে বলিলেন,—নিজেদিগকে সর্ব্বশক্তির কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত কর। পাওয়ার-হাউসের সঙ্গে যার সংযোগ নাই, সেই যন্ত্র চলে না। গায়ের জোরে ঠেলে তাকে বেশীক্ষণ চালানও যায় না। নিজেরা হও যন্ত্র, আর ভগবানকে কর তোমাদের পাওয়ারহাউস। যন্ত্রীর সাথে যে যন্ত্রের সম্বন্ধ, তার সার্থকতায় কোনো সন্দেহের কারণ নেই। তোমরা প্রকৃত যন্ত্র হও। শক্তির পরম কেন্দ্র শ্রীভগবান্‌কে একটা নিমেষের জন্যও বিস্মৃত হয়ো না। মননের দ্বারা তাঁর সাথে সংযোগ রক্ষা কত্তে থাক।

বক্তৃতা দেড় ঘণ্টা কাল হইল।

শ্রীহট্ট

বৃহস্পতিবার, ১৭ই মাঘ, ১৩৪১

(৩১শে জানুয়ারী, ১৯৩৫)

বালিকা-বিদ্যালয়ের বক্তৃতা

বেলা একটা বাইশ মিনিটের সময়ে শ্রীশ্রীবাবামণি শ্রীহট্ট গভর্ণমেন্ট গার্লস্ হাইস্কুলে বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতা দেড় ঘণ্টা ব্যাপিয়া হইল। দশ বারো হইতে কুড়ি বাইশ বছরের মেয়েদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া শ্রীশ্রীবাবামণি নৈতিক জীবনের সার্থকতা সম্বন্ধে এমন এক সুকৌশল ভাষণ প্রদান করিলেন, কেহ পূর্ব্বাহ্নে কল্পনাও করিতে পারেন নাই যে, সংযম ও পবিত্রতা সম্বন্ধে এমন নিরাপদ বক্তৃতা হইতে পারে। এই স্থানে উল্লেখ করিলে দোষ হইবে না যে, কি জানি, কি বলিতে বক্তা জানি কি বলিয়া বসেন, এই আশঙ্কাতে বিগত দশ বারো দিন ধরিয়া স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ শ্রীশ্রীবাবামণিকে আমন্ত্রণ করিতেই সাহস পাইতেছিলেন না। কিন্তু অদ্যকার এই বক্তৃতা শুনিয়া সকলের ভ্রম ভাঙ্গিল। সকলে বুঝিলেন যে, রাজা গিরিশ চন্দ্র হাইস্কুলের প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া যিনি অকপটে সমাজের কদর্য্যতম ব্যাধির স্বরূপ প্রকাশ করিয়া সমাজকে আত্মরক্ষার জন্য সাবধান করিয়া দিতে পারেন, কোমলা কিশোরী ও বালিকাদের মধ্যে দাঁড়াইয়া তিনি সেই কথাগুলিই এত সন্তর্পণে বলিতে পারেন যে, যাহার এসব জানিবার প্রয়োজন আছে, সে সবই জানিবে, বুঝিবে, সতর্ক হইবে কিন্তু যার তাহা বুঝিবার সময় বা বয়স হয় নাই, সে নির্দ্দোষ কতগুলি উপদেশপূর্ণ গল্প শুনিয়া হৃষ্টচিত্তে গৃহে ফিরিবে।

কথার উৎস ভাব

গার্লস্ হাইস্কুলের একজন শিক্ষক প্রশ্ন করিলেন,—স্বামীজী, এমন বক্তৃতা আপনি কেমন ক'রে দিলেন। অবাক্ মনে হচ্ছে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমার মা এক সময়ে ঐ বয়সের ছিলেন। আমার মায়ের ঐ বয়সের সুন্দর সরল সহাস্য মুখখানা আমার মনে কল্পনা-গগনে জেগে উঠ্ল। দেখ্লাম, এরা কতকগুলি বালিকাই নয়, এরা প্রত্যেকে এক একটা অতি সুন্দর, অতি সুগন্ধ, অতি মনোরম, একেবারে নিষ্পাপ, নিষ্কলুষ, স্বর্গীয় পারিজাত। ফুল দেখ্লেই তুলসীপত্র, বিল্বপত্র, দূর্ব্বা, চন্দন প্রভৃতির কথা মনে হয়। অন্তরে আপনা আপনি একটা পূজাভাবের উদয় হ'ল। সেই ভাবটাই আমার কথাকে টেনে এনে ভিতর থেকে বের ক'রে দিয়েছে, আমি নিজে চেষ্টা ক'রে একটা কথাও তৈরী ক'রে বলিনি। কথার উৎস ভাব, কথার উৎস বিদ্যাও নয়, তথ্যও নয়, প্রয়োজনের তাগিদও নয়। যে কথা অকপট ভাব থেকে সমুত্থিত হয়, সে কথা মন্ত্রের মত কাজ করে।

ভক্তের লক্ষণ

অপরাহ্ণ চারিটা হইতে সাড়ে চারিটা পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীবাবামণি ব্রজনাথের টিলা নামক দেব-মন্দিরে অবস্থান করিলেন। বহু উপদেশ প্রার্থীর সমাগম হইয়াছে।

উপদেশ-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমাদের যা-কিছু চেষ্টা ও সাধনা, সবই হবে ভগবৎ-প্রীত্যর্থে, এ হচ্ছে প্রকৃত ভক্তের প্রাণের আকিঞ্চন। ভক্ত কখনো আত্ম-সুখ চান না। পরমদয়িতের কিসে সুখ, কিসে পরিতৃপ্তি, কি করলে তিনি হবেন হৃষ্ট, তুষ্ট ও আনন্দিত, এই হচ্ছে ভক্তের একমাত্র লক্ষ্য। আসুন, আমরা যে যতটুকু পারি, ভক্ত হই।

ভক্ত কি ভাবে হয়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অবশ্য ইচ্ছা করলেই কেউ ভক্ত হতে পারে না। ঠাকুর তুমি নিজের গুণে, নিজের প্রয়োজনে, তোমার নিজের সেবার অনুরোধে আমাকে তোমার একান্ত ভাবে আশ্রিত ক'রে নাও, আমাকে তোমার অনুগত কর, আমাকে তোমার সেবক কর, আমাকে তোমার ভক্ত কর, এভাবে কাতর প্রাণে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে কোনও এক অজানা শুভ-মুহূর্ত্তে তাঁর করুণার উৎস-মুখ খু'লে যায়। মানুষ তখন ভক্ত হয়।

সঙ্গীতের প্রকৃত উদ্দেশ্য

সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকায় শ্রীশ্রীবিশ্বম্ভরের আখড়ায় একটী সঙ্গীত সম্মেলনের আহ্বান হইয়াছে। শ্রীশ্রীবাবামণিকে পূর্ণ দুই ঘণ্টা ব্যাপিয়া বক্তৃতা দিতে হইল।

সঙ্গীতের বিকাশ, ক্রম, স্বর-বিভাগ, সঙ্গীতের বৈজ্ঞানিকতা, শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের বিশেষত্ব, কীর্ত্তন-সঙ্গীত এবং তাহার মাধুর্য্য প্রভৃতি বহু বিষয়ে অগাধ জ্ঞানপূর্ণ আলোচনার পরে উপসংহারে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সাধকের নিকটে সঙ্গীত শুধু গানই নয়, সঙ্গীত তাঁর ভগবল্লাভের এক পরম সঙ্গতি। সঙ্গীতের ভিতরে আত্মবিলয় আর ভগবানের ভিতরে সঙ্গীতের বিলয়, এই হ'ল সঙ্গীতের চরম উৎকর্ষের পরিচয় এবং চরম সার্থকতার প্রমাণ। গান সকলেই গায়, কিন্তু যাঁকে শুনালে গান সার্থক, তাঁকে শুনায় কয় জন? বাইরের তামসিক লোকদের করতালি সংগ্রহ গায়কের কখনো লক্ষ্য হ'তে পারে না, অন্তরের অকপট বিকাশ এবং জীবনেশ্বরের চরণে সেই বিকাশের পরিপূর্ণ উপঢৌকন, এই হবে সঙ্গীতের প্রকৃত উদ্দেশ্য। সঙ্গীতের দেশব্যাপী প্রসার একান্ত আবশ্যক। কিন্তু আমাদের বদ্ধপরিকর হ'তে হবে যেন এই সঙ্গীতের সুর-লহরী প্রত্যেক মানবের সুপ্ত চেতনাকে জাগিয়ে তোলে, নীচ, হীন, ঘৃণ্য স্বার্থের দাসকে ভূমা-স্বরূপের দিকে অগ্রসর ক'রে দেয়।

শ্রীহট্ট

শনিবার, ১৯শে মাঘ, ১৩৪১

(২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৫)

কুমারী-জীবনে আধুনিকতার সমস্যা

একটী প্রতিষ্ঠাবতী মহিলা শ্রীশ্রীবাবামণির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া একটী গুরুতর বিষয়ে প্রশ্ন করিলেন। প্রশ্নটী এই। একটী কুমারী মেয়ে চারুশিল্পের শিক্ষা-ব্যপদেশে সুচতুর শিক্ষাদাতার সুকৌশলে পাতা মোহজালে জড়াইয়া পড়ে। হঠাৎ কুমারীটীর খেয়াল হইল যে, সে যতটা অগ্রসর হইয়াছে, তারপরের ধাপের নাম হইতেছে বিবাহ। তখন সে শিক্ষকের নিকট প্রস্তাব করিল,—"আমাকে বিবাহ কর।" শিক্ষক বলিল,—"আমি তোমাকে অনেক আদর-খাতির দেখাইয়াছি বলিয়াই তোমাকে বিবাহ করিব? বিবাহ করিতে হইলে একটা মেয়ের উপরে যে সুগভীর শ্রদ্ধা থাকা আবশ্যক, সেই শ্রদ্ধা তোমার উপরে আমার নাই। তুমি অতি সস্তা মেয়ে। সস্তা মেয়েকে নিয়া মানুষ আমোদ করে, প্রমোদ করে, চিত্ত বিনোদ করে কিন্তু তাহাকে বিবাহ করিয়া জীবন-সঙ্গিনী করে না।" কুমারীটীর ভয়ানক অনুতাপ হইল, সে ঐ পথ পরিহার করিল, প্রাণপণ পরিশ্রমে এবং নিজ প্রতিভার বলে অন্য লাইনে বিদ্যার্জ্জন করিল ও সম্মানিত একজন উচ্চপদস্থ রাজ-কর্ম্মচারীর সঙ্গে তাহার বিবাহের প্রস্তাব পাকা হইয়া গিয়াছে। এখন মেয়েটীর সমস্যা, সে যাহাকে স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিতে যাইতেছে, তাহার নিকটে নিজ অতীত জীবনের

গ্লানি গোপন রাখিবে, না প্রকাশ করিবে। অথবা এখন বিবাহটী হইয়া যাইতে দিবে এবং পরে সব কথা খুলিয়া বলিবে? আজ যদি সে এসব কথা প্রকাশ করে, তবে খুব সম্ভবত প্রস্তাবিত বিবাহ ভাঙ্গিয়া যাইবে। অথচ মেয়েটী বুদ্ধিমতী, কর্ম্মিষ্ঠা, স্বাস্থ্যবতী এবং বিবাহেরই তাহার প্রয়োজন, একটী সৎ-স্বভাব পতির আশ্রয় তাহার আবশ্যক। যাহারা বিবাহ না করিয়া দশ জনের সেবার মধ্য দিয়া সানন্দে জীবন কাটাইয়া দিতে পারে, এই মেয়েটীর মেরুদণ্ড সেই ধরণের নহে। বিবাহের পরে যদি মেয়েটি তাহার স্বামীর কাছে তার জীবনের অতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠা কয়টা খুলিয়া ধরে, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত স্বামী হয়ত তাহাকে পরিত্যাগ নাও করিতে পারেন কিন্তু মনে মনে স্ত্রীর প্রতি ঘৃণা বা অনুকম্পার দৃষ্টিতে তাকাইবেন। ইহাতে দাম্পত্য জীবনের প্রেম ও প্রীতির চিরসমাধি হইবে। কিন্তু যদি মেয়েটী নিজ জীবনের অতীত কথা গোপন করিয়া চাপিয়া রাখিয়া দেয়, তাহা হইলে স্বামী অবশ্য কিছুই জানিবেন না বা সন্দেহ মাত্রও করিতে পারিবেন না, কিন্তু এই অসরল কপট ব্যবহারের দরুণ সাধ্বী পত্নীর অন্তরে সকল সময়েই একটা যাতনা চলিবে। কেননা, পতির নিকট পত্নীর কখনও গোপনতা চলিতে পারে না।

অতীত কর্ম্ম ও অতীত জন্ম

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—এজন্য উদ্বিগ্ন হবার

এ ক্ষেত্রে কোনও প্রয়োজনই নেই। যেখানে বিবাহার্থিনী মেয়ের অন্তরে আত্ম-বিচার এত সুপ্রকাশ, সেখানে সমস্যার ত' সমাধান হ'য়েই গেছে। একজন অতীত জন্মে কি পাপ করেছিল, সেই কথা তার পর-জন্মে স্মরণ রাখবার বা দশ জনকে ব'লে বেড়াবার প্রয়োজন দেখি না। দীক্ষা এবং বিবাহ এই দুইটী অনুষ্ঠানকেই পুনর্জ্জন্মবৎ জ্ঞান কত্তে হবে। দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ-মাত্র অতীতের পাপ চ'লে যায়। যদি কোনও মহাপুরুষে এই মেয়েটীর আস্থা এসে থাকে, সে তাঁর কাছ থেকে দীক্ষা নিয়ে অন্তরের বিপুল অনুশোচনার ভার ভগবৎ-পাদপদ্মে নিক্ষেপ করুক। আর, বিবাহটাকে যৌন সম্মেলনের একটা সমাজ-সম্মত রূপ ব'লে জ্ঞান না ক'রে নবজীবন-বিধায়ক একটা অনুষ্ঠান ব'লে সে জ্ঞান করুক। বিবাহের মন্ত্র, যজ্ঞ এবং অপরাপর অঙ্গ উপাঙ্গগুলিকে নবজন্ম লাভের উপায় ব'লে সে মনে প্রাণে ধ্যান করুক। এর ফলেই তার উপর থেকে অতীতের অধিকার ক্রমশঃ খর্ব্ব হ'য়ে যাবে। আর, স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর কাছে কিম্বা স্বামীর পক্ষে স্ত্রীর কাছে কোনও কিছু গোপনীয় থাক্তে পারে না, একথা সত্য। কিন্তু পূর্ব্বজন্মে কে কবে কোথায় কোন্ ভুল কোন্ অবস্থায় প'ড়ে করেছিল, তাই নিয়ে পরজন্মে আলোচনা করার মত ভ্রম আর কি আছে? অতীত অতীতের গর্ভে ডুবে যাক্, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎকে সততায়, সরলতায়, পবিত্রতায়, মাধুর্য্যে, মহনীয়তায়, প্রেমে, প্রীতিতে, নিঃস্বার্থপরতায় এবং স্বামীর

জন্য স্ত্রীর, স্ত্রীর জন্য স্বামীর আত্মবিসর্জ্জনে উজ্জ্বল ক'রে তোলার জন্যই সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত উদ্যম, সমস্ত শক্তি, সমস্ত চিন্তা নিয়োজিত হউক।

বিবাহ ও দীক্ষা প্রকৃতই পুনর্জ্জন্ম

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কতকগুলি স্বামী আছে, যারা প্রাগ্-বিবাহিত জীবনে ছিল বহুবল্লভ এবং কদাচারী, তারা অনেক সময়েই বিবাহের পরে সৎ হ'য়ে চল্বার চেষ্টা করে। তাদের পত্নীরা তা'দিগকে তাদের পূর্ব্বজীবনের কদর্য্য ইতিহাসের স্বীকারোক্তি কত্তে বাধ্য করে না। স্বামীর ব্যবহার স্ত্রীর প্রতি যদি সৎ, সঙ্গত, সাধুজনোচিত হয়, স্বামীর প্রেম যদি স্ত্রীর প্রতি প্রণয়োচ্ছল ও অনুরাগ-রঞ্জিত হয়, তবে তারা স্বামীর অতীত জীবনের কুকীর্ত্তি সম্পর্কে কারো কাছে কোনো কাণাঘুষা শুন্লেও এই বিষয়ে নিয়ে স্বামীকে আর বিরক্ত বা উত্তেজিত কত্তে চেষ্টা করে না। মনে কষ্ট-বোধ অস্বাভাবিক নয় কিন্তু মনের কষ্ট মনেই চেপে রেখে তারা স্বামীকে নিজের প্রতি বিশ্বাসী রাখবার চেষ্টায় ব্রতী হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে স্ত্রীর পক্ষে এটাই হচ্ছে কর্ত্তব্য-বুদ্ধি-প্রণোদিত ব্যবহার। কিন্তু স্বামীরা হাসি-ঠাট্টার ছলে অনেক সময়ে স্ত্রীদের সঙ্গে এমন ইয়ারকিও মারে, যখন স্ত্রীরা তাদের অতীত জীবন

সম্পর্কে স্বামীর কল্পিত অভিযোগকে হাসি-ঠাট্টার মধ্য দিয়েই মিছামিছি স্বীকার করে, এবং পরে সমস্ত জীবন ভ'রে স্বামীদের অকারণ সন্দেহের পাত্র হ'য়ে অন্যায় অত্যাচারের শিকার হয়। এরূপ ঘটনা সহরে ও গ্রামে নানা স্থানে, কখনো কখনো ঘটতে দেখা যায়। সুতরাং কি স্বামী, কি স্ত্রী, কারোই কখনো বিবাহের পরে আর বিবাহের পূর্ব্ববর্ত্তী জীবন স্মরণ রাখা ভাল নয়। বিবাহ যে একটা পুনর্জ্জন্ম, এই কথাটা মনের ভিতরে অলোপ্য অক্ষরে ক্ষোদাই ক'রে দেওয়ার সাহায্য ক'রেছে আমাদের সনাতনী মতের বিবাহের হোম ও সপ্তপদী। দীক্ষা যে একটা পুনর্জ্জন্ম, এই কথাটা মানুষের মনে গভীর ভাবে প্রোথিত ক'রে দিয়েছে দীক্ষার অনুকূলে দেশপ্রচলিত শ্রদ্ধার ভাব। সমগ্র জীবনের দাম্পত্য সম্পর্কের পরিণতিকে মধুময় ও সুধামাখা করবার জন্য এই দুইটী সংস্কারের সুযোগ গ্রহণ নিশ্চয়ই কর্ত্তব্য। রাজস্থানের দিকে অনেক পরিবারে বিবাহের সময়েই এসে কুলগুরুরা দীক্ষা দিয়ে যান বলে আমরা শুনেছি। এই প্রথাটী বিবাহের গাম্ভীর্য্যকে যে বর্দ্ধন করেছে, একথা অবশ্য স্বীকার্য্য।

মহিলাটী কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—হ্যাঁ, আমি জবাব পেয়েছি।

মহিলাটী প্রস্থান করিলে নোয়াখালী হইতে আগত একটী ভদ্রলোক কতকগুলি প্রশ্ন করিলেন। ইনি নাকি শ্রীশ্রীবাবামণিকে কতক দিন ধরিয়াই খুঁজিতেছিলেন। কোনও

আত্মীয়কে দেখিবার জন্য শ্রীহট্ট আসিয়া শ্রীশ্রীবাবামণির স্থিতিস্থানের খোঁজ পাইয়া একান্তে দেখা করিতে আসিয়াছেন। তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়াই তাঁহার বক্তব্য বলিলেন।

সুদুর্ল্লভ শিষ্য

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—গুরু-শিষ্যের বিচিত্র সম্পর্ক শুনবে? কোনো গুরু শিষ্যের সম্পর্কে একান্ত স্বার্থপর ও নিয়ত ক্রোধপরায়ণ, আর শিষ্য গুরুর অতি অসঙ্গত আদেশ পালনেও তৎপর। গুরু হয়ত শিষ্যের দৈহিক, মানসিক, নৈতিক সর্ব্বপ্রকার স্বাধীনতার উপরে হস্তক্ষেপ কচ্ছেন, এমন কি নারী-শিষ্যকে নিয়ে নারকীয় লীলার অনুষ্ঠান কচ্ছেন, তবু শিষ্য বিনীত, অনুদ্বিগ্ন, দোষানুসন্ধানে অনিচ্ছুক, গুরুর ইচ্ছাকে নিজের ইচ্ছার উপরে জয়যুক্ত হ'তে দিয়েই তার অপার, অসীম, অফুরন্ত আনন্দ। শিষ্যত্বের দিক্ দিয়ে এটী একটী অতি অসাধারণ রকমের প্রশংসনীয় অবস্থা, যেই অবস্থাতে শিষ্য নিজের নিজত্ব ব'লে কোনও কিছুকেই রাখে নি, পরন্তু নিজের দেহ, নিজের স্বার্থ, নিজের অর্থ, নিজের বিত্ত, নিজের প্রভাব, নিজের প্রতিপত্তি ও নিজের আকাঙ্ক্ষাকে সব গুরুতে সমর্পণ ক'রে একেবারে নিশ্চিন্ত। এমন শিষ্যেরা যদি সাধন করে, নামে অভিনিবিষ্টচেতা হয়, গুরুদত্ত আধ্যাত্মিক ক্রিয়াগুলিতে অনন্যমনা হ'য়ে পরিনিষ্ঠিত হয়, তাহ'লে তাদের পক্ষে ব্রহ্মদর্শন অতি সহজসাধ্য ব্যাপার। যে

নিজের স্ত্রীর উপরে পর্য্যন্ত নিজের কর্ত্তৃত্বটুকু স্বীকার করে না, মনে মনে ভাবে 'গুরুদেবই তার স্বামী, আমি ত' তার রক্ষক মাত্র', তেমন নির্লালস, অক্রোধ, অনসূয় পুরুষের পক্ষে ভগবানে মনঃপ্রাণ ডুবিয়ে দিতে সময় লাগে বড় অল্প। এজন্যই অনেক সম্প্রদায়ের সাধকদের বল্‌তে শুনা যায় যে, গুরুতে আত্মসমর্পণ কর্‌লে ত' সবই হ'য়ে গেল, আর কিছু করার বা পাবার বাকী রইল না। এমন শিষ্য জগতে সুদুর্লভ।

হতভাগ্য গুরু

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু এসব শিষ্যের গুরুদেবের প্রকৃত অবস্থাটা কি আর বাস্তব পরিণামই বা কি, তার আলোচনা পৃথক্ ব্যাপার। শিষ্যের উপরে নিজের কর্ত্তৃত্ব চালাতে চালাতে গুরুদেবেরা নিজেদের উপরে কর্ত্তৃত্ব হারিয়ে ফেলেন। পরধন, পরনারী সহজলভ্য হওয়াতে এরা অতি অল্প সময়ে পাপের পল্বলে ডুবে যান,—প্রথম প্রথম অতিশয় উদ্ধশীর্ষ এক আধ্যাত্মিক দাম্ভিকতার প্রেরণায় এরা পরধন ভোগ করেন, পরনারীকে পদসেবায় নিয়োজিত করেন, যাদের ধন যাদের নারী নিয়ে তাঁদের এই অবাধ ব্যবহার, তাদের প্রতি অপরিসীম কৃপা ও অনুকম্পার ভাব পোষণ কত্তে কত্তে নিজেদের ইন্দ্রিয়-সেবাকে জনক-ঋষির অনাসক্ত ভোগ বা শ্রীকৃষ্ণ-ভগবানের অকৈতব প্রেম ব'লে মনে মনে অভিমান

করেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সেবা ত' কচ্ছেন নিজ নিজ ইন্দ্রিয়ের, পরিতৃপ্তি দেবার ব্যর্থ চেষ্টা কচ্ছেন নিজ নিজ অহংমমাদিভাবানুপ্রাণিত তুচ্ছ স্বার্থ বুদ্ধির, ফলে যার ধন দিয়ে বড়-মানুষী কচ্ছেন, রোল্‌স্ রয়েস গাড়ী চড়্‌ছেন, সাত তলা দালানে বাস কচ্ছেন, তারই প্রতি এসে যায় অন্তরের বিদ্বেষ, অফুরন্ত আক্রোশ আর অপরিতর্পণীয় অসাধারণ প্রাপ্তির দাবী। এভাবে পুত্রাধিক শিষ্য হ'য়ে দাঁড়ায় একজন প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী বা ব্যবসায়ের শরিক। এসব গুরুরা বড়ই হতভাগ্য পুরুষ এবং পরম দুঃখী জীব। কিছুকাল পরে শিষ্যরাই মনে মনে এঁদের প্রতি অনুকম্পার ভাব প্রকাশ কত্তে থাকে এবং এদের গুরুত্ব নিজ জীবনে স্বীকার করা হয়েছিল বলে নিজেদিগকে শতবার ধিক্কার দেয়।

আদর্শ গুরু

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—আর এক রকমের গুরু আছেন, যাঁরা শিষ্যদের ধন-সম্পদ থেকে নিজেদের দূরে রাখ্‌তে চেষ্টা করেন, শিষ্যদের সাংসারিক জটিলতার মধ্যে প্রবেশ করেন না, শিষ্যদের নারীদিগকে বা নিজ স্ত্রীশিষ্যদিগকে অপর সাধারণ দশজন মহিলা থেকে একটু আলাদা নজরে দেখেন না। তাদের সেবা নিতে হন কুণ্ঠিত এবং যতক্ষণ যার সেবা না নিয়ে পারা যায়, ততক্ষণ তার সেবা-গ্রহণ থেকে নিজেকে দূরে রাখেন, "গুরুতে সর্ব্বস্ব সমর্পণ কর", এই

উপদেশ দেন না, "নিখিল জগতের নিঃশ্রেয়স হিতের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দাও", এই উপদেশই দেন, নিজের মঠ বা আশ্রমের জন্য শিষ্যরা কিছু দান না কর্ল্লে ক্ষোভে ক্ষেপে ওঠেন না, কিন্তু ভিন্ন মঠে, ভিন্ন আশ্রমে, ভিন্ন কোনও জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠানে কেউ কোনও মহান্ ত্যাগ স্বীকার কল্লে বা মহৎ দান দিলে পুলকিত হন, শিষ্যদের ডেকে ডেকে বলেন না,—"তোরা আমার কথাই শুন্‌বি, অন্য কারু কথায় কাণ দিবি না, দিলে ব্রহ্মশাপ দিব",—প্রত্যেককে নিজ স্বাধীন বিবেকে স্বাধীন বিচার, স্বাধীন গবেষণা করার পূর্ণ অধিকার দেন, কিন্তু এর ফলে কতক শিষ্য বিদ্রোহী হ'য়ে গুরু-মারা বিদ্যারই চর্চ্চা কর্ব্বে কিনা, সেই কথা কল্পনায়ও আনেন না, প্রয়োজন হ'লে শিষ্যের হিতের জন্য নিজের প্রাণ দিয়ে দেন কিন্তু নিজের প্রয়োজনে শিষ্যদের উদ্বেগ সৃষ্টি করেন না। এমন গুরু আদর্শ গুরু, প্রকৃত গুরু, অতুলন, অনুপম, অকৃত্রিম গুরু।

নরাধম শিষ্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু এই সকল গুরুদেবের শিষ্য-ভাগ্য সকল সময়ে খুব সুপ্রসন্ন হয় না। জীবন ভ'রে কাজ ক'রে ক'রে যিনি জীবকুশলেই আয়ুক্ষয় করছেন, এমন গুরুকেও একদল শিষ্য হুজুগের চাবুক দিয়ে নিজেদের ইচ্ছামত

চালাতে চায়। শিষ্য যখন ইচ্ছা করেছেন, তখন হুজুগাকৃষ্ট তার একদল বন্ধুকে দীক্ষা দিতেই হবে, নইলে গুরুদেবের পিঠে ছাল থাক্‌বে না। শিষ্য যখন ইচ্ছা করেছেন, তখন গুরুদেবকে সারারাত জেগে থিয়েটারে সভাপতিত্ব কত্তেই হবে, নইলে অন্য শিষ্যদের নিয়ে গুরুদেবের আশ্রমকে বয়কট করার ব্যবস্থা হবে। শিষ্য ইচ্ছা করেছেন, তাঁর ধর্ম্মতঃ নিঃসম্পর্কিতা রক্ষিতা নারীটী গুরুদেবের আশ্রমে বাস ক'রে কিছু ধর্ম্মকর্ম্ম শিখে আসুক, যাতে লোক-কলঙ্কটা সহজে ধুয়ে মুছে যেতে পারে, কিন্তু গুরুদেব তাতে রাজি না হ'লে গুণ্ডা লাগিয়ে আশ্রমের মন্দিরে হামলা চালানো হবে। গুরুদেবের ফুস্‌ফুসে ব্যথা, আর তার জন্য তিনি বেশী কথাবার্ত্তা বল্‌তে চান না, কিন্তু অমিততেজস্বী শিষ্য এই অনিচ্ছুক গুরুদেবকে দিয়ে বক্তৃতা একটী দেওয়াবেনই, কারণ এমন সুদুর্ল্লভ বক্তাকে হাতের মুঠোতে পেয়ে বাগে না আনা কি বুদ্ধিমানের কার্য্য হবে? গুরু কি বারংবার বলেন নি, সত্যের জন্য তোমরা আমাকে অক্লেশে অস্বীকার ক'রো, আজ কি গুরুদেবের আদেশ-বলেই গুরুকে অস্বীকার করার সময় আসে নি? গুরুর প্রদত্ত স্বাধীনতাকে সঠিক উপলব্ধি কত্তে না পেরে, তাঁর আদেশের প্রকৃত মর্ম্মের বিরুদ্ধে কাজ ক'রে এরা নিজ নিজ সাধন-পথে কণ্টকারোপণ করে। এদের এই অহংপ্রমত্ত ভাবের দরুণ সাধনে মন বসে না, তাই সাধনোত্থ অমৃতের আস্বাদনে এদের দেরী হয়।

জ্ঞানী গুরু

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অবোধ শিষ্যরা যখন আত্মাহঙ্কারে স্ফীত হ'য়ে চারিদিকে গুরু-গৌরব কেবল লঙ্ঘন ক'রে ক'রে উল্লম্ফন কত্তে থাকে, জ্ঞানী গুরু তখন মনে করেন যে, এ সবই মায়ার খেলা, ক্ষণিকের ভেল্কিবাজী, দুদিন পরেই আর এই শ্মশানে এই প্রেতেরা থাক্‌বে না। অতএব প্রতীক্ষা কর, নীরবে কালপ্রতীক্ষা, এদের অন্যায়ের প্রতিবাদ ক'রে কোনো লাভ নেই।

কর্ম্মী গুরু

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কর্ম্মী গুরু তখন মনে মনে ভাবেন, যে যা কচ্ছে, সে তার ফলই পাবে, তার অতিরিক্ত কিছু পাবে না। গুরুদ্রোহী শিষ্যদের মনের খুশী মিটিয়ে চেঁচামেচি, লাফালাফি, দাবড়া-দাবড়ি কত্তে দাও, কর্ম্মের ফল যখন করায়ত্ত হবে, তখন সবাই আস্তে আস্তে চুপ মারবে। আমি কেন যাব এদের লাঠি নিয়ে তাড়া ক'রে নিজের কর্ম্ম ও কর্ম্মফল অকারণে বাড়াতে?

প্রেমিক গুরু

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রেমিক গুরু তখন মনে মনে ভাবেন, ওরা আমার বিরোধ কচ্ছে ব'লেই ত' ওদের কথা

আমার দিনের মধ্যে দশবার, বিশবার, পঁচিশ-পঞ্চাশ বার মনে হয়। যখনি ওদের কথা মনে হয়, স্নেহভারে আমার হৃদয় যেন ফলবতী দ্রাক্ষালতার মত অবনত হ'য়ে পড়ে। করুক না ওরা বিদ্রোহ, কিন্তু দ্রোহ ক'রে ক'রেও ত' আমারই কথা বারংবার বল্‌ছে ও শুনছে, ভাবছে ও ধ্যান কচ্ছে। কংস, রাবণ ও হিরণ্যকশিপু শত্রু-ভাবেই ত' ভগবানকে বারংবার স্মরণ ক'রেছে এবং স্মরণ মননের শুভফল অন্যের চেয়ে দ্রুততর পেয়েছে। গাল দিক আর লাঠি মারুক, ওরা আমাকেই স্মরণ কচ্ছে। জগতে শাশ্বত প্রেম ব'লে যে এক সুমহৎ বস্তু আছে, ওদের ব্যবহার তারই একটা বিপরীত মুখী ভঙ্গিমা মাত্র। ওরা আমার প্রাণ-প্রিয়তম, ওরা দীর্ঘজীবী হোক্।

ভদ্রলোক শ্রীশ্রীবাবামণির চরণে লুটাইয়া পড়িলেন। বলিলেন,—বাবামণি আমাকে দীক্ষা দিবেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—না, তোমার সময় হয়নি।

অদ্য বেলা একটা পনের মিনিটে এইডেড্ হাইস্কুলের দ্বিতীয় বক্তৃতা সুরু হইল। প্রথম দিনের ভাষণ এমনই হৃদয়গ্রাহী ও আকর্ষনীয় হইয়াছিল যে, ছাত্র এবং শিক্ষকেরা বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিয়া দ্বিতীয় দিনের বক্তৃতায় শ্রীশ্রীবাবামণিকে সম্মত করিয়াছেন। প্রথমে যৌগিক আসন-মুদ্রাদির বিস্তারিত প্রদর্শন ও তৎস্পর্কে বিশেষ উপদেশাদি হইল।

জীবনের সার্থকতা

বক্তৃতার উপসংহারীয় অংশে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—স্মরণ রেখো, জীবন তোমাকে দিয়েছেন ভগবান্। তুমি সেই জীবন ভগবানকে ফিরিয়ে দেবে। কলুষ-পঙ্কিল এবং ঘৃণিত ক'রে তারপরে নয়, জীবনকে পবিত্রতায় শুভ্র রেখে চন্দন-চর্চ্চিত টগর ফুলটীর মত ভগবানের পায়ে সমর্পণ কত্তে হবে। এই সমর্পণের কালে তোমার মন্ত্র হবে—"যথাভিসন্ধং কুরু কল্যাণম্"। অর্থাৎ হে প্রভো, আমার জীবনের এই চরম উৎসর্গ দিয়ে তুমি তোমার ইচ্ছামত আমার বা জগতের যে কুশল সাধন কত্তে চাও, তা' সম্পাদন কর। জীবন পাওয়ার উদ্দেশ্যই হচ্ছে জীবনকে দেওয়া। আত্মবিসর্জ্জনই জীবনের পরম সার্থকতা।

আত্মসমর্পণের বাধা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আত্মসমর্পণেই জীবনের চূড়ান্ত সফলতা কিন্তু আত্মসমর্পণের পথে কতকগুলি বাধা আছে। পরনিন্দা রুচি মানুষকে পরমুখী করে, এই জন্যই পরনিন্দকের ভিতরে আত্মসমর্পণের বিশুদ্ধ ভাব জাগে না। এই জন্যই সাধক-মাত্রকেই উপদেশ দিতে শুনা যায়,—পরনিন্দা বিষবৎ বর্জ্জন ক'রো। নিজের গুণপণা সম্বন্ধে সচেতনতা মানুষকে

উদ্ধত করে। ঔদ্ধত্য আত্মসমর্পণের বিপরীত ক্রিয়া। এই জন্যই সাধক-মাত্রকেই উপদেশ দিতে শুনা যায়,—নিজেকে তৃণের চেয়ে সুনীচ কর, তরুর চেয়ে সহিষ্ণু কর, অমানীকে মান দাও, নিজে মান লাভ করবার জন্য লালায়িত হ'য়ো না। ভক্ত না হ'য়েও ভক্তের প্রাপ্য সম্মান, দাতা না হ'য়ে দাতার প্রাপ্য যশ, জ্ঞানী না হ'য়েও জ্ঞানিজনের প্রাপ্য প্রতিষ্ঠা, বিদ্বান্ না হ'য়েও বিদ্বানের প্রাপ্য খাতিরটুকু পেলে কে না খুশী হয়? কিন্তু আত্ম-সমর্পণ-যোগী ভক্ত হ'য়েও ভক্তের সম্মান, দাতা হ'য়েও দাতার যশ, জ্ঞানী হ'য়েও জ্ঞানীর প্রতিষ্ঠা, বিদ্বান হ'য়েও বিদ্বানের খাতির চাইবেন না। বহু দিকে যার লক্ষ্য, তার আত্ম সমর্পণ আসে না। একলক্ষ্য হ'য়ে জীবনৈকনাথকে আত্মনিবেদন করা চাই। তবেই আত্মসমর্পণ আসে। এজন্যই সৎ-সঙ্গের প্রয়োজন। যাঁরা নিয়ত পরমেশ্বর-মুখী, তাঁদের দর্শনে, স্পর্শনে, স্মরণে, মননে মন আত্মসমর্পণের দিকে সহজে অগ্রসর হয়।

শ্রীহট্ট

২০শে মাঘ, রবিবার,১৩৪১

(৩রা ফেব্রুয়ারী,১৯৩৫)

প্রাতর্ভ্রমণও একটী যোগাঙ্গ

প্রাতর্ভ্রমণ-কালে একটী যুবক সঙ্গ লইয়াছেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রাতর্ভ্রমণ শুধু ভ্রমণই নয়। একেও একটা যোগাঙ্গ ব'লে জান্‌বে। মধ্য গতিতে পথ চল, অতি তীব্র বেগেও নয়, অতি মন্দ গতিতেও নয়। প্রতিটি পদক্ষেপ তালে তালে কর। প্রতিবার পদক্ষেপের সময়ে একবার ক'রে শ্রীভগবানের নাম স্মরণ কর। ভগবানকে জানো তোমার সর্ব্বাঙ্গব্যাপী ব'লে আর ভ্রমণ-কার্য্যকে ভগবৎ-সেবার একটী উপাঙ্গ ব'লে অনুভব করার চেষ্টা কত্তে থাক। জোর ক'রে এই চেষ্টা ক'রো না, জীবনটাকে ভগবন্ময় এবং ভগবানকে পরম প্রেমময় ব'লে ভাবতে ভাবতে তালে তালে পদচারণা কত্তে থাক্‌লে আপনা আপনি এই ভাবটী নিজের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হ'য়ে যাবে। এগুলি উপদেশের বিষয় নয়, এগুলি হচ্ছে অনুশীলনের বিষয়। একদিন দুইদিন তিনদিন অনুশীলন কত্তে কত্তে আপনা আপনি ভাবটা স্থায়ী ভাবে তোমার মনের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হ'য়ে যাবে।—এই জন্যই প্রাতর্ভ্রমণের সময়ে কথোপকথন বা তর্কাতর্কি বন্ধ রাখা খুব ভাল।

ভ্রমণ-কালে ভগবানের ধ্যানময় সঙ্গ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অনন্ত-কোটি-ব্রাহ্মাণ্ড-ব্যাপী পরমেশ্বর উর্দ্ধে, অধে, দক্ষিণে, বামে, সম্মুখে, পশ্চাতে

সকল দিকে সর্ব্বাবস্থায় রয়েছেন তোমাকে আবৃত ক'রে, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস রূপে তিনি নিয়ত তোমাকে সঙ্গ দিচ্ছেন তোমার জীবন রক্ষার ছলে, মৃত্তিকা-রূপে তিনিই প্রসারিত, তৃণ-রূপে তিনিই আস্তৃত, চন্দ্র-সূর্য্য-নক্ষত্রাদি-রূপে তিনিই উদ্‌ভাসিত, পিতামাতা ভ্রাতা-ভগিনী রূপে তিনিই স্নেহপ্রেম-ভালবাসায় উদ্‌বেলিত, তিনিই সব, সবই তিনি,—এই ভাবটীর ধ্যানময় সঙ্গ কত্তে কত্তে ভ্রমণ কর্ব্বে।

কতক্ষণ প্রাতর্ভ্রমণ করণীয়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—শরীর ক্লান্ত হবার আগেই ভ্রমণ সমাপ্ত কর্ব্বে এবং ভ্রমণের পরে কিছুকাল বিশ্রাম নেবে।

প্রাতর্ভ্রমণ শেষ হইয়া গেলে শ্রীশ্রীবাবামণি প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং কিছুকাল বিশ্রামান্তে স্নানাদি সারিলেন। যুবকটী বসিবার স্থানে বসিয়াই রহিল।

ঘণ্টাখানিক পরে শ্রীশ্রীবাবামণি বসিবার ঘরে আসিয়া দেখেন, যুবকটী তখনো বসিয়া। শ্রীশ্রীবাবামণি জিজ্ঞাসা করিলেন,—ব্যাপার কিহে?

যুবকটী বলিলেন,—সর্ব্বদাই আমার বড় অসুখ-বিসুখ হয়। এজন্য মন ভালো লাগে না এবং বসে বসে কাল কাটাতে ইচ্ছা হয়। আপনি আমাকে প্রতীকারের একটা সদুপায় বলে দিন।

দেহটীকে ভগবানের হাতে দাও

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দেহটার বিষয়ে এ ভাবে চিন্তা করাটা ছেড়ে দাও। তার চমৎকার উপায় হচ্ছে,—"আমার দেহ জগতের কল্যাণের জন্য তৈরী হোক্, হে পরমেশ্বর, তেমন ভাবে তুমি একে গড়ে নাও। আমার ক্ষমতা নেই দেহ-তরীর হাল ধরি। তুমি এসে হাল ধর এবং জীর্ণ-তরী দ্বারা জগতের যেখানে যে কল্যাণটুকু সম্ভব, সেইটুকু করিয়ে নাও।" অবিরাম দেহকে, দেহের দায়িত্বকে দেহের সুখ-দুঃখকে এভাবে ভগবানের চরণে অর্পণ কত্তে কত্তে তোমার দেহাত্ম বুদ্ধির বিনাশ হবে। দেহকেই আত্মা ব'লে ভাবছ, এটা তো তোমার আসল রোগ। দেহটা যদি ভগবানের হাতে জগতের কল্যাণের জন্য চলে যায়, তারপরে তোমার নিজস্ব যেটুকু অবশিষ্ট থাকে, সেইটুকুই হচ্ছে তোমার স্বরূপ।

যুবক।—এসব সূক্ষ্ম কথা আমার উপলব্ধিতে আসছে না।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—তা' ঠিক্। কিন্তু দেহের ভার ভগবানে সমর্পণ করার পরে তুমি তোমার বিদেহী সত্তাকে ভাল ক'রে টের পাবে, তখন এই কঠিন তত্ত্বও তোমার নিকটে সহজ হবে। এই মরণশীল ক্ষণস্থায়ী দেহ দুদিনের জন্য, আবার সেই দুটি দিনও নিতান্তই সীমাবদ্ধ কিন্তু তুমি ক্ষণস্থায়ীও নও,

নিতান্ত সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র একটী নশ্বর বস্তুও নও। দেহকে নিজে থেকে আল্‌গা ক'রে দেখার শ্রেষ্ঠ উপায়, জগৎকল্যাণকর্ম্মে এটীকে ভগবানের হাতে সঁপে দেওয়া। দেহকে আল্‌গা ক'রে দেখারও সুরু হ'ল কি তোমার স্বরূপ দর্শনও সুরু হ'ল বলে জান্‌বে। রোগ হয়েছে, চিকিৎসা করাও, কিন্তু দেহকে জগতের মঙ্গল-কর্ম্মে নিয়োজিত করে রাখতেই হবে।

মৃতদের সম্পর্কে চিন্তা

অপর একটী আগন্তুক বলিল,—আমার দিবারাত্রি মনটা ভারী বিষণ্ণ থাকে। চারিদিকে যে সকল আত্মীয়-স্বজন মারা গিয়েছেন, কেবল তাঁদের কথাই মনে আসে। এজন্য আমি মনে আর শান্তি পাই না। এই চিন্তাজাল থেকে উদ্ধার পাওয়ার আমার উপায় কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—উপায় অতি সহজ। তোমার যে সকল আত্মীয়, পরিজন বা পরিচিত ব্যক্তিরা গতাসু হয়েছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই একেবারে নির্গুণ পুরুষ বা গুণহীনা নারী ছিলেন না। কারো মনে ছিল দয়া, কারো প্রাণে ছিল মহত্ত্ব, কারো বা হৃদয়ে ছিল পরদুঃখ-কাতরতা। কেউ ছিলেন সাহসী, কেউ ছিলেন কর্ত্তব্য-পরায়ণ, কেউ ছিলেন পরোপকারী। পৃথিবীতে আমরা যা'-দিগকে একেবারে গুণহীন ব'লে মনে ক'রে থাকি, তাঁদের মধ্যেও এমন অনেক গুণ মাঝে মাঝে থাকতে দেখা যায়, যা' সাধারণতঃ দুর্ল্লভ। একটু খুঁজে সেই

সকল পুরুষ ও নারীর সদ্‌গুণগুলি বের ক'রে নাও। তারপরে মনকে সেই সকল সদ্‌গুণের উপরে কেন্দ্রীকৃত কর। "তাঁদের ভিতরে যে সকল সদ্‌গুণ অল্পপরিমাণে ছিল, সেই সকল সদ্‌গুণ অধিক রূপে আমার ভিতরে প্রকাশমান হোক্, তাঁদের ভিতরে যে সকল গুণ অধিক পরিমাণে ছিল, সেই সকল গুণ আমার ভিতরে অধিকাধিক পরিমাণে পরিস্ফুট হয়ে উঠুক",—এই ভাবে নিরন্তর চিন্তা কত্তে থাক। এভাবে চিন্তা কত্তে কত্তে তাঁদের সম্পর্কে তোমার মনের বিষাদময় ভাব দূর হ'য়ে যাবে এবং যেখানে কেবলই অন্ধকার দেখ্‌তে পাচ্ছিলে, সেখানে দূর-দিগন্তে নবস্ফুটন্ত আলোক দেখতে পাবে।

আগন্তুক।—তাঁদের মধ্যে এমনও কেউ কেউ ছিলেন, যাঁরা আমার নানা অহিত সম্পাদন করেছেন বা আমার প্রতি বৈর ভাব পোষণ কত্তেন। তাঁহাদের সম্পর্কেও কি ঐ একই কথা?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—হাঁ, প্রায় ঐ একই কথা বল্‌ব, তবে একটু প্রকারান্তরে। তাঁদের সম্পর্কে এইরূপ ভাববে, "তাঁরা আমার প্রতি যে বৈরাচরণ করেছেন বা অহিত সম্পাদনের চেষ্টা করেছেন, হয়ত তার পশ্চাতে তাঁদের কোনও নিগূঢ় সদভিসন্ধি ছিল, যা' আমার জানা ছিল না। অথবা তাঁরা তাঁদের নিজ বিচারে যে বিভ্রমে পতিত হয়েছেন, তার অবশ্যম্ভাবী এবং অনতিক্রমণীয় কোনও কারণ ছিল। সুতরাং তাঁরা আমার প্রতি অন্যায় বা অন্যায্য যে ব্যবহার বা চিন্তাই

ক'রে থাকুন, আমি সে সব নিয়ে মাথা ঘামাব না। কিন্তু আমার প্রতি তাঁদের আচরণ যাতে তাঁদের অনন্ত কল্যাণের বিঘ্নস্বরূপ হ'য়ে না থাকে, এজন্য আমি ভগবানের কাছে তাঁদের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা কর্ব্ব।"—এ ভাবে ভাবতে ভাবতে মনের তিক্ততা, বিরসতা, অস্থিরতা কমে যাবে এবং দেখ্‌তে পাবে যে, আস্তে আস্তে তুমি বিমল শান্তির অধিকারী হয়েছ। মৃতদের সম্পর্কে যখন চিন্তা আসবে, তখন ভাব্‌তে থাকবে যে, এই পার্থিব দেহে আজ তাঁরা থাক্‌লে যে যে কামনা, যে যে বাসনা যে ভাবে চরিতার্থ কর্ব্বার জন্য চেষ্টা কত্তে পাত্তেন, দেহ না থাকায়, সে সামর্থ্য থেকে তাঁরা বঞ্চিত। সুতরাং তারা যদি তোমার প্রতি কোনও অন্যায় বা অধর্ম্ম ক'রেও থাকেন, তবু তুমি তাঁদের আর দোষ ধর্ব্বে না।

অপরাহ্ণ চারিটা হইতে সাতটা পর্য্যন্ত শ্রীহট্টের শ্রীশ্রীনিম্বার্ক আশ্রমে শ্রীশ্রীবাবামণির বক্তৃতা হইবে। যথাকালে সভাস্থলে পৌঁছিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি দেখিতে পাইলেন যে, সভাস্থল আগ্রহী জনতার ভিড়ে কাণায় কাণায় পরিপূর্ণ। আশ্রমাধ্যক্ষ সাধু মহারাজ স্বগণে পুষ্পপাত্র, ধুপ-দীপ প্রভৃতি লইয়া সম্বর্দ্ধনার জন্য ছুটিয়া আসিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি কাতর-ভাবে বলিতে লাগিলেন,—আমি তুচ্ছাতিতুচ্ছ অতি সাধারণ একটী লোক। করজোড়ে নিবেদন করি, আমাকে নিয়ে ব্যস্ত

হবেন না। যাঁর পূজার জন্য জীবন সমর্পণ ক'রেছেন, ধুপদীপে তাঁরই করুন আরতি, তাঁরই নামে দিন জয়ধ্বনি।

আশ্রমাধ্যক্ষ সাধু মহারাজ গলদশ্রু-নয়নে অর্দ্ধব্যক্ত ভাষায় আনন্দ প্রকাশ করিতে করিতে শ্রীশ্রীবাবামণির গলদেশে পুষ্পমাল্য পরাইয়া দিলেন।

অনন্ত কোটি প্রণাম

শ্রীশ্রীবাবামণি বক্তৃতারম্ভ করিলেন। বলিলেন,—অতীতে যাঁরা কোটি কোটি মানব-সন্তানের মধ্যে অন্ততঃ একটী বা দুইটীকেও সুপাত্র জেনে অন্তরের দারুণ পিপাসার সময়ে নিজ নিজ স্বর্ণ-ভৃঙ্গার থেকে ভগবন্নামের অমৃতবারি এক বিন্দু হ'লেও দান ক'রে জীবহিত সম্পাদন করেছেন, তাঁদের চরণে আমার অনন্ত কোটি প্রণাম। আর অতীতে যাঁরা তপস্যার সপ্তসিন্ধু মন্থন ক'রে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানবসন্তানকে অনন্ত পিপাসার পরিতৃপ্তির জন্যে অকাতরে এবং পাত্রাপাত্র-বিচার না ক'রে অকুণ্ঠিত মনে দ্বিধাহীন চিত্তে নিজেদের জীবনের সমস্ত তপোলব্ধ সঞ্চয় অকাতরে বিলিয়ে দিয়ে গেছেন, তাঁদের চরণে আমার অনন্ত কোটি প্রণাম। আমি তাঁদের প্রণাম না কর্ল্লে তাঁদের কিছু যায় আসে না কিন্তু তাঁরা আমার প্রণাম না নিলে আমার জীবন ব্যর্থ হয়। একদা যে তাঁরা এসেছিলেন এই ধূলার ধরণীতে গড়াগড়ি

দিয়ে ধূলারাশিকে সোণার খনিতে পরিণত কত্তে, এটা মানুষ জাতির পরম গৌরব, মনুষ্যকুলের অতুল শ্লাঘা। তাঁরা এক এক বার ক'রে এসেছেন আর জীব-কুলকে আশ্বাস-বাণী শুনিয়ে গেছেন,—"আবার আসব, আবার আসব, যতকাল সর্ব্বজীবের না উদ্ধার হয়, যতকাল জন্মমৃত্যুর প্রবাহ সচল থাকে, ততকাল আসব দুঃখীর দুঃখ বিদূরণের জন্য, পাপীর পাপ অপনোদনের জন্য, তাপীর তাপ অপহরণের জন্য, ততকাল আসব ব্যথারাশি মুছে দেবার জন্য।" বলেছেন তাঁরা,—"আস্‌ব না রে তোদের পূজা পাওয়ার লোভে, আসব তোদের প্রতিজনকে নিজের উপাস্য দেবতা জ্ঞানে সেবা দিয়ে, স্নেহ দিয়ে, প্রেম দিয়ে, ত্যাগ দিয়ে, জ্ঞান দিয়ে, কর্ম্ম দিয়ে পূজা ক'রে কৃতকৃতার্থ হবার জন্য।" যাঁদের এই প্রতিশ্রুতি-বাক্য অসংখ্য তাপ-তাড়িতের দগ্ধ হৃদয়ে শান্তির প্রলেপ দিয়েছে, তাঁদের প্রতিজনের চরণে আমার অবিমিশ্র-ভক্তি-প্রসূত অনন্ত কোটি প্রণাম।

ভালবাসাই ব্রহ্ম

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মানুষ মানুষকে ভালবাসে, সে কেবল স্বার্থের তাগিদেই নয়, ভালবাসে স্বভাবের প্রেরণায়। এই ভালবাসা কেবল মানুষের গৌরব করার বস্তু নয়, এ ভালবাসার অধিকারী সরীসৃপ, পশুপক্ষী, বৃক্ষলতা, এমনকি কীটপতঙ্গ প্রভৃতি সকলে। তাদের অন্তরের সেই সুপ্ত ভালবাসা

আমাদের মোটা চোখে এখনো ধরা পড়ে নি, এটা তাদের দোষ নয়, আমাদের দৃষ্টিশক্তিরই দোষ। অনন্ত ভালবাসার আবেষ্টনে নিজেকে জড়িয়ে রেখে প্রত্যেকটী অণু-পরমাণু নিজ নিজ স্বভাবদত্ত শক্তি অনুযায়ী আবর্ত্তিত, বিবর্ত্তিত, পরিবর্ত্তিত, সম্বর্ত্তিত, ও পরিণমিত হচ্ছে। এ সবই বিশ্বতোব্যাপ্ত ও বিশ্বাত্মস্থ ভালবাসারই অনির্ব্বচনীয় লীলা। এই ভালবাসাকেই শাস্ত্রীয় ভাষায় বলা হয়েছে ব্রহ্ম। এই ভালবাসার আদি নেই, অন্ত নেই, মৃত্যু নেই, এ ভালবাসা অনাদি ও অফুরন্ত।

ভালবাসাই ধর্ম্ম

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এ ভালবাসা নিজের স্বভাবগুণেই আদি মানবের কাছে ধর্ম্ম-রূপে ধরা দিয়েছিলেন। আদি গুরু নিজ শিষ্যকুলকে এই ভালবাসার শিক্ষাদান ক'রেছিলেন। শিষ্যরা শিক্ষা দিয়েছিলেন প্রশিষ্যদের। এ ভালবাসা পরবর্ত্তী যুগেরও অনেক মানুষের কাছে ধরা দিয়েছিলেন ধর্ম্মরূপে এবং তাঁদের অনেকে দেশকালপাত্র দ্বারা পরিচ্ছিন্ন, খণ্ডিত ও সীমাবদ্ধ সংস্কারের নাগপাশ থেকে ধর্ম্মকে মুক্ত ক'রে উদারতর প্রান্তরে এনে হাজির ক'রে দিয়েছিলেন। এভাবেই যুগে যুগে ধর্ম্মসংস্কারকদের আবির্ভাব ঘটেছে। এ ঘটনা বারংবার ঘটেছে এবং বারংবার

ঘটবে। এটাকে প্রতিরুদ্ধ করবার ক্ষমতা জগতে কারোর নেই এবং কদাচ কারোর হবেও না। ধর্ম্ম নিজ স্বভাবেই মানবের অন্তরে বারংবার ভালবাসা রূপে ধরা দেবেন এবং মানুষকে তাঁর অনুবর্ত্তী ক'রে নেবেন। ভালবাসা যে ধর্ম্মের একটা প্রধান লক্ষণ, শুধু তাই নয়, পরন্তু ভালবাসা ধর্ম্মেরই স্বরূপ, ধর্ম্ম আর ভালবাসা অভিন্ন অদ্বয় বস্তু।

ধর্ম্মের বিপদ-গহ্বর সঙ্কীর্ণতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বলা হয়, ধর্ম্ম একটা নেশা। নিশ্চয়ই নেশা। কারণ, ভালবাসার মত নেশা জগতে দ্বিতীয় আর কি থাক্‌তে পারে? কিন্তু ধর্ম্ম মদ, গাঁজা, ভাং, চরশের মতন বা জুয়াখেলার মত নয়,—যার কুফল প্রত্যক্ষ এবং নৈতিক ও মানসিক কুফল অবর্ণনীয়। ধর্ম্ম ভালবাসার নেশা। এর একটীমাত্র বিপদ গহ্বর আছে, সেইটী হচ্ছে সঙ্কীর্ণতার। ভালবাসাকে যত সঙ্কীর্ণ ক'রে চর্চ্চা করা যাবে, ততই তা' ক্ষতিকর হ'য়ে দাঁড়াবে। ভালবাসাকে বিশ্বতোব্যাপী ক'রে চর্চ্চা কত্তে পারলে তাতে আর কোনো বিপদ নেই। এজন্যই প্রাচীন ঋষি ব্রহ্মতত্ত্ব বলতে বসে বারংবারই উচ্চারণ ক'রেছেন, নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখম্। ভূমাতে ভালবাসাকে লগ্ন করাই ধর্ম্ম, ভূমাতে ভালবাসাকে লয় করার নামই ব্রহ্মদর্শন এবং ব্রহ্মদর্শনই জীবের একমাত্র কাম্য, ব্রহ্ম-দর্শনই জীবের আত্যন্তিক দুঃখের নিবারক।

ধর্ম্ম মানুষের স্বভাব-সংস্কার

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ধর্ম্মকে উপলক্ষ্য ক'রে অনেকে নিজেদের ভোগাকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি ক'রেছে, সাধারণ লোককে ধোঁকা দিয়ে অপথে বিপথে চালিয়েছে, এসব অভিযোগ একেবারে মিথ্যা নয়। কিন্তু ধর্ম্মধ্বজী ধর্ম্মের এভাবে অপমান করেছে বলেই ধর্ম্ম দোষী সাব্যস্ত হতে পারেন না। ধর্ম্ম মানুষের স্বভাব-সংস্কার। এই স্বভাব-সংস্কার আছে বলেই ত' এক মানুষ অপর মানুষের প্রতি সুবিচার, সদ্ব্যবহার ও সৌজন্য কত্তে আগ্রহী হয়। মানুষকে মানুষের শত্রু না ক'রে ধর্ম্ম চিরকাল মানুষকে মানুষের বন্ধু কত্তে প্রয়াসী হয়েছে। এই প্রয়াসটা মানুষের স্বভাব-সঞ্জাত প্রবৃত্তি থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। মানুষ যে মানুষকে আত্মীয় কত্তে চেয়েছে, সেটা স্বার্থের প্ররোচনায় নয়, ধর্ম্মেরই প্রেরণায়। ধর্ম্ম মানুষের মনকে স্বার্থ উল্লঙ্ঘন ক'রে আরও দূরে বিস্তারিত হবার সহায়তা করেছে, একক ব্যক্তিত্বকে দিয়েছে পরিবারের রূপ, পরিবারকে দিয়েছে সমাজের রূপ, সমাজকে দিয়েছে দেশব্যাপী প্রেম বন্ধনের রূপ, স্বদেশপ্রেমকে দিয়েছে বিশ্বপ্রেমের অপরূপ শিক্ষা। এক ধর্ম্মেরই এগুলি ক্রমবিস্তারিত বিকাশ। মানুষের মানব-হিতৈষণা ধর্ম্মেরই অনবদ্য অবদান।

ব্রহ্ম ও সৃষ্টি অনাদি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ধর্ম্মকে অনাবশ্যক জঞ্জাল জ্ঞান

ক'রে একে জগৎ থেকে নির্ব্বাসিত করার চেষ্টা হয়ত হ'লে হ'তে পারে। পৃথিবীব্যাপী মানব-মতামতের গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করলে ধর্ম্মের বিরুদ্ধে এই এক বিরাট বিদ্রোহের সৃষ্টিকে অসম্ভাবিত ব'লে মনে করা যায় না। পশ্চিমের আকাশে যে দিনের পর দিন প্রচুর মেঘাড়ম্বর জমতে দেখা যাচ্ছে, তাতে কোনো ভুল নেই। সেই মেঘ পূর্ব্বগগনকেও আচ্ছন্ন করতে পারে। প্রবল গর্জ্জন, বর্ষণ, ঝঞ্ঝাবাত্যা ও লোকক্ষয় অসম্ভাবিত নয়। হয়ত সেই নিদারুণ ঝঞ্ঝাবর্ত্তে লক্ষ লক্ষ প্রাচীন সংস্কার ও প্রাচীন মন্দির ধূলিসাৎ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু মানুষের স্বভাব-সংস্কারে স্বাভাবিক প্রয়োজন-রূপে যে ধর্ম্ম সৃষ্টির আদি থেকে লগ্ন হয়ে রয়েছে, তারও ত' বিনাশ নেই! তার পুনঃপ্রকাশ হবেই হবে এবং যা' নিত্য, যা' সত্য, যা' সনাতন, যা' শাশ্বত, তা' নিজেরই প্রতাপে, স্বমহিমায় জগতে নিত্য বিরাজমান থাকবে। বলা হয়েছে যে, খণ্ডপ্রলয়ের পরেও আবার সৃষ্টি হয়, মহাপ্রলয়ের পরেও আবার সৃষ্টি হয়, প্রলয়ের মধ্যেই সৃষ্টির বীজ লুকিয়ে থাকে, কারণ ব্রহ্ম যেমন অনাদি, সৃষ্টিও তেমন অনাদি ও নিরবধি।

ব্রহ্ম স্বরাট্

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যে পরমসত্য ব্রহ্ম-রূপে মানুষের বুকে বুকে অতি সঙ্গোপনে বিরাজ কচ্ছেন, অথচ যাঁকে ধরা-ছোঁয়া যায় না ব'লে যিনি চির-রহস্যময়, মানুষের

কবি-প্রকৃতি তাঁকে কখনো নিজের সহিত অভিন্ন, কখনো নিজ থেকে বিভিন্ন, কখনো এই-ভিন্ন এই-অভিন্ন, এইরূপ নানা বিচিত্র সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে আস্বাদন কচ্ছে। এই সম্বন্ধের বিষয় চিন্তা করলে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হতে হয়, আবার চিন্তা ক'রে ক'রেও থই পাওয়া যায় না। তিনি নিজের বলেই আমাদের চিরকালের পরম-শরণ হ'য়ে থাক্‌বেন। তাঁকে রক্ষা করার জন্য সৈন্যদল, আন্দোলন, তর্কযুদ্ধ বা ষড়যন্ত্রের কোনও প্রয়োজন নেই। যে সত্য জগতে নিজের অধিকারে রাজত্ব করে, তাকে কেউ সিংহাসন-চ্যুত কত্তে পারে না। যার সিংহাসন-লাভের জন্য নানা জনের নানা সহায়তার প্রয়োজন, তার সিংহাসন আজ আছে ত' কাল নাও থাক্‌তে পারে। ব্রহ্ম কেবল সম্রাটই নন, তিনি স্বরাট্।

বক্তৃতা পূর্ণ তিন ঘণ্টাকাল চলিল।

শ্রীহট্ট

২১শে মাঘ, সোমবার, ১৩৪১

(৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৫)

অদ্যই শ্রীশ্রীবাবামণির শ্রীহট্টে অবস্থানের শেষ দিন। রাত্রিকালেই তিনি ষ্টেশানে গিয়া ট্রেণে বিশ্রাম করিবেন এবং পরদিন প্রাতে পাথরকান্দি পৌছিবেন।

বালক, যুবক, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ বহু বয়সের বহু দর্শনার্থী একের পর এক অদ্য আসিতেছেন। পুঞ্জীকৃত চিঠিপত্রের

জবাব দিবার ফাঁকে ফাঁকে শ্রীশ্রীবাবামণি যাহার যেমন জিজ্ঞাস্য, তাঁহাকে তেমন জবাব দিতেছেন।

জোর করিয়া প্রতিশ্রুতি আদায়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জোর ক'রে কারো কাছ থেকে কোনো প্রতিশ্রুতি আদায় ক'রো না। কেননা, রুচিপ্রদ না হ'লে প্রথম সুযোগেই প্রতিশ্রুতিদাতা নিজ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে। মনে কর দশ জনে মিলে ষড়যন্ত্র ক'রে একটী লোককে ফাঁদে ফেলেছ। প্রতিবাদে বা প্রতীকারে অশক্ত হ'য়ে নিতান্তই দায়ে পড়ে সে তোমাদের কাছে অসঙ্গত এক প্রতিশ্রুতি দান করেছে। তোমরা নিজেদের আচরণকে যতই ধর্ম্মোপেত ব'লে জ্ঞান ক'রে থাক না কেন, তার দৃষ্টিতে তোমরা পরম অধর্ম্মচারী অসৎ ব্যক্তি। সরল পথে চল্‌লে তার কাছ থেকে যা' অতি সহজে তোমরা লাভ কত্তে পাত্তে, কুটিল পথে চলার ফলে তার চার ভাগের এক ভাগ ত্যাগ স্বীকার কত্তেও তার মন কুণ্ঠিত। তবু সে শাণিত খড়্গের সম্মুখে পড়ে তোমাদিগকে কোনও বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। দায়ে পড়ে, বাধ্য হয়ে, অনিচ্ছায় সে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তার সম্পর্কে তার মনোভাব নিশ্চয়ই খুব সুপ্রসন্ন হ'তে পারে না। সে নিশ্চিতই মনে কত্তে থাকবে যে, এ প্রতিশ্রুতি পালন কত্তে সে ধর্ম্মত বাধ্য নয়। মনে কর, সংখ্যার শক্তিতে

অভিভূত ক'রে অসন্দিগ্ধ-চেতা অসতর্ক পথিককে দিয়ে তোমরা প্রতিশ্রুতি করিয়ে নিয়েছ যে, সে তোমাদিগকে এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দেবে। প্রাণ বাঁচাবার দায়ে,—কোনও ধর্ম্মবুদ্ধিতে নয়, কোনও দানশীলতার সাত্ত্বিক প্রেরণায় নয়, কোনোও পরোপকার বুদ্ধিতে নয়,—নিছক নিজেকে অপঘাত থেকে রক্ষা করার জন্য সে সেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এমন অবস্থায় ঘরে ফিরে নিরাপদ হওয়ার পরেও সে প্রতিশ্রুতি-আদায়কারীদের প্রতি সত্যরক্ষার চেষ্টা কর্ব্বেই কর্ব্বে, এমন কথা বলা যায় না। তার মনে একথা জাগতে পারে যে, এ ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি রক্ষা ধর্ম্ম নয়, অধর্ম্ম। তার মনে এ যুক্তি আসতে পারে যে, ছলে বলে লোককে প্রতিশ্রুতি-বদ্ধ কত্তে পারলেই হ'ল না, এ প্রতিশ্রুতি সত্যের বাড়ীর ধার কাছ দিয়েও চলে না। এরূপ প্রতিশ্রুতি অনেক সময়ে চোর-ডাকাতেরা আদায় করে, সৎ লোকেরা নয়। মঠ, আশ্রম মন্দির গড়্‌বার জন্য যে সকল সাধুবেশধারী চাঁদা-আদায়-কারীরা গৃহস্থদের গৃহে গিয়ে ভবিষ্যতের নানা অমঙ্গলের আশঙ্কা প্রদর্শন ক'রে বা অভিসম্পাতের ভয় দেখিয়ে টাকার প্রতিশ্রুতি আদায় করেন, তাঁদের নিকটে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি কেউ রক্ষা করে না। ক্লাব, সমিতি, সম্মিলনী প্রভৃতির নামে চাঁদা আদায় কত্তে গিয়েও দু-একস্থানে এরূপ ব্যাপার হয়ত হয়। কোনও অবস্থাতেই বলপূর্ব্বক মানুষকে কোনও প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ করা সঙ্গত নয়।

মানুষকে দেবতা জ্ঞান কর

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মানুষকে মূলতঃ স্বার্থপর ও কৃপণ ব'লে মনে করা ভুল। আর, বলপূর্ব্বক ধন কেড়ে নিয়ে কারো মনের পরিবর্ত্তন সাধন করা যাবে, এই কথাটাও ভুল। একদল লোক যতই স্বার্থপর থাকুক, আদর্শের আলোক মানুষের মনের অন্ধকার কোণগুলিতে বিলিয়ে দিতে পারলে অধিকাংশ মানুষেরই স্বার্থবুদ্ধি কমান যায়। ত্যাগবুদ্ধি দিয়েই মানুষ মহৎ, অপরকে দাসত্ব-শৃঙ্খলে বাঁধার শক্তি দিয়ে নয়। পরের জন্য নিজের স্বার্থকে কমিয়ে দেবার চেষ্টার মধ্যেই প্রকৃত মানুষের আসল মহিমা, অন্যকে বঞ্চিত ক'রে সকল ভোগোপকরণ নিজের সুখের জন্য জড় করার চেষ্টা মানুষের কোনও মহত্ত্বেরও পরিচায়ক নয়, কোনও বৃহত্ত্বেরও বাহক নয়। মানুষকে শৃগাল-কুক্কুর মাত্র জ্ঞান না ক'রে দেবতা ব'লে জ্ঞান কর এবং যত ভাবে পার তার সুপ্ত দেবত্বকে জাগিয়ে তোলার জন্য বারংবার তার প্রাণের দুয়ারে প্রেমময় করাঘাত কর। ঘুমন্ত মানুষ একদা নিশ্চয়ই জাগ্‌বে, চিরনিদ্রা ত' মৃত্যু, চিরকাল সে নিদ্রাভিভূত হ'য়ে থাক্‌তে পারে না।

সহায়ক পাইবার পন্থা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোমরা সৎকার্য্য কত্তে চাচ্ছ। বেশ কথা। এটাই তোমাদের যোগ্য কথা। নিজেদের কাজ

নিজেরা ক'রে যাও। সৎকার্য্য কথাটার মানেই হচ্ছে, হয় ভগবানের সেবা নয় জন-সমাজের সেবা। অকৃত্রিম ভগবৎ-সেবা সর্ব্বস্থলেই জনসেবার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহায়ক হয়। অকৃত্রিম জন-সেবাও তদ্রূপ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ-ভাবে ভগবৎ-সেবার সংবর্দ্ধক হয়। সুতরাং কাজটী তোমার যাই হোক্, অকপট চিত্তে ক'রে যাও, মনঃপ্রাণ দিয়ে তাতে লগ্ন হও। এর ফলে বিনা প্রতিশ্রুতিতেই লোকে এসে তোমাদিগকে, যার যা' সাহায্য করবার, ক'রে যাবে। সেবার যদি কারো ক্ষমতা থাকে, আর তার সেবা পাওয়ার যদি তোমার প্রয়োজন পড়ে থাকে, তবে ফাঁক, ফন্দী, কৌশল ক'রে তাকে আনতে হবে না, তোমার অন্তরের অকপট সেবা প্রবৃত্তির টানেই সে এসে যাবে। অন্তরে কি তোমার বিশুদ্ধ ভালবাসা জন্মেছে? মানুষকে কি ভাবে প্রেম কত্তে হয়, তা কি সত্য সত্য জেনেছ? নিজের বুদ্ধির বাহাদুরী এবং কৃতিত্বের অহমিকাকে কি ভাবে বিসর্জ্জন দিতে হয়, তা' কি শিখেছ? নিজের কূট-কৌশলের শক্তি অপেক্ষা অন্তরের অকপট সরলতার যে শক্তি বেশী, তা' কি তুমি বিশ্বাস কত্তে পেরেছ? যদি তা ক'রে থাক, তাহ'লে কারো উপরেই তোমাকে জোর খাটাতে হবে না। যার দান, যার ত্যাগ, যার শ্রম, যার সেবা তোমার কার্য্যের পক্ষে সত্যই অপরিহার্য্য, সে নিশ্চিত এসে অবিলম্বে তোমার হাতে তার হাত মিলাবে, তোমার কাঁধে তার কাঁধ মিশাবে, তোমার কাজে যোগ দেবে। জমিদার-বাড়ীর একটা

তুচ্ছ দ্বারবানের ভিতরেও সাম্রাজ্যের অধীশ্বরের চেয়ে অধিক দম্ভ দেখতে পাওয়া যায়। তোমার ভিতরেও হয়ত সেই দম্ভ অতি গোপনে লুকিয়ে আছে। সেই দম্ভ তুমি দূর কর। অপরে এসে তোমার কাজে সহযোগ দিতে কেন বাধ্য হবে, তার হিসাব আগে নাও। তুমি যে অপরকে এনে তোমার ইচ্ছানুযায়ী ভাবে তোমার কাজে লগ্ন দেখ্‌তে চাও, তোমার এই ইচ্ছা তোমার আভ্যন্তরীণ ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে কতটুকু সঙ্গতি রক্ষা ক'রে চল্‌ছে, তার আগে নিকাষ দেখ। চাইলেই কেউ এসে তোমার ইচ্ছানুসারে চলবে না, অপরকে তোমার কাজে লাগাবার তোমার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক কি অধিকার জন্মেছে, তার আগে যুক্তিযুক্ততা খুঁজে বের কর।

পুরাতন পয়ার

শ্রীশ্রীবাবামণি বৎসর পনের পূর্ব্বে পয়ার ছন্দে কতকগুলি কবিতা লিখিয়াছিলেন। নানা জনের পত্রের উত্তরদান-প্রসঙ্গে এইগুলি প্রেরিত হইয়াছিল। কুমিল্লা ও নোয়াখালী জেলার অন্তর্গত কোনও কোনও স্থানের শিষ্যদের একান্ত আগ্রহে ঐ ছোট ছোট পয়ারগুলি একত্র সংগ্রথিত হইয়াছে এবং তাহার দ্বাদশটী অনুলিপি তৈরী হইয়াছে। এই অনুলিপি-সমূহ অদ্য রেজেষ্টারী ডাকে বিভিন্ন স্থানে প্রেরিত হইবে। নিম্নে সেই পয়ার-সমূহ সংগ্রথিত হইল।

নাম সুমঙ্গল-বাহী

কল্যাণ যে চাহে, তার নিশ্চিত কল্যাণ;
যে না চাহে, সেও পায় বিধাতার দান।
ভগবানে সত্য বলি' জানিলে জীবনে
সাধক নিমেষে ছিঁড়ে সকল বন্ধনে।
মুক্ত পন্থা সম্মুখেতে প্রসারিত যার,
সেও করে বটে কভু সত্য অস্বীকার;
কিন্তু যদি সত্য আসে যথার্থ স্বরূপে,
নিশ্চিত প্রতিষ্ঠা তার কোটি ধূপ-দীপে।।
নাম সুমঙ্গল-বাহী, অমৃতের খনি,
অসিদ্ধেরে সিদ্ধ করে, নির্ধনেরে ধনী,
মৃতেরে জীবন দেয়, হতাশেরে আশা,
অবমান-হত জনে দেয় ভালবাসা,
মুর্খেরে পণ্ডিত করে, দুর্ব্বলে সবল,
অশান্তেরে শান্ত করে, অচলে সচল,
অসম্ভবে সম্ভবায় অদৃশ্য-দর্শনে,
ধন্য করে নবজন্ম বিদেহি-স্পর্শনে।
জগতের যত শুভ লভিছে পরাণ
নামে যথা জীবকূল করে আত্মদান।
নামের সাধন যবে প্রাণমনোময়,
তখনি জীবের মধ্যে শিবের উদয়।

বাল্য বলি বয়সের উপেক্ষা ক'রো না

বাল্য বলি' বয়সেরে উপেক্ষা ক'রো না,
বাল্যেই করিতে হবে ব্রহ্মের সাধনা।
কোমল থাকিতে মাটি গঠন সম্ভব,
কঠিন হইলে চেষ্টা মানে পরাভব।
নাম গুণে নবজন্ম বিকশিত হয়,
কিন্তু অবিচ্ছেদ নাম কয়জনে লয়?
বৃদ্ধেরো আসিতে পারে নামেতে যৌবন,
অবিচল নিষ্ঠা নহে সুলভ কখন!
বাল্যে যদি কর চাষ মহানাম-বীজে,
সুসাধ্য দমন করা দুষ্ট মনসিজে।
বাল্যে করি' খেলাধূলা, যৌবনে লম্পট,
সমগ্র জীবন ভরি' রহি' ধূর্ত্ত শঠ,
শত গ্রন্থ অধ্যয়নে, লক্ষ মুদ্রা লাভে
কি হইবে ফল? সব বৃথা হ'য়ে যাবে।
নাম ভু'লে আছ যদি, বিদ্যা ত' মূর্খতা।
ব্রহ্মনিষ্ঠা বিনা ধন, সে ত' দরিদ্রতা!
নিখিল বিদ্যার শ্রেষ্ঠ নাম সুমঙ্গল,
সকল অর্থের অর্থ, সম্পদ সফল,
নাম যে দুঃখের মুক্তি, অগতির গতি,

বালবৃদ্ধ সকলের রাখো তাতে মতি।
জাগিয়া নামের মহা রুদ্র-হুহুঙ্কারে
ভৈরব গর্জ্জনে তার জাগাও সবারে,
মানুষ মানুষ হোক্ তপস্যার বলে,
বীর্য্যবান্ তেজোবন্ত হোক্ অবহেলে।

বাল্যে যদি নাহি পাও নাম-মধু-রস
পাবে কি যৌবনে হ'লে বাসনার বশ?
বার্দ্ধক্যে সকল শক্তি হ'লে সঙ্কুচিত,
তখন হবে কি নাম-পদ্ম প্রস্ফুটিত?
যে ফুল ফুটিল এই প্রথম প্রভাতে
তার মধুগন্ধ-লোভে চিত্ত মোর মাতে ;
রজনীর অন্ধকারে ফোটে কি না ফোটে,
কে তা জানে? ফুটিলেও অলি নাহি জোটে।
যে বিকাশে জগতের নাহিক উল্লাস,
কে বলে বিকাশ তাহা?—রুক্ষ পরিহাস।
বালকের কমকণ্ঠে শুনি' মহানাম
তুচ্ছ মোর মনে লয় নিত্য-মোক্ষ ধাম।

যুবকের দৃঢ় দেহ জগত-কল্যাণে
দেখিলে সার্থক ভাবি মম দুনয়নে।
বৃদ্ধকালে কে আসিয়া কি করে কে জানে?
সে আসায় লুব্ধ হ'তে মন নাহি মানে।

কামসেবা করি' যার জীর্ণ দেহ-মন,
নামসেবা কি করিবে?—সম্মুখে মরণ।
তার আশা ছাড়ি' দাও, প্রথম কৈশোরে
শক্ত ক'রি আঁট সব কৌপীনের ডোরে ;
সর্ব্বকর্ম্মে সর্ব্বভাবে সাধ মহানাম,
বিশ্বময় হবে দেখো বৃন্দাবন-ধাম।।

যথার্থ ব্রাহ্মণ

জগত-কল্যাণে যারা করে আত্মদান,
যথার্থ ব্রাহ্মণ বলি' করিব সম্মান।
পরার্থে না করে ত্যাগ যজ্ঞসূত্র ধরে,
মানুষ বলিয়া তারে কে গণনা করে?
হিংসা-নিন্দা-দ্বেষ-জয়ী চণ্ডাল-সন্তান
পরার্থে জীবন দিয়া ব্রাহ্মণ-প্রধান ;
তার পদধূলি লাভে জীবন জুড়িয়া
নিত্য শান্তি পরা বিদ্যা উঠিবে স্ফুরিয়া।
কিন্তু জেনো আত্মদান নহে তুচ্ছ কথা,
নামের সহায় চাই, নগতিরন্যথা।
নামের নির্ভর ছাড়া কল্যাণ-প্রয়াস
প্রত্যহ রচনা করে অকল্যাণ-পাশ।
"কোথা মুক্তি, কোথা মুক্তি" কর হাহাকার,
সাধন বিহনে মুক্তি হবে কোথা কার?

সাধন-সহায় নাম জগতে অতুল,
বাসনা-বীজাণু-রাশি করিবে নির্ম্মূল।
নামেতে জাগিলে চিত্ত বন্ধনের রাশি
তপস্যা অনল-তাপে পুড়ে যাবে খসি'
তখন হইবে মৃত্যু তুচ্ছ অতিশয়
অগ্রাহ্য হইবে লক্ষ বিপদ-নিচয়।

সার্থক মনুষ্য-জন্ম ব্রাহ্মণত্ব লাভে,
অসার্থক কুলীনত্ব ইহার অভাবে।
চণ্ডাল, মেথর কিম্বা পারিয়া, চামার,
ইহা লাভে সকলের সম অধিকার।
যে করিবে যত ত্যাগ লক্ষ্য লাভ তরে,
প্রত্যহ উন্নতি তত উচ্চতর স্তরে।
উচ্চ বংশে জন্মি' যদি না কর সাধন,
বংশ-মর্য্যাদার দম্ভ মিথ্যা—অকারণ।
কে করিবে পূজা বল তপস্যা-বিহীনে?
কে মানিবে তারে, যার ক্ষয় দিনে দিনে?
অধর্ম্ম আশ্রয় যার, চাতুর্য্য ভরসা,
চখে ধূলিক্ষেপ যার শাশ্বত ব্যবসা,
বচন-বাহুল্যে আর টিকির দাপটে
ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা তার হাস্যকর বটে।

প্রতিষ্ঠা লাভের আশে তপস্যা করিলে
নিশ্চিত জগত-মধ্যে যশোমান মিলে।

কিন্তু ইহা ব্রাহ্মণের নহেক লক্ষণ,
জগৎ-কল্যাণে শুধু তাঁর আকিঞ্চন।
দেহ, মন, আত্মা এই তিনেরে চিনিয়া
তপোবলে ব্রহ্মাণ্ড সে লইবে জিনিয়া।
কিন্তু পূজা-প্রতিষ্ঠার লোভ নাই তার,
জগৎ-উদ্ধারে তাঁর আপন উদ্ধার;
নিজেরে দর্শন করি' সদা সর্ব্বভূতে
নামের সাধন করে জগতের হিতে।
আত্মদানে রতি তাঁর, আত্মার কল্যাণে
আত্মসমর্পণ করে কায়মনোধ্যানে।

ব্রাহ্মণ বলিয়া যারা করিছে গৌরব,
কোথা এই আত্মাহুতি ত্যাগের সৌরভ?
বৈদিক যুগের দীপ্তি গিয়াছে ঘুচিয়া,
ত্যাগের ত্রিপুণ্ড্র-লেখা গিয়াছে মুছিয়া,
শুভ্র যজ্ঞ-উপবীত কলঙ্কিত আজ,
নাহি সেই পুণ্যমূর্ত্তি তপস্বি-সমাজ,
নাহি সেই মূর্ত্তিমান্ কল্যাণ-আশিস,
আছে শুধু মুখে মধু, মনভরা বিষ।
তাই আজি চতুর্দ্দিকে প্রমূর্ত্ত বিষাদ,
তাই আজ গৃহে গৃহে শুধু আর্ত্তনাদ।
চাহি আজ শত কোটি যথার্থ ব্রাহ্মণ,
ছোট বলি' কাহারেও করে না গর্হণ,

সাধন-সহায় নাম জগতে অতুল,
বাসনা-বীজাণু-রাশি করিবে নির্ম্মূল।
নামেতে জাগিলে চিত্ত বন্ধনের রাশি
তপস্যা অনল-তাপে পুড়ে যাবে খসি'
তখন হইবে মৃত্যু তুচ্ছ অতিশয়
অগ্রাহ্য হইবে লক্ষ বিপদ-নিচয়।

সার্থক মনুষ্য-জন্ম ব্রাহ্মণত্ব লাভে,
অসার্থক কুলীনত্ব ইহার অভাবে।
চণ্ডাল, মেথর কিম্বা পারিয়া, চামার,
ইহা লাভে সকলের সম অধিকার।
যে করিবে যত ত্যাগ লক্ষ্য লাভ তরে,
প্রত্যহ উন্নতি তত উচ্চতর স্তরে।
উচ্চ বংশে জন্মি' যদি না কর সাধন,
বংশ-মর্য্যাদার দম্ভ মিথ্যা—অকারণ।
কে করিবে পূজা বল তপস্যা-বিহীনে?
কে মানিবে তারে, যার ক্ষয় দিনে দিনে?
অধর্ম্ম আশ্রয় যার, চাতুর্য্য ভরসা,
চখে ধূলিক্ষেপ যার শাশ্বত ব্যবসা,
বচন-বাহুল্যে আর টিকির দাপটে
ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা তার হাস্যকর বটে।

প্রতিষ্ঠা লাভের আশে তপস্যা করিলে
নিশ্চিত জগত-মধ্যে যশোমান মিলে।

কিন্তু ইহা ব্রাহ্মণের নহেক লক্ষণ,
জগৎ-কল্যাণে শুধু তাঁর আকিঞ্চন।
দেহ, মন, আত্মা এই তিনেরে চিনিয়া
তপোবলে ব্রহ্মাণ্ড সে লইবে জিনিয়া।
কিন্তু পূজা-প্রতিষ্ঠার লোভ নাই তার,
জগৎ-উদ্ধারে তাঁর আপন উদ্ধার ;
নিজেরে দর্শন করি' সদা সর্ব্বভূতে
নামের সাধন করে জগতের হিতে।
আত্মদানে রতি তাঁর, আত্মার কল্যাণে
আত্মসমর্পণ করে কায়মনোধ্যানে।

ব্রাহ্মণ বলিয়া যারা করিছে গৌরব,
কোথা এই আত্মাহুতি ত্যাগের সৌরভ?
বৈদিক যুগের দীপ্তি গিয়াছে ঘুচিয়া,
ত্যাগের ত্রিপুণ্ড্র-লেখা গিয়াছে মুছিয়া,
শুভ্র যজ্ঞ-উপবীত কলঙ্কিত আজ,
নাহি সেই পুণ্যমূর্ত্তি তপস্বি-সমাজ,
নাহি সেই মূর্ত্তিমান্ কল্যাণ-আশিস,
আছে শুধু মুখে মধু, মনভরা বিষ।
তাই আজি চতুর্দ্দিকে প্রমূর্ত্ত বিষাদ,
তাই আজ গৃহে গৃহে শুধু আর্ত্তনাদ।
চাহি আজ শত কোটি যথার্থ ব্রাহ্মণ,
ছোট বলি' কাহারেও করে না গর্হণ,

প্রেমাবেগে যাঁরা দেয় বাহু প্রসারিয়া,
দীনধনী সকলেরে লয় আলিঙ্গিয়া,
সম্মুখে পশ্চাতে যাঁর শুধু ভ্রাতৃগণ,
দক্ষিণে ও বামে যাঁর আপনার জন,
রাজাপ্রজা সকলেরে করি' সমজ্ঞান
সকলের তরে যাঁরা করে প্রাণদান।
এ ব্রাহ্মণ আসে যদি, জাগিবে ভারত,
কল্যাণ-তরঙ্গাঘাতে দুলিবে জগৎ।

নামের মহিমা

ঈশ্বর-কৃপায় যার অখণ্ড নির্ভর
ত্রিভুবন মাঝে তার কেহ নাহি পর,
সকলেই আপনার প্রাণের মতন,
সকলেই সোহাগের হৃদয়-রতন,
সবার লাগিয়া হয় সমান দরদ,
সকলের লাগি' তার নিত্য মোক্ষপদ।

নামের সাধনা জানো বাঞ্ছাকল্পলতা,
পাপ তাপ-দুঃখ-হর অমোঘ সর্ব্বথা।
নাম-মহিমায় হবে হৃদয় উদার,
বহিবে সবার লাগি' নয়নের ধার।
যে ধন পাইয়া ধনী নিজেরে গণিবে,

ছোট বড় সকলেরে অকাতরে দিবে।
আত্মমোক্ষ পরমোক্ষে বুঝিয়া স্বরূপ
নাম-সাগরের নীরে দাও বৎস ডুব।

সংশয় সন্দেহ আদি যাও পায়ে দ'লে
আসিবে কল্যাণ-পুঞ্জ ছুটি' দলে দলে।
সাধকের মত যারা সাধিবারে পারে,
কল্যাণ বরষে তারা বরষার ধারে।
একনিষ্ঠা একাগ্রতা যাহার সঙ্গিনী
কি সাধ্য দংশিবে তারে লালসা-ফণিনী?
কামনার বাসনার যত আক্রমণ
যুক্ত-করে নিবে তার চরণ শরণ।
নামের সাধনে হবে ভেদবুদ্ধি-নাশ,
জীবন হইবে নিত্য-আনন্দ-নিবাস।

যে চাহে তাঁহার কৃপা

যে চাহে তাঁহার কৃপা, নিশ্চিত সে পায়,
দগ্ধ তনু স্নিগ্ধ হয় শীতল ছায়ায়,
কণ্ঠভরা পিপাসায় মিলে শান্তি-জল,
জঠর-জ্বালায় মিলে জ্ঞানামৃত-ফল,
বক্ষভরা বেদনায় সান্ত্বনা মধুর,
চিত্তজোড়া শূন্যতায় ভক্তি ভরপুর,

অজ্ঞান-আঁধার মাঝে আলোকের হাসি,
বিরস বিষাদ মাঝে ভরসার রাশি,
অসংযম-কোলাহলে প্রেমের কল্যাণ,
আরো পায় নামে মগ্ন কায়মনঃপ্রাণ।

কিন্তু নামে অধিকার, সে কি সোজা কথা?
—যাহার সেবাতে ঘোচে জন্মযুগব্যথা?
—যাহার স্মরণে সর্ব্বরিপু বশীভূত?
—যাহার সাধনে সর্ব্বসিদ্ধি প্রণোদিত?
নামের পরমাশ্রয় প্রভুর কৃপায়
শতজন্মপুণ্য-হেতু আচম্বিতে পায়
নিজপুণ্য নাম-লাভে নহে সুপ্রচুর,
কৃপা না থাকিলে তাঁর, প্রাপ্তি অতিদূর।
সেই মহানাম যাঁর কৃপাগুণে লাভ,
তাঁহার শ্রীপদে অর্প যত ভাবাভাব।
তাঁহাতেই নিত্য বাঁধ চিত্তের বসতি,
মহিমা-কীর্ত্তনে তাঁর পূর্ণ কর মতি।
জীবনে মরণে তাঁরে জানহ আপন,
তাঁর সেবা-পূজা তরে কর মৃত্যুপণ।
কিন্তু "তাঁর পূজা" ইহা নহে সাধারণ,
অসম্ভব শুধু পুষ্পে তার সমাপন।
বিশ্বেরে যে ভালবাসে, সে পূজিতে পারে,

অপরের পূজা-চেষ্টা ব্যর্থ বারে বারে।
পূর্ণিমার খদ্যোতিকা, সমুদ্রে গোষ্পদ,
ঘট-পুষ্পে তাঁর পূজা তুচ্ছ সেই মত।
তবে যদি পূজে কেহ আত্মরূপী ঘটে
অর্পিয়া জীবন-পুষ্প, তবে পূজা বটে।

লভিয়াছ এই দেহ তাঁরি সেবা-তরে,
তাঁরি সেবাকার্য্যে ইহা দাও অকাতরে।
মেধা বুদ্ধি সব দিয়া কর অন্বেষণ
ব্যথিতেরা কে কোথায় করিছে ক্রন্দন।
সকলের দুঃখ-ভার করিতে হরণ
দেহমন সেখানেই কর সমর্পণ।
চতুর্দ্দিকে জ্বলিতেছে প্রতপ্ত অনল,
তাহা নিবাইতে ঢাল তব মনোবল।
তাহাতে ঢালিয়া দাও জীবন্ত রুধির,
নিজেরে নিঃশেষ কর ধন্য মহাবীর!
কঠোর কর্ত্তব্য যদি চাহে তব প্রাণ
অনায়াসে অকুণ্ঠায় কর ইহা দান।

যে জীবন কৃতান্তের ক্রীড়ার পুত্তল,
কে জানে কখন ইহা হইবে বিকল?

কে জানে কখন শেষ নিঃশ্বাসের কাল,
কখন সকল যন্ত্র হইবে বেতাল?
সময় থাকিতে ইহা শ্রেষ্ঠ-সেবা লাগি'
দান করি' মরণেও রহ নিত্য জাগি'।
অদাতা ও কৃপণের জীবনে মরণে
নাহিক পার্থক্য কিছু—বর্দ্ধনে নিধনে।
ত্যাগবান্ পুরুষের আত্মদান মাঝে
শতকোটি দেবত্বের জাগরণী রাজে।
সমগ্র জীবনব্যাপী কল্যাণ সাধিয়া
অক্ষয় অমর তৃপ্তি লও উপার্জ্জিয়া।

কিন্তু যেই দেহ করে আত্ম-অপচয়,
সত্য সেবা-তরে তাহা কখনও নয়।
যেই মন সদা করে ভোগের সন্ধান,
সত্য গুরু সেই মন কভু নাহি চান।
যথার্থ সেবায় যদি থাকে তব মন,
প্রাণপণ যত্নে কর যোগ্যতা অর্জ্জন।
প্রাণপণে পবিত্রতা করহ সাধন,
কায়মনোবাক্যে কর অসত্য বর্জ্জন।
অনলস কুণ্ঠাহীন দিব্য তেজ দিয়া
জগত কল্যাণ-রাশি লও না কিনিয়া।

আজি চাহি বাধামুক্ত অবাধ্য উদ্যম

নামের কৃপার দৃষ্টি তোমার উপরে,
অপার সে ভাগ্য তব কে রুধিতে পারে?
অখণ্ড নামের চির জীবন্ত প্রেরণা
জাগাবে জীবন তব, জাগিবে চেতনা;
পূর্ব্বতন কর্ম্মাকর্ম্ম সংস্কারের রাশি
অনন্ত মুক্তির মন্ত্রে যাইবে বিনাশি'।
নামের কৃপার মাঝে পাইয়া আশ্রয়
বিস্মর অতীত দুঃখ, ভুলে যাও ভয়।
নামের দুন্দুভি-নাদে কাঁপাও মেদিনী,
নিজে জাগ, সকলের জাগাও পরাণি।
অখণ্ড গৌরবপুঞ্জে কর নিমন্ত্রণ,
অনন্ত পৌরুষ-রাশি লভুক জীবন।
নবজীবনের এই প্রারম্ভ-সময়
প্রতি কর্ম্মে ঘোষ আজি সাধনার জয়।
নামেতে নিহিত আছে জগৎ-কল্যাণ,
নামের সাধনে সঁপ কায়মনোপ্রাণ।
অনাস্থা পীড়িত এই ভুবন-মাঝারে
নামের গৌরব-ধ্বনি কর বারে বারে।
অবসাদ অবিশ্বাস হোক অপগত,

মানব-সন্তান হোক্ মানুষের মত।
অনলস অকুণ্ঠিত কর্ম্মের প্লাবন
শিক্ষা দিক্ লঘু দৃষ্টি দিতে বিসর্জ্জন
মৃত্যুজয়ী সঙ্কল্পের চরণ-বিক্ষেপ
হোক্ শোক-দুঃখ-তাপে শান্তির প্রলেপ।
স্বর্গ কি নরক,—যেন জগতের তরে
মানুষের পদতলে লুটাইয়া পড়ে।

হে পুত্র, হে মোর প্রিয়, রাখিও বিশ্বাস,
ব্যর্থ কভু নাহি হয় সাধকের আশ।
নামের যে সেবা করে স্বপ্নে জাগরণে,
নিয়ত কল্যাণ তার উত্থানে পতনে।
জাগতিক অভ্যুদয়ে তার অভ্যুদয়,
জাগতিক পতনেও প্রতিষ্ঠা নিশ্চয়।
অন্ধকার-অপগমে আলোকের মত
পতনে উত্থান তার হয় অবিরত।
সাগর-তরঙ্গ সম চিত্তের সংঘাত
প্রবর্ত্তিত করে নব প্রশান্ত প্রভাত।
দুঃখময় দুর্দ্দিনের বিভীষিকা-রাশি
আত্মায় জাগায় তার ভূমানন্দ-হাসি।
হে বৎস জানিয়া রাখ, সাধনের বল
করায়ত্ত ক'রে দেবে প্রার্থিত সকল।

কিন্তু জেনো, অখণ্ডের আশার পসরা
জগত-কল্যাণ পুঞ্জে রহে সদা ভরা।
আত্মসুখে মতি রতি অখণ্ডের নয়,
পরার্থ-প্রেরণা তার প্রাণমনোময়।
পরের লাগিয়া তার অমূল্য জীবন,
পরের লাগিয়া তার প্রাণান্ত সাধন,
পরের লাগিয়া তার তপস্যা, কৃচ্ছ্রতা,
যত সফলতা তার, পরেরি সর্ব্বথা,
আত্মসুখ পরার্থের নূপুর-নিক্কণে
হইল আপন-হারা, নিজেরে না চিনে;
নিজেরে বিকায়ে দিয়ে পরের কারণে
মৃত্যুরে মরণ বলি' কদাপি না গণে।
শোয়াসে শোয়াসে যার মৃত্যুর বারতা,
নামের প্রভাবে সেও ভোলে স্বার্থ-কথা।
পরের সেবায় তার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস,
পরার্থ-সাধনে তার সদা স্বার্থবাস।

সাক্ষাৎ ঈশ্বর হ'তে নিত্যসিদ্ধ নাম
অবতীর্ণ হ'ল এই বসুন্ধরা-ধাম
অতীতের কত কোটি যুগান্তর বাহি'
বহে এ নামের ধারা সংখ্যা তার নাহি;
কত কোটি বেদব্যাস, রাজর্ষি জনক,
কত কোটি শুকদেব, নারদ, সনক,

কত কোটি পতঞ্জলি, কপিল, কণাদ
ঘুচাইতে দুঃখহত জীবের বিষাদ
জপিলেন মহানাম ভক্তিযুত চিতে
বিলালেন মহানাম শুদ্ধ জীবহিতে।
কত কোটি বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, জৈমিনি,
লভিলেন মহানামে আনন্দের খনি।
গৌতমাদি কত কোটি মুনি-ঋষিগণ,
পরার্থ-প্রসাদ তরে নামে নিমগন।
সবার আশিষ সেই মহামন্ত্র সনে
নিত্য তোরে রক্ষা করে উত্থানে পতনে।
তাঁহাদের অকপট কল্যাণাকাঙ্ক্ষার
তব মধ্যবর্ত্তিতায় হইবে প্রসার।
নিজেরে ভেবো না বৎস সামান্য মানব,
তব তরে তপস্যার অতুল্য বিভব।
তব তরে সাধনের অব্যর্থ শকতি,
তব তরে অখণ্ডের অব্যাহত গতি।
তব তরে সংযমের সুবর্ণ-ভাণ্ডার
খুলি' দিবে সৌভাগ্যের প্রশস্ত দুয়ার।
শত শত পথভ্রান্ত প্রয়াসে তোমার
জ্যোতির্ম্ময় পন্থা পাবে অন্তর-মাঝার।
অসংযত কামনার ছিঁড়িয়া বন্ধন

পরহিত তরে দিবে আত্ম-বিসর্জ্জন
কর আজ তারি তরে আত্মসংগঠন,
কর সর্ব্বাবস্থা-চয়ে যোগ্যতা অর্জ্জন।
সেবা-বলে সকলেতে লভ আত্মভাব,
প্রেম-প্রীতি দিয়া কর পরমার্থ লাভ।

আজিকে তোমার চাই সতর্ক প্রয়াস,
কল্যাণের জাগরণ নহে পরিহাস।
আজি চাহি সুকঠোর ক্লান্তিহীন শ্রম,
আজি চাহি কেশরীর অমিত বিক্রম,
আজি চাহি ভবিষ্যতে অখণ্ড নির্ভর,
আজি চাহি বিশ্বাসের গরিমা সুন্দর,
আজি চাহি নিন্দাবাক্যে ভ্রূক্ষেপহীনতা
আজি চাহি বেশী কাজ—কম ক'রে কথা,
আজি চাহি মানুষের চরিত্র-গৌরব,
আজি চাহি দেবতার ক্ষমার সৌরভ,
আজি চাহি শ্রদ্ধা, ভক্তি, লক্ষ্যে একা
কর্ম্ম-ব্রাহ্মণের নিষ্ঠা—পুণ্যা, সদাব্রতা
আজি চাহি প্রত্যেকের নির্ভীক হৃদয়
প্রবল ইচ্ছায় যাহা করে বিশ্বজয়।
আজি চাহি বাধামুক্ত অবাধ্য উদ্যম,
প্রকটিত মানুষের পূর্ণ পরাক্রম।

শ্রীগুরু-দক্ষিণা

তোমাদের জীবনের সুকল্যাণ ব্রত
ব্রহ্মচর্য্য প্রচার ও প্রতিষ্ঠা সতত।
কিন্তু যারা কর্ম্মদীন আদর্শবিহীন,
তাহাদের শুভচেষ্টা শত ভাবে ক্ষীণ।
অবচ্ছেদ ছাড়া চাই নিয়ত প্রয়াস,
তবেই ঘটিবে জীবে শিবের প্রকাশ ;
অখণ্ড পরম ব্রহ্ম অনাদি ঈশ্বর
তত্ত্বালোকে উদ্ভাসিত করিবে অন্তর ;
নিত্যানিত্যে ভেদাভেদ তবেই ঘুচিবে,
সুখ-দুঃখ-মূল দ্বন্দ্ব তবেই মুছিবে।

কিন্তু প্রতি কার্য্যে চাই যোগ্যতা সঞ্চয়
কল্যাণ-প্রতিষ্ঠা কভু অযোগ্যের নয়।
শকতি অর্জ্জনে যদি হও পরাঙ্মুখ
কল্যাণ-গ্রহণে সবে হইবে বিমুখ ;
শকতির সেরা শক্তি প্রেম মহাধন,
নামের সেবায় তুমি করিবে অর্জ্জন।
নামের সাধনে যার আছে অবহেলা,
তাহার সকল চেষ্টা বৃথা ছেলেখেলা।
কর্ম্মহীন বহুভাষী বিপ্রলাপী নরে
যথার্থ মানুষ বলি' কেবা গ্রাহ্য করে?

পরন্তু যে শুভচিন্তা করে নিত্যদিন,
নাম-সাধনায়-তনু-মন করে লীন,
কল্যাণ আচরি' নিজে কল্যাণ প্রচারে,
নির্ব্বিচারে বিশ্ববাসী তার পথ ধরে।
যেখানে অরুণোদয় আলোক সেখানে,
যেখানে প্রাণের যোগ, লোকে তারে মানে!

প্রথম যোগ্যতা জানো নামের সাধন,
দ্বিতীয় যোগ্যতা জানো বীর্য্যের রক্ষণ।
এই দুই সমন্বয়ে সারা বিশ্বময়
কল্যাণ-প্রতিষ্ঠা তোরা করিবি নিশ্চয়।
নামের সাধনে হবে ব্রহ্মচর্য্য লাভ,
ব্রহ্মচর্য্য জাগাইবে দিব্য মহাভাব।
এই দোঁহে নিত্যকাল একত্র বসতি,
একে যার গেছে মন, অন্যে তার রতি।
স্বেচ্ছায় যে করে কভু দেহ-বীর্য্য ক্ষয়,
নামের সাধনে সিদ্ধি তার লভ্য নয়।
পরন্তু যে নাহি করে নামের সাধন,
ব্রহ্মচর্য্য-লাভ তার অভাব্য-ভাবন।
মৈথুনাদি হীন কর্ম্ম করি' পরিত্যাগ
নামের সাধনে জাগে ব্রহ্ম-অনুরাগ।
বিধি অনুযায়ী করি' নামের সাধন

হবে লাভ ব্রহ্মচর্য্য অমূল্য রতন।
উপস্থ-সংযম মাত্র ব্রহ্মচর্য্য নহে,
সর্ব্বতঃ সংযম,—তারে ব্রহ্মচর্য্য কহে।
মনোসুখে স্মর যদি অতীত মৈথুন,
তাহাতেও ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত হবে ঊণ।
নিজ কিম্বা অপরের মৈথুনের কথা
কীর্ত্তন করিলে ব্রহ্মচর্য্য কপটতা।
সকাম নয়নে কেলি করিলে দর্শন
দৃঢ়মূল ব্রহ্মচর্য্য হয় উৎপাটন।
সম্ভোগ-সঙ্কল্প মাত্র জাগিলে ক্ষণিক
সর্ব্বনাশ হয় তাহে, কি কহি অধিক।
আত্মসুখ চিন্তা মাত্রে বীর্য্য-অপচয়,
শ্রবণ, কীর্ত্তন, চেষ্টা করে আয়ুঃক্ষয়।
সর্ব্বকালে সর্ব্বভাবে যে করে সংযম,
ব্রহ্মচর্য্য হয় তার অটুট উত্তম।
নতুবা দুরন্ত কাম হৃদয়ে পশিয়া
সকল মর্ম্মের গ্রন্থি ছিঁড়িবে বসিয়া।
ব্রহ্মচর্য্য-প্রতিষ্ঠায় ইচ্ছার শকতি
অক্ষুণ্ণ-অব্যর্থ-রূপে প্রয়োজন-অতি।
ইচ্ছাবলে ভোগলিপ্সা করিয়া দমন
শরীরের সার বস্তু করহ রক্ষণ।
ইচ্ছাশক্তি লাভ হয় নামের সেবায়,

সাধক সাধন-বলে সর্ব্বশক্তি পায়।
ঈশ্বর দর্শন দিলে নামের প্রভাবে
বীর্য্যক্ষয়-প্রবণতা চিরতরে যাবে।
নামেতে মজিলে মন বিশ্ব শান্তিময়,—
দূরে যাবে চপলতা, ষড়রিপু-ভয়,
দূরে যাবে পূর্ব্বতনী বাসনার টান,
চিত্ত রবে তৃপ্ত করি' ঈশ্বরের ধ্যান,
দূরে যাবে দেহলিপ্সা, বিলাস-কামনা,
দূরে যাবে পঙ্কিলতা, অনর্থ-ভাবনা,
দূরে যাবে মোহাবেগ, কামের কাকুতি,
নামেতে হইবে লাভ অতুল বিভূতি,
সঙ্কল্প হইবে নিত্য-কল্যাণে আশ্রিত,
চিত্তবৃত্তিচয় হবে কল্যাণ-প্রেরিত।
জগৎ-কল্যাণ-তরে নামের সাধন
তোমারে করিবে পূর্ণ ব্রহ্মে নিমগন।
আত্মমোক্ষ পরমোক্ষে লভি' জাগরণ
করিবে সবার লাগি' অমৃত-বর্ষণ।
নামের সাধন আর ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত
অবিরাম অবিচ্ছেদ চালাও সতত।
ঋষি-বাক্য পালনার্থ দাও যদি প্রাণ
সাহায্যে সমগ্র বিশ্ব হবে আগুয়ান।
তুমি যদি কথা শোন তোমার কথায়

বিশ্বজন শ্রবণ না দিয়া কোথা যায়?
সেবার্থে যাহার চিত্ত সর্ব্বথা প্রস্তুত,
তার বাক্য সর্ব্বকাল পালে সর্ব্বভূত।
যদি কেহ তুচ্ছ করে তোমার আহ্বান,
জানিও, ছিল না তব ষোল আনা প্রাণ।
কখনো হইলে ব্যর্থ তব আবেদন
নাম-সাধনাতে আরো হয়ো নিমগন।

জগতের যাবতীয় সত্য আন্দোলন
লঙ্ঘি শত বাধা-বিঘ্ন লভেছে বর্দ্ধন।
তোমরাও প্রতি পদে কত বাধা পাবে
কত দুঃখ, কত কষ্ট নিয়ত সহিবে,
কত মর্ম্মভেদী কথা, কত অপমান,
কত বিষ-জ্বালা, কত শাণিত কৃপাণ
সতত হইবে বিদ্ধ হৃদয়ে তোমার,
নীরবে বহিয়া যাও বেদনার ভার।
প্রতিবাদহীন তব কর্ম্মের প্রভাবে
সকল বিরুদ্ধ চেষ্টা পদানত হবে।
নামেতে পাইবে নিত্য নূতন সম্বল,
বাড়িবে মনের তেজ, পাবে নববল,
জাগিবে নবীন বীর্য্য, নব উদ্দীপনা,
নূতন ভরসা-রাশি, নবীন প্রেরণা,

নব আশা, নবোদ্যম, নবোৎসাহচয়
কল্যাণ-কর্ম্মীর কর্ম্মে ঘোষিবে বিজয়।

নাম তব চিরন্তন শক্তির ভাণ্ডার,
নাম জীবনের সর্ব্ব সিদ্ধির আগার।
জীবনে যে কাজে কর কর-প্রসারণ
নাম-বলে হবে তব অসাধ্য-সাধন।
যে বুদ্ধি নামের ফলে হবে উদ্‌ঘাটিত,
নির্ব্বিরোধ শুভ তাহে হইবে জাগ্রত।
অনাস্থা করিয়া নিজ চপল বুদ্ধিতে
নির্ভর করিও নামে জগতের হিতে।
নাম-যজ্ঞে সর্ব্বজীবে জাগিবে করুণা,
তোমার দীক্ষার ইহা শ্রীগুরু-দক্ষিণা।

অখণ্ডের জয়

নামের মহান তত্ত্ব জেনেছে যে জন
ধন্য তার স্থূল-সূক্ষ্ম শরীর ধারণ,
ধন্য তার ইহলোক, ধন্য পরকাল
শত সুখ-দুখ-মাঝে আনন্দ-রসাল।

নামের মহিমা দিয়া রচিত সংসার,
যে বোঝে নামের তত্ত্ব, এবিশ্ব তাহার।

নাম হ'তে বিকশিল রবির কিরণ,
কমলের মধুগন্ধ, মৃদু সমীরণ,
তটিনী-তরঙ্গ-মালা, জ্যোছনার রাশি
ফুটিয়া উঠিবে বিশ্বে অকপটে হাসি,
জাগিয়া উঠিল গান বিষণ্ণতা নাশি'
বাজিয়া উঠিল বনে মনোময় বাঁশী।

যে বাঁশী বাজালে চিত্ত ভুলিবে সকল,
মরমের শত গ্রন্থি হইবে বিকল,
বিবশ বাসনা-চয় সুরের হিল্লোলে
করে আত্ম-সমর্পণ শ্রীগুরুর কোলে,
ইহকাল পরকাল চিরকাল তরে
সবারে রাখিবে মগ্ন আনন্দ-সাগরে।
নাম-তত্ত্ব বোঝ যদি দেখিবে ব্রহ্মাণ্ড
অখণ্ড সৃষ্টির মাঝে ক্ষুদ্র এক খণ্ড।
এর শত কোটিগুণ দৃষ্টির বাহিরে
নানা তালে ছন্দে রাগে নৃত্য-গীত করে,
কিন্তু সকলের মুখে ফোটে এক গান—
সকলের কণ্ঠে এক অখণ্ডের তান।
ধূলিকণা হ'তে ওই চন্দ্রমা-ভাস্কর,
ক্ষুদ্র কীট হ'তে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর
সকলে ফুকারে এক মহানাম-ধ্বনি
অখণ্ড-আনন্দময় উপলব্ধি-খনি।

সেই আনন্দের তত্ত্ব হইলে দর্শন
আমি-তুমি ভেদাভেদ হবে নিরসন।
কেন আসিয়াছ ভবে, কেন বা যাইবে,
কোথা ছিলে, কোথা আছ, কোথা বা থাকিবে,
কি তোমার প্রার্থনীয়, কি তোমার শ্রেয়,
কি তোমার নিরর্থক, কি তোমার হেয়,
সকল নিগূঢ় কথা জাগিবে অন্তরে,
দূরে যাবে অন্ধকার ব্রহ্ম-রবি-করে।
সকলের মাঝে তুমি নিজেরে দেখিবে,
সবার মরম-পুরে নিজেরে পাইবে,
সকলের সেবা করি' নিজেরে সেবিবে,
সকলেরে জাগাইতে আপনি জাগিবে।
এক শিষ্য মাঝে কোটি বিশ্ব বিরচিয়া
উঠিবে অখণ্ডনাদ বজ্র-হুঙ্কারিয়া।
ঘুচিবে এ জগতের মহাতন্দ্রাঘোর,
গর্জ্জিবে কর্ম্মের গীতি মধুরে কঠোর।
সন্ন্যাসি-হৃদয় চাহি' কর্ম্মীর সমাজ
সৃজিবে নন্দন-শোভা মরুভূমি-মাঝ,
নিত্যমুক্ত পরমার্থসেবী ব্রহ্মবিৎ
করিবেন কর্ম্ম, জীবে ফিরাতে সম্বিৎ;
স্রষ্টার স্বভাব দিয়া গঠিত মানব
আপনারে স্রষ্টা জানি' হবে অকৈতব;

নিজেরে সৃজিতে চাহি' যুগযুগান্তর
মুক্ত আত্মা ভ্রমিবেন এঘর ওঘর ;
বিশ্বমোক্ষ তরে তাঁর গ্রহণ বর্জ্জন।
দেহ হ'তে দেহান্তরে পথ-পর্য্যটন ;
কভু বা শিষ্যের গুরু, পুত্রের জনক,
কভু বা পরমহংস কি পরিব্রাজক,
সর্ব্বরূপে সর্ব্বভাবে বিশ্বের বিকাশে
প্রকটন-চেষ্টা তাঁর নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে।
বিগতের মহাজ্ঞানী ব্রহ্মযোগিগণ
নরদেহে করিবেন ভূমাবতরণ।
না রাখিয়া কুল-ধর্ম্ম-জাতি-অভিমান
এবার সবার লাগি' দরদ সমান।
ছোট বড় সকলের গৃহাঙ্গন-মাঝ
পুত্রকন্যা-রূপে তাঁরা করিবে বিরাজ।
সকলের অঙ্কে তাঁরা হাসিবে খেলিবে,
বিশ্বত্রাণ তরে সবে পাদপীঠ দিবে।
সরস কল্পনারাশি করিয়া বাস্তব
আঁকিবে পরমানন্দ-মূর্ত্তি নব নব,
ঘুচাইবে মানবের শোক-হাহাকার,
ঘুচাইবে মনোভব-অন্ধ-অত্যাচার,
নিবারিয়া ক্রোধ, লোভ, রিপু দুর্নিবার
মোহ, মদ, মাৎসর্য্যের রুধিবে বিস্তার।

মনুষ্য-জীবনে স্থাপি' মানুষ-সাধন
নরেরে করিবে পূর্ণ ব্রহ্মসনাতন।
ইহাদের প্রত্যেকের প্রকাশের লাগি
তোমাদের প্রত্যেকের হ'তে হবে ত্যাগী।
গৃহধর্ম্ম পালনের যার প্রয়োজন,
তাহারো করিতে হবে সংযম-সাধন।
কঠোর কল্যাণ তরে রুধি' শুক্রক্ষয়
নাম-সাধনের বলে লভ অভ্যুদয়।
কি-সন্ন্যাস কিবা গৃহ, যে আশ্রমে পার
আত্মার অনন্ত শক্তি বিকশিত কর।
অনাগত মহতের প্রকাশ লাগিয়া
লক্ষ্য পথে অহর্নিশ রহ রে জাগিয়া।
কে জানে কি ভাবে তাঁরা চাহিবেন সেবা,
কোন্ মহাপ্রয়োজনে অসিবেন কে বা?
পারো যদি গুরু হ'য়ে শিখাও আচার,
শিখাও সেবার ধর্ম্ম, ব্রহ্মের বিচার ;
পারো যদি পিতা হ'য়ে কর প্রজনন
অজ্ঞান-বিনাশ-রত সন্তান-রতন।
কিন্তু জেনো, নিত্যমুক্ত বিদেহী মহান্
আত্মপ্রকটন লাগি যোগ্য পিতা চান।
চাহি যোগ্য জননীর জরায়ু আশ্রয়,
যা তা নারী হেন কর্ম্মে যোগ্যা নাহি হয়।

যার তার রজোবীর্য্যে আত্ম প্রকাশন
মহতের পক্ষে হয় অঘট্য-ঘটন।
তপোবীর্য্য, দেহবীর্য্য করহ সঞ্চয়,
শুধু মহতের লাগি' কর তার ব্যয়।
বহু শিষ্য লোভ যাক্ ধূলে গড়াগড়ি,
বহু সন্তানের মোহ থাক্ দূরে সরি',
সমর্থ সুজাত যত পুত্রকন্যাগণ
জীবনে নামের জ্যোতি করুক রক্ষণ,
সুদীক্ষিত প্রেমস্নাত যোগ্য শিষ্যচয়
ঘুষুক যুগান্ত-কাল অখণ্ডের জয়।

জীবের কল্যাণ-তরে তোমার সাধন

জীবের কল্যাণ-তরে তোমার সাধন,
সংযমের শুদ্ধাচার কলুষ-পাবন।
সবার লাগিয়া করি' জীবন-ধারণ
কঠোর তপস্যা তুমি কর আমরণ।
ইহজন্ম পরজন্ম সর্ব্বকাল জুড়ি'
স্বদেশ-বিদেশ আর সর্ব্বদেশ ঘুরি'
সকলের কাণে কাণে শুনাও কেবল
ত্যাগের মোহন-মন্ত্র ঢালো অবিরল।

প্রাণে প্রাণে সম্প্রীতির স্নিগ্ধ মধুরাশি
হিংসা তথা বিদ্বেষের হলাহল নাশি'।
সবারে আপন-করা আনন্দ-উৎসব
প্রতিটি অন্তরে দিক্ অনন্ত বৈভব।
সুখ শুধু আত্মদানে, পরার্থ-সাধনে ;
তৃপ্তি শুধু আস্বাদনে, সত্য রস-পানে।
জীবন বাঁচিয়া থাকে স্বার্থ-বিসর্জ্জনে,
মৃত-সঞ্জীবনী মিলে সার্থক মরণে।
সংগ্রাম-মুখর দীপ্ত উজ্জ্বল জীবনে
সংযম-প্রতিষ্ঠা করে অখণ্ড-যৌবনে।
ভীরু কাপুরুষ-প্রায় কেন ধীরে ধীরে
ভীত মনে জীবনের পথ চলিবি রে?
দ্বিধা দ্বন্দ্ব সংশয়েতে দিয়া জলাঞ্জলি
সবলে সদলে পথ ছুটে যা রে চলি'।
জগৎ-কল্যাণ-কর্ম্ম ডাকিয়াছে যারে,
নিখিল-ব্রহ্মাণ্ডে তারে কে রুধিতে পারে?

যুগপৎ তিনজনের শ্রুতিলিখন

শ্রীশ্রীবাবামণিকে অত্যন্ত কর্ম্মব্যস্ত দেখিয়া মুরারিচাঁদ কলেজের তিনটী ছাত্র লেখাপড়ার কাজে সহায়তা করিবার জন্য আসিয়াছেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তিন জনকে একই সঙ্গে তিনখানা পত্র ডিক্‌টেশান দিয়ে যাব, পারবে ত' লিখ্‌তে। যুবকেরা ইতস্ততঃ করিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কাণ খাড়া রেখে শুন্‌বে। যার দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ ক'রে যে কথাটী বলি, সে শুধু সেই কথাটীই লিখ্‌বে। কণ্ঠস্বরের তিন রকম ভঙ্গীতে তিন জনকে ডিক্‌টেইট কর্ব্ব। তা দিয়েও বুঝবে, কাকে ঠিক্ ঠিক্ বল্‌ছি। এক জনকে যে কথাগুলি বল্‌ছি, তার দিকে অন্য জনে কণা মাত্রও লক্ষ্য দেবে না। লিখ্‌বার জন্য তোমাকে যে কথাটা বল্‌লাম, তা অবিকল মনে রাখ্‌বার চেষ্টা কর্ব্বে। তিন জনকে একই সঙ্গে ডিক্‌টেশান দেওয়া শক্ত কাজ কিন্তু যার যার কথাটুকু স্পষ্ট ভাবে স্মরণ ক'রে রেখে লিখে যাওয়াও কম শক্ত নয়। চাই, প্রখর মনোযোগ। কার্ব্বণ ঠিক ক'রে নাও, যেন পত্রের নকলগুলি আমার কাছে থেকে যায়।

প্রথম প্রথম একটু অসুবিধাই ঘটিল। দুই তিনখানা পত্র লিখার পরে শ্রুতিলিখকেরা ব্যাপারটা বুঝিয়া লইলেন। তখন অফুরন্ত উদ্যমে পত্র লেখা চলিল। বিকাল দুই ঘটিকা হইতে রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত সাত ঘণ্টা পত্র লেখা চলিল। সেই সকল পত্রের কতকগুলি নিম্নে দেওয়া হইল।

গুরু ও শিষ্যের অভেদত্ব

জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তোমাদিগকে আমি প্রাণের অধিক ভালবাসি। সৎ, সাধু, মহৎ, পরহিতপ্রাণ এবং ঈশ্বরানুগত হইয়া তোমরা আমার সেই ভালবাসার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে চেষ্টা পাইও। আমি তোমাদিগকে আমার সহিত অভিন্ন-সত্তা বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকি। তোমাদের সুখ, দুঃখ, পাপ, পুণ্য, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, কৃতিত্ব, অসাফল্য সব আমার নিজেরই দোষ বা গুণ বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকি। তোমরা যখন সত্য পথে উঠ, তখন নিজেকেই ঊর্দ্ধগামী বলিয়া উপলব্ধি করি। তোমরা যখন অসৎ পথে নাম, তখন নিজেকেই অধঃপাত-বিপন্ন বলিয়া মনে করি। তোমাদের উত্থানে আমার উত্থান, তোমাদের পতনে আমার পতন। এই বোধ আমার এত তীব্র যে, তোমাদের চিন্তায় আমি আমার নিজের অশন, বসন, নিদ্রা ও বিশ্রাম বিস্মৃত হইয়া গিয়াছি।"

দাসত্ব ও ধ্যানজপ

অপর এক পত্রলেখকের নিকট শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"চেষ্টা দ্বারা, অভ্যাসের দ্বারা, অধ্যবসায়ের দ্বারা সাধন-ভজনে এমন রুচি সৃষ্টি করিয়া লও যেন বাধা-বিঘ্ন তোমাকে বিরত করিতে সাহস না পায়। যে নিজের নিশ্চিত পরাজয়কে জানে, সে হঠকারিতা করিয়া ভজন-বাদী হইতে সাহস পাইবে না। জগতে কোন্ ব্যক্তি শক্তের ভক্ত নহে? চাকুরীই কর

আর ব্যবসায়ই কর, প্রকৃত স্বাধীনতা কোথাও নাই, উভয়ত্রই দাসত্ব রহিয়াছে, তবে দাসত্বের রকম-ফের আছে। এমনকি ভিক্ষাটন করিয়া যে বৈরাগী অন্ন-সংস্থান করে, এক প্রকারের দাসত্ব তাহার চরণেও লৌহ-নিগড় পরাইয়া দিয়াছে জানিও। যিনি কাহারও নিকট কিছু চাহিবেন না বলিয়া জিদ্ করিয়া বৃক্ষতলে বা পর্ব্বতগুহায় বসিয়াছেন এবং নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে কাহারও নিকট কিছু পাইবার প্রত্যাশাটুকু পর্য্যন্ত অন্তরে পোষণ করেন না, দাসত্ব নাই তাঁর। পৃথিবীর সকল লোক কখনও নিরাকাঙ্ক্ষ নিঃস্পৃহ হইয়া যাইতে পারেন না, অতএব কোনও না কোনও প্রকারের দাসত্ব প্রত্যেকের উপরেই থাকিবে। উকিল-মোক্তার, ডাক্তার, কেরাণী, ব্যবসায়ী, দালাল, মুটে বা মজুর ইহাদের মধ্যে কেহই স্বাধীন নহে, কেহই স্বতন্ত্র হইয়া অন্যনিরপেক্ষ-ভাবে চলিতে পারে না, ইহারা প্রত্যেকেই অল্পাধিক দাস। উকিল-মোক্তার মক্কেলের অধীন, ডাক্তার তার রোগীর অধীন, কেরাণী বড় সাহেবের অধীন, ব্যবসায়ী তার গ্রাহকের অধীন, দালাল তার পাইকারের অধীন, মুটে বা মজুর স্থায়ী ভাবে কাহারও অধীন না হইলেও যতটুকু পথ বহিবার জন্য মোট নিয়াছে বা যে কয় রোজের জন্য কাজ নিয়াছে, ততটুকুর জন্য, সেই কয় রোজের জন্য তার কর্ম্মদাতার অধীন। এমনকি গণিকাও স্বাধীন নহে। সেও যে যখন তার অন্ন-বস্ত্র-ভূষণ যোগায়, তাহার অধীন। উদর

যতক্ষণ থাকিবে, পেটের চিন্তা যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ কোনও না কোনও ফিকিরে তোমার কিছু না কিছু দাসত্ব স্বীকার করিতেই হইবে। অতএব চাকুরী করিতেছ বলিয়া অনুতাপ না করিয়া চাকুরী সত্ত্বেও কি ভাবে ইহার ভিতর দিয়াই তোমার আসল প্রভু, চিরকালের প্রভু পরমেশ্বরের মন জোগাইয়া চলিতে পার, তার চেষ্টা দেখ। গোলামী যে করে, তার ঈশ্বর-সাধন বিঘ্ন-সঙ্কুল হয়। কেননা, মনিবের ভ্রূকুটির তীব্রতা বারংবার মনকে মথিত ও বিপর্য্যস্ত করে। ধ্যান করিতে বসিলে মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের মদনমোহন মুরতি নয়নসমক্ষে না জাগিয়া ভারত-বিদ্বেষী শ্বেতাঙ্গ-দুলালের মদ্যপান কষায়িত রক্তলোচনই মনে পড়ে, বংশীবদন শ্রীকৃষ্ণের কমনীয় মূর্ত্তি না জাগিয়া পাইপ-পরিশোভিত-বদন দণ্ডধারী বিদেশী-নন্দনের ক্রুদ্ধ মূর্ত্তিখানাই মনে পড়ে। কিন্তু উকিল, মোক্তার, ডাক্তার বা ব্যবসায়ীরই কি কম জ্বালা? ইষ্টধ্যান করিতে বসিয়া কেহ ধ্যান করিবে মিথ্যার, যে মিথ্যা আরোপ করিয়া নরহন্তাকে মুক্তি দেওয়া যাইবে, নিরপরাধকে ফাঁসীর দড়িতে ঝুলান যাইবে। কেহ বা ইষ্টনাম জপ করিতে করিতে ধ্যান চালাইবে কতখানি ময়দা-আটায় কতখানি শাদা পাথরের সুক্ষ্ম গুঁড়া বা তেঁতুল বীজচূর্ণ মিশান যায়, কতখানি সর্ষপ তৈলে কতটা মূলার তৈল বা শিয়ালকাটা বীজের তৈল ভেজাল দেওয়া যায়, কতখানি তিল বা নারিকেল তৈলে

কতটা হোয়াইট অয়েল অর্থাৎ গন্ধহীন কেরোসীন মিশাইলে গ্রাহকেরা ধরিতে পারিবে না, কতখানি চাউলে ডাইলে কতটা কাঁকর মিশান চলে, কতটা ঘৃতে কতটা সাপের চর্ব্বি, ব্যাঙের চর্ব্বি, জন্তু-জানোয়ারের চর্ব্বি মিশাইয়া দিলে শতকরা কত হারে লাভ বাড়িয়া চলিবে। মোট কথা, প্রাপ্তির লোভ যাহার আছে, তাহাকে এই বিভ্রাটে পড়িতেই হইবে। প্রাপ্তির লোভ যত কমিবে, ধ্যান তত জমিবে। সাধন-ভজনে তত দানা বাঁধিবে। সংসার প্রতিপালনের জন্য ধন প্রাপ্তির জন্য চেষ্টা কর, কিন্তু প্রাপ্তির লোভকে বর্জ্জন কর। লাভের যত লোভ বাড়িবে, মন তত চঞ্চল তত অস্থির হইবে। কিন্তু শ্রমের বিনিময়ে কিছু প্রাপ্তি না হইলে সংসার চলে না, দেহ বাঁচে না। অতএব দেহের প্রতি ও সংসারের প্রতি কর্ত্তব্য প্রতিপালনের জন্য শ্রম কর, প্রাপ্তিও পাও, কিন্তু লোভ, লোলুপতা, লালসাকে বর্জ্জন করিয়া তাহা কর। আংশিক দাসত্ব যখন অবশ্যম্ভাবী, তখন অনুশোচনা করিয়া অন্তরকে দুর্ব্বল করিও না। কিন্তু এই দাসত্বের ভিতর দিয়াও ইষ্ট-চিন্তাকে একাগ্র, একনিষ্ঠ ও প্রগাঢ়তম করিয়া লইবার জন্য চেষ্টা কর। এই চেষ্টা একদিনে বা দুই দিনে সফল হইবে না, কিন্তু পরিণামে অসফলও থাকিবে না। তোমার ইষ্ট যে তোমাকে ইচ্ছা করিলে অধিকতর অনুকূল পরিস্থিতিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন, এই বিশ্বাস রাখ। অবস্থার আনুকূল্য

তিনি বিধান করিবেন, তুমি শত প্রতিকূলতাকেও পরাজিত করিয়া অগ্রসর হইবার জন্য বদ্ধপরিকর হও। তাঁর পবিত্র নাম তোমাকে দেহে, মনে, বাক্যে এবং পারিপার্শ্বিকে ক্রমশঃ সবলতর করিয়া তুলিবে, ইহা নিশ্চিত জানিও।”

গীতাপাঠ

অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

“গীতাপাঠ করিতেছ শুনিয়া আনন্দিত হইয়াছি। আবৃত্তি-হিসাবে দৈনিক যতখানি পার করিও কিন্তু প্রত্যহই দুই চারিটী করিয়া শ্লোক বেশ গভীর ভাবে অর্থবোধ করিয়া পাঠ ও আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিবে। যে শ্লোক-কয়টীর অর্থবোধের চেষ্টা যেদিন করিবে, সেই দিন দিনে-রাতে সর্ব্বক্ষণ সেই অংশবিশেষের তাৎপর্য্যের বারংবার পর্য্যালোচনা মনে মনে করিতে চেষ্টা করিবে। ইহার ফলে তোমার অন্তরে এমন সকল অভিনব আলোকের সম্পাত ঘটিবে, যাহা তুমি কখনও কল্পনা পর্য্যন্ত করিতে পার না। গীতার নির্দ্দিষ্ট কোনও অধ্যায়কে তোমার পঠিতব্য বলিয়া ধরিয়া লইবার প্রয়োজন নাই। নিজেকে গোড়া হইতেই কর্ম্মী, ভক্ত বা জ্ঞানী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট একটা দলের মধ্যে ভর্ত্তি করিয়া লওয়া একান্তই অনাবশ্যক। গীতার উপদেশ জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের পরিপূর্ণ

সমন্বয়ের উপদেশ। শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে ভুলিয়া যাও। তোমার অন্তরদেবতা আর তুমি এই দুইজনে মিলিয়াই যে গীতার সংলাপ রচিয়াছ, এই কথা ভাল করিয়া ভাবিয়া লও। তারপরে গীতা পড়। যেই শ্রীকৃষ্ণকে কষ্ট করিয়া কল্পনা করিয়া ভগবানের অবতার বলিয়া ভাবিতে হয়, তোমার নিকটে সেই শ্রীকৃষ্ণ গীতার প্রবক্তা নহেন। তোমার অন্তরের আরাধ্য পুরুষই তোমার নিকটে গীতার প্রবক্তা। যেই অর্জ্জুন কুন্তীর নন্দন, যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতা, ভীষ্ম-দ্রোণ কর্ণাদির প্রতিপক্ষ, সেই অর্জ্জুনই গীতার শ্রোতা নহেন, তুমিই ইহার শ্রোতা, তোমারই অন্তরের সহস্র সংশয়ের গীতাতে সমাধান করা হইয়াছে, এই উপদেশ-বাণী তোমারই জন্য রচিত, গ্রথিত, প্রকাশিত,—এই বোধ নিয়া গীতা পড়িবে। শঙ্কর বা রামানুজ, তিলক বা অরবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণানন্দ বা গান্ধী ইহার কি ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা ভুলিয়া গিয়া, তুমি নিজের অন্তরে সহজ প্রজ্ঞায় ইহার কি অর্থ, কি বিস্তার, কি তাৎপর্য্য, কি মর্ম্ম, কি প্রভাব, কি আভাস ধরিতে পারিতেছ, তাহার প্রতি একদৃষ্টি হইবে। তোমারই অন্তরের সহস্র সংশয় সংক্ষিপ্ত ভাষায় ইহাতে প্রতিফলিত হইয়াছে, তোমারই সেই সংশয়ের বেড়াজাল হইতে বাহির করিয়া আনিবার জন্য সমাধানের দিব্যাস্ত্র-সমূহ ইহাতে সুকৌশলে সম্পুটিত রহিয়াছে। এই ভাব, এই বিশ্বাস নিয়া গীতা পড়িবে। চিত্তের উৎকর্ষ ও

আত্মার উদ্ধার এই ভাবেই হইবে। গতানুতিকের অনুসরণ করিয়া তুমি গীতা পড়িও না। গীতা পড়িবার জিনিষ নহে, ইহা আস্বাদন করিবার জিনিষ। তালমিশ্রির বিজ্ঞাপন পড়িলে মুখে মিঠা লাগে না, কিন্তু চাটিয়া খাইলে মিঠা লাগে। গীতার প্রত্যেকটী শ্লোককে আস্বাদনের দ্বারা নিজের কর। টীকা, ভাষ্য, টিপ্পনী বা ব্যাখ্যা পড়িয়া পড়িয়া পণ্ডিত হইবার ও পণ্ডিতের মান পাইবার লালসা হইতে দূরে থাকিও।"

দীক্ষাগ্রহণান্তে কর্ত্তব্য

অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"দীক্ষা দ্বারা ভগবন্নাম পাওয়াকে জীবনের মহত্তম ভাগ্য বলিয়া জানিও। মনে করিও, জীবন ধন্য হইয়াছে, ইহকাল ও পরকালের নিত্যানন্দ সুনিশ্চিত হইয়াছে। ইহার পরে আর জীবনের একটী মুহূর্ত্তও বৃথা বহিয়া যাইতে দিও না। প্রত্যেকটী মুহূর্ত্তকে ভগবন্নামের পবিত্র সেবার মধ্য দিয়া সার্থক কর। দীক্ষা নেওয়া একটা ছেলেখেলা নহে, ইহা জীবনের বৃহত্তম কর্ত্তব্যকে গ্রহণ করা এবং স্বীকার করা। সেই কর্ত্তব্য হইতেছে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ। দীক্ষা-গ্রহণকে একটা লোক-চল্‌তি ফ্যাসান মাত্র মনে করা ভুল, নিদারুণ ভুল। শুধু ফ্যাসানের দায়ে কাহাকেও গুরু মানিয়া তার নিকটে মাথা নত করা এক

মারাত্মক আত্মপ্রতারণা। দীক্ষা যখন নিয়াছ, নিজের সাধননিষ্ঠার গভীরতা, প্রগাঢ়তা, একাগ্রতা ও অনন্যমুখতা দ্বারা প্রমাণিত কর যে আত্ম-প্রতারণা কর নাই। যে নিজেকে প্রতারিত করে, সে জগৎকেও প্রতারিত করে। জগৎ তোমার প্রতারণা ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখিবে না, তুমিই কি তোমার প্রতারণাকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখিবে? প্রমাণ কর, তুমি নিজেকে প্রতারিত কর নাই, অতএব তোমা হইতে প্রতারিত হইবার ভয় এই জগতে একটী প্রাণীরও নাই। দীক্ষা হইতেছে সত্য-স্বরূপ ভগবানের পরম-পবিত্র নামকে জীবনের পরমাশ্রয়, পরমশরণ, পরম-অবলম্বন, আদি-অন্তহীন নিত্যকালের একান্ত বান্ধব বলিয়া স্বীকার করা। সেই স্বীকৃতিকে একনিষ্ঠ সাধনের দ্বারা সত্য বলিয়া প্রতিষ্ঠিত কর।"

শিষ্য ও অশিষ্যে সমব্যবহার

অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"কে আমার শিষ্য, কে শিষ্য নহে, সেবা দিতে গিয়া সেই বিচার আমি করি না। যে আমার শিষ্য নহে, সেই বরং আমার নিকটে অধিক সেবা, যত্ন এবং সতর্কতা দাবী করিতে অধিকারী, যেহেতু, ইচ্ছায়-অনিচ্ছায়, সাধনে-অসাধনে শিষ্যের ভিতরে আমার তপস্যা অজ্ঞাতসারে হইলেও কতকটা ফুটিয়া

উঠিবে। এই জন্যই দীক্ষা দিবার পরে তাহাকে একেবারে নিরঙ্কুশ-ভাবে ছাড়িয়া দিয়াও আমি পরম নিশ্চিন্ত। আমার নিকটে দীক্ষা নাও নাই বলিয়া আমি তোমাকে পর ভাবিব না। তুমি যে জীবন সার্থক করিবার জন্য পণ গ্রহণ করিয়াছ, ইহাই তোমাকে আমার পরম আপন করিবার পক্ষে যথেষ্ট। অনেক গুরু শিষ্যকে আপন বলিয়া মনে করিয়া থাকে ঐহিক নানাবিধ প্রাপ্তির লোভে। শিষ্যের নিকটে আমার কোনও ঐহিক প্রাপ্তির লোভ নাই। তাই আমি শিষ্য ও অশিষ্যে তারতম্য করি না। তুমি যাহার নিকটে ইচ্ছা দীক্ষা নিয়া আমার কাছে আসিও, অথবা গুরু কিম্বা দীক্ষায় বিশ্বাস না থাকে ত' দীক্ষা না নিয়াই আসিও, সর্ব্বাবস্থাতেই আমি তোমাকে আপনার আপন বলিয়া স্বীকার করিব। দীক্ষিত শিষ্যের প্রতি অধিকতর মায়া প্রদর্শনই হইতেছে সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি সৃষ্টির এক মূল নিদান। আমি এই সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে আচ্ছন্ন ভারতে নূতন বিষের সৃষ্টি করিতে চাহি না।"

সমবেত উপাসনা

জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় অনুষ্ঠান সমবেত উপাসনা। তোমার জিহ্বায় জড়তা আছে বলিয়া স্তোত্র বা কীর্ত্তনের

পদ উচ্চারণ করিতে পার না, কণ্ঠে সুর নাই বলিয়া আওয়াজ বেসুরা হয়। উত্তম। তুমি বরং চুপ করিয়া থাক, তবু সকলের সাথে সমবেত উপাসনায় স্থির মনে একাগ্র প্রাণে বসিয়া যোগ দাও। তাহাতেই আমি পরম আনন্দিত হইব। তুমি যখন সৎকার্য্যে দান করিবে, আমি তখন তোমাকে দীর্ঘজীবী হইবার জন আশীর্ব্বাদ করিব; তুমি যখন অজ্ঞানকে জ্ঞান বিতরণ করিবে, আমি তখন তোমার অমরত্ব প্রার্থনা করিব কিন্তু তুমি যখন সমবেত উপাসনায় আসিয়া যোগ দিবে, তখন আমি তোমাকে মাথায় লইয়া নাচিব। যে সমবেত উপাসনার প্রত্যেকটী সুযোগকে গ্রহণ করে, সে আমার পরমপ্রিয়।"

নামে নির্ভর

অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"জীবনকে নামের কোলে সমর্পণ কর। শিশুর মত নির্ভর নিয়া অনুক্ষণ মঙ্গলময় নামের আশ্রয়ে থাক। নির্ব্বিচার হইবে সেই নির্ভর, সুগভীর হইবে সেই নির্ভর। নামকে নিখিল জগতের সর্ব্বাশ্রয় এবং পরম-মঙ্গল-নিলয় বলিয়া জানিবে। নামের সেবক যে কখনও নির্জ্জিত হয় না, কোনও অবস্থায়ই যে তাহার পরাজয় নাই, এই বিশ্বাস দৃঢ় ভাবে পোষণ করিবে। ঝড়-ঝঞ্ঝায় সৃষ্টি উড়িয়া যাউক, প্রলয়কালীন

নিষ্ঠুর ভূকম্পে ব্রহ্মাণ্ড সমুদ্র-জলে ডুবিয়া যাক্ তুমি নাম ছাড়িও না। নামকে সমগ্র শক্তিতে আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকিবে।"

সাধিকা বিধবার প্রতি

অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"পতি-বিয়োগেও তুমি অধীরা হও নাই, বরং নামের সেবায় তোমার নিষ্ঠা বাড়িয়া গিয়াছে, এই হৃদয়গ্রাহী সংবাদে আশ্বস্ত এবং অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। নামই তোমার পতি এবং গতি। চিন্ময় নাম তোমার সকল প্রেমময় ভাবের নিত্যাধার হউন। এই পরম পবিত্র ভাব নিয়াই নামকে প্রাণপণ বলে আলিঙ্গন কর। নাম হউক তোমার সমস্ত ভাবাবেগের একমাত্র কেন্দ্র। হৃদয়ের সমস্ত প্রেম, প্রণয়, ভক্তি, ভালবাসা, সেবাবুদ্ধি ও শুশ্রূষাপরায়ণতা নামের মধ্যে অর্পণ কর। জীবনের উপরে পার্থিব লালসার অধিকারকে কোনও প্রকারেই বিস্তারিত হইতে দিও না। জীবনকে জানিবে পরমদেবতার পায়ে নিঃশেষে উৎসর্গীকৃত। জীবনকে জানিবে ভগবৎ-সেবার জন্য সম্পূর্ণ-রূপে নিবেদিত। এই জীবন আর তোমার নয়, ইহা তোমার পরমপ্রভু শ্রীভগবানের চরণে সর্ব্বতোভাবে সমর্পিত। নিজের সুখ তোমার কাম্য হইবে না। নিজের তৃপ্তি তোমার লক্ষ্য হইবে না। নিজের কৃতার্থম্মন্যতা তোমার বাঞ্ছিতা হইবে না। তোমার সাধ, তোমার আকাঙ্ক্ষা

আকাশ ব্যাপিয়া বাড়িবে শুধু তোমার সেই পরমপ্রেমিক পরমপ্রভুর অকপট সেবার জন্য। তোমার কোনও চিন্তা, কোনও বাক্য বা কোনও কর্ম্মেরই কেন্দ্র আর তুমি থাকিবে না, কেন্দ্র হইবেন তিনি।"

সেবার আকাঙ্ক্ষা ও আত্মশোধন

জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তোমার জনসেবার যে একটা আকাঙ্ক্ষা আছে, তাহা আমি অনুভব করিতেছি। কিন্তু বর্ত্তমানে সেই আকাঙ্ক্ষাকে তুমি যতটা গভীর মনে করিতেছ, তাহা প্রকৃতই ততটা গভীর কিনা, ইহা আমিও বুঝিতেছি না, তুমিও বুঝিতেছ না। জনসেবার মুখস পরিধান করিয়া অনেক সময়েই ব্যক্তিগত সুখের দাবী সযত্নে আত্মগোপনতার মধ্য দিয়া নিজেকে প্রকাশিত করিতেছে। ইহা বর্ত্তমান সভ্যতার একটা বিশেষ লক্ষণ। তুমি চাহিতেছ আশ্রমসেবা করিতে, গুরুসেবা করিতে, দেশসেবা করিতে। কয়েক দিন পরে এমনও দেখা যাইতে পারে যে, উল্লিখিত মহৎ সেবাত্রয়কে লঙ্ঘন করিয়া, আত্মসেবাই প্রধান হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং মূল উদ্দেশ্যের সততা ও সাধুতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য যদি আত্মসেবাকে

একটু ছাঁটিয়া কাটিয়া ছোট করিয়া নিবার তাগিদ আসে, তাহা হইলে যে-কোনও একটা কারণ দেখাইয়া তুমি আশ্রমসেবা, গুরুসেবা বা দেশসেবা প্রভৃতি সকল সেবারই দায় অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিবে। অনেক ক্ষেত্রে এইরূপ হইয়া থাকে। এই কারণেই তোমার জনসেবার আকাঙ্ক্ষা দর্শনে একদিকে যেমন উল্লসিত হইয়াছি, অপর দিকে তেমন কঠোর সতর্কতার আবশ্যকতাও উপলব্ধি করিতেছি। সেবার আকাঙ্ক্ষাকে দিনের পর দিন বাড়াইয়াই চল, কিন্তু সে আকাঙ্ক্ষার মাঝে যাহাতে ভেজাল আসিয়া মিশিতে না পারে, তাহার জন্য গভীর অন্তর্দৃষ্টি সহকারে আত্মশাসন এবং আত্মশোধন চালাইতে থাক। বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের উচ্ছ্বসিত উর্ম্মিমালার চঞ্চল আলোড়ন আমি দেখিতে ভালবাসি। কিন্তু পিপাসা তাহাতে মিটে না, নিঃক্ষোভ নিস্তরঙ্গ নির্ম্মল সলিলই সুপেয়-রূপে প্রাণ রক্ষা করে।"

সত্যনিষ্ঠার বড়াই

অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সত্যনিষ্ঠার বড়াই ভাল নহে। সত্যশীল হইতে চেষ্টা কর, কিন্তু বড়াই করিও না। সত্যনিষ্ঠার বড়াইও এক প্রকারের মিথ্যানুসরণ। আজ তুমি যে চতুর্দ্দিকের অনুকূল পারিপার্শ্বিক পাইয়া প্রতি কার্য্যে প্রতি বাক্যে সত্য রক্ষা

করিয়া চলিতে পারিতেছ, ইহা তোমার উপরে ভগবৎ-কৃপা বলিয়া জান। কালই হয়ত পরিবেশ-পরিবর্ত্তন ঘটিয়া যাইবে। কালই হয়ত চতুর্দ্দিকের আবেষ্টনে নূতন পাপ, নূতন বিভীষিকা, নূতন অস্বচ্ছন্দতা আসিয়া জুটিবে। চির-বিশ্বস্ত ব্যক্তি বিশ্বাস-ঘাতক হইবে, চির-সবল দুর্ব্বল হইবে, নিত্যকালের দাতা পরস্বাপহারী হইবে, জ্ঞানবৃদ্ধ মহাপুরুষ শিশুবৎ উন্মত্ত আচরণ করিবে, প্রিয় সুহৃৎ শত্রুর দলে যোগ দিবে, যাহাকে তুমি নিজের হাতে গড়িয়া পিটিয়া মানুষ করিয়াছ, সে তোমার অজ্ঞাতে তোমার পৃষ্ঠদেশে ছুরিকা বিদ্ধ করিয়া আত্মপ্রসাদ অনুভব করিবে। সে দিনও তুমি আজিকারই মত সত্যনিষ্ঠ থাকিতে পারিবে কিনা, তাহা কি তুমি জান? এজন্যই বলি, বড়াই করিও না। বড়াই ভাল জিনিষ নহে,—বড়াই এর ভিতরে ভেজাল থাকে। খাঁটি জিনিষ থাকে বিনয়ে।

বিনয় ও আত্মবিশ্বাস

"কিন্তু আত্মবিশ্বাস হারাইয়া যে বিনয়, তাহা বিনয়-পদবাচ্য নহে। তাহা অধোগতি, তাহা অধঃপতন, তাহা আত্মহত্যা। তুমি যে সত্যে স্থিতিশীল হইতে পার, সাধনার বলে যে এই অতুচ্চ অবস্থা তোমার অধিগম্য, এই বিশ্বাস অন্তরে রাখিতে হইবে। বিনয় ছায়া, আত্মবিশ্বাস কায়া। আত্মবিশ্বাস উজ্জ্বল, বিনয় সুশীতল। বিনয়ের অর্থ আত্ম-

বিলোপ নহে, পরন্তু নিজেকে, নিজের অস্তিত্বকে, নিজের কর্ম্মশক্তিকে, নিজের প্রভাব-ক্ষেত্রকে একটা অনবদ্য আদর্শের একান্ত অনুগত বলিয়া সস্নেহে স্বীকার করা। স্নেহের ভিতরে দর্প থাকে না, থাকে সুমিষ্টতা ও স্নিগ্ধতা।

দর্প বনাম আত্মবিশ্বাস

"প্রায়ই আত্মবিশ্বাসী লোকগুলির মেজাজ কড়া হইতে দেখা যায়। তাহার কারণ এই নহে যে, আত্মবিশ্বাসের সহিত দর্পের কোনও বর্গ আছে। আত্মবিশ্বাস আর দর্প এই দুইটী জিনিষে অনেক দূরত্ব, অনেক পার্থক্য। আত্মবিশ্বাস নিজেকে লইয়া আর নিজের কর্ত্তব্যকে লইয়া; দর্প পরকে লইয়া আর পরের কর্ম্মক্ষমতাকে লইয়া। আত্মবিশ্বাসী নিজেকে কোনও মহৎ কর্ত্তব্যেরই পক্ষে অযোগ্য বলিয়া পরিচিত হইতে দিতে নারাজ; আর দর্পী পুরুষ জগতের অপর কাহাকেও নিজ সমকক্ষ বলিয়া জ্ঞান করিতে অসম্মত। এস্থলে 'অসম্মত' কথাটার ধাতুগত অর্থ বুঝিও, অর্থাৎ অপরকে নিজের তুল্য জ্ঞান করিলে সে অসম্মান বোধ করে। আত্মবিশ্বাসে আর দর্পে এত তফাৎ!।

আত্মবিশ্বাসী ব্যক্তিদের মেজাজ রুক্ষ হয় কেন

"তথাপি যে আত্মবিশ্বাসী লোকগুলিকে অনেক সময়ে

রুক্ষ-মেজাজী দেখা যায়, তাহার কারণ এই যে, ইহাদিগকে অবিরাম সাধ্যের অতীতে শ্রম করিতে হয়। আত্মবিশ্বাসী অপরের নিরপেক্ষ, এই কারণে অপরের প্রতি তাহাদের ক্রোধ-দ্বেষাদিও কম। কিন্তু শরীর যদি সহ্যের শক্তিকে অতিক্রম করিয়া পরিশ্রম করে, তবে পিত্তাধিক্য ঘটিয়া মেজাজ ত' কড়া করিবেই। কিন্তু পরাধীন দেশে আত্ম-বিশ্বাসী ব্যক্তির কোনও বিশ্রাম হইতে পারে না। আত্ম-বিশ্বাস আছে বলিয়াই তাহার কর্ত্তব্য-জ্ঞান তীক্ষ্ণ। কর্ত্তব্যজ্ঞান তীক্ষ্ণ বলিয়াই তার ব্যক্তিগত সুখের দিকে তাকাইবার অবসর নাই। যে দেশে সহস্র সহস্র নরনারী হাতের কাছে অন্ন থাকিতেও অনাহারে প্রাণ ত্যাগ করে, সেই দেশের আত্মবিশ্বাসীদের নিদ্রাসুখ আর বিশ্রাম থাকিতে পারে না। তাই খাটিতে খাটিতে মেজাজ রুক্ষ হয়। তথাপি, মেজাজটীকে মিষ্টি রাখিবার চেষ্টা করা প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য।

মেজাজ মিষ্টি করিবার উপায়

"তাহার উপায়ও আছে। যে যত অধিক পরিমাণে ভগবানে নির্ভরশীল, তার মেজাজ তত মিষ্টি, তার মন তত কোমল, তার স্নেহশীলতা তত গভীর, তার অকপট প্রেম তত ব্যাপক। ভগবানকে ভাল না বাসিয়া কখনও তাঁহার উপরে নির্ভর করা যায় না। যাঁর প্রতি যার ভালবাসা যত বেশী, তাঁর প্রতি তার নির্ভরও তত বেশী। প্রেমসুন্দর

ভগবানকে ভালবাসিয়া প্রেমিক ব্যক্তি বড়ই প্রেমকোমল হন। ভগবানকে যে ভালবাসে, ভগবানে যে সর্ব্ববিষয়ে পূর্ণ নির্ভর দেয়, ভগবদিচ্ছা যে পরিণামে নিশ্চিত কুশলই আনয়ন করিবে, এই কথা যে সহস্র ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যেও অবিরাম স্মরণ করে, নিয়ত বিশ্বাস করে, তার কি মেজাজ রুক্ষ হইতে পারে? ক্ষণিকের জন্য মেজাজ করিলেও পরক্ষণেই সে হাসিয়া কথা কহে, প্রাণভরা ভালবাসা দিয়া আহত ব্যক্তির ক্ষতের ব্যাথা দূর করিয়া দেয়।"

আশ্রমবাসীর কর্ত্তব্য

আশ্রমবাসী জনৈক সহকর্ম্মীকে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সংসার ত' ছাড়িয়া আসিয়াছ কিন্তু 'চাই' 'চাই' রব কেন কমিতেছে না? সংসার ছাড়িয়া আসিয়াও সংসারের সকল আরামগুলি পূরাদমে প্রত্যাশা করিবে কেন? সংসারে থাকিলে নিজের শক্তি খাটাইয়া নিজের স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করিতে হইত। কিন্তু আশ্রমে আসিয়া কেন একথা মনে করিতেছ যে, পারুক আর না পারুক, আশ্রম-স্থাপয়িতাকেই তোমাদের সকল অভাব দূর করিয়া দিতে হইবে? আশ্রম-স্থাপয়িতার নিদারুণ শ্রম তোমরা চক্ষে শুধু দেখিবে, ইহাই কি তোমাদের আশ্রম-বাসের উদ্দেশ্য? আমি বলি, মস্তিষ্ককে

একটু খাটাও, যেন সে একটা পথ বাহির করিয়া দিতে পারে, যাহাতে তুমি নিজের শ্রম দ্বারা নিজের দায় কতক হ্রাস করিতে পার। আমি দুনিয়ার কাহারও নিকটে কিছুই চাহি না বা প্রত্যাশা করি না। এমতাবস্থায় তোমরা কেন আমার নিকটে চাহিবে বা প্রত্যাশা করিবে? তোমাদের ভিতরে স্বাবলম্বনের ভাব জাগরিত হউক। শুধু অযাচক সন্ন্যাসীর শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়া সমাজে কৌলীন্য দাবী করিবে কেন? নিজেরাও অপ্রার্থী, অযাচক, স্বাবলম্বী এবং কঠোরকর্ম্মা হও। আশ্রম আমি সঙ্কল্প করিয়া স্থাপন করি নাই, ইহা আপনা আপনি জন্ম লাভ করিয়াছে। কিন্তু এই আশ্রমকে আমি জগতে চিরস্থায়ীই করিয়া রাখিব, এমন কোনও দলিলও কাহাকেও লিখিয়া দেই নাই। আশ্রম হইয়াছে বলিয়া তোমরা আসিয়াছ। কিন্তু আসিয়াছ বলিয়াই যে নিজ নিজ পার্থিব অসুবিধাগুলির সবকিছু দূর করিয়া দিতে আমাকে বাধ্য করিবে, ইহা সঙ্গত নহে। আশ্রমে যখন আসিয়াছ, আশ্রমের পক্ষে প্রয়োজনীয় হও, আশ্রমের পক্ষে ভার বা গলগ্রহ হইও না। এই আশ্রম চিরকালই থাকিবে কিনা, কেহ বলিতে পারে না। অন্ততঃ ইহার স্থায়িত্ব বা অস্থায়িত্ব সম্পর্কে আমি কখনও কোনও সঙ্কল্প বা বিকল্পের অধীন হই নাই। তদবস্থায় তোমরা প্রত্যেকেই আশ্রমের চিরস্থায়ী অন্তেবাসী রহিবে, ইহা মনে করিতে বসা এক মারাত্মক আশাবাদিত্ব হইবে। হয়ত

একদা সংসারের জরুরী কর্ত্তব্য উদ্‌যাপনের জন্য গৃহে ফিরিয়া যাইবে। কিন্তু এখানে যদি নিজেকে কাজের লোক রূপে প্রমাণিত করিতে প্রয়াস পাও, তবে সেই চেষ্টার সুফল তোমার সঙ্গে সঙ্গে তোমার সংসারে যাইবে। তাহাতে তোমার পরবর্ত্তী জীবনের বহু কর্ম্মেই কার্য্যকুশলতার ছাপ পড়িবে,—তুমিও লাভবান্ হইবে, তোমার পরিবার বা সমাজ উভয়ও সঙ্গে সঙ্গে লাভবান্ হইবে। সুতরাং সর্ব্বপ্রযত্নে অন্তরের আলস্য-পরায়ণতা দূর কর এবং লোভ কমাও। অনালস্য এবং নির্লোভতা এই দুইটী গুণকে আশ্রমবাসের পক্ষে একান্ত আবশ্যকীয় বলিয়া জানিও।"

বিঘ্ন-বিপত্তিতে নাম-স্মরণ

অপর এক পত্রলেখকের পত্রের শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"কোনও বিঘ্ন-বিপত্তিতেই নিজেকে বিব্রত হইতে দিও না। দুর্য্যোগের প্রতি উদাসীন দৃষ্টিতে তাকাও। যাহা হইবার হউক, তুমি সত্যস্বরূপ নামের শরণ লইয়া নির্ভয় হও। নামকে জানিবে তোমার মাতা, পিতা, বন্ধু এবং উদ্ধারকর্ত্তা। নামকে জানিবে পরম আশ্রয়দাতা, পরমশরণ। ভগবন্নাম তোমার যত আপন, এমন আপন তিন ভুবনে আর কেহই নাই।"

দোষ ও ক্ষমা

অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"দোষ করিয়া ক্ষমা-ভিক্ষা করার ভিতরে বিনয় থাকিতে পারে, অনুতাপ থাকিতে পারে কিন্তু কোনও বাহাদুরী নাই। অপরাধ-প্রবণতা যাহাতে চিরতরে দূরে যায়, তাহার জন্য আপ্রাণ প্রয়াসও চাই। দোষ করিয়া ক্ষমা না চাওয়া এক নিদারুণ মূর্খতা, কিন্তু দেহ, বাক্য ও মন যাহাতে অপরাধের পথে আর না ধাবিত হয়, তাহার জন্য বজ্রকঠোর সঙ্কল্প চাই। এই কথা মনে রাখিয়া আত্মসংশোধনের পথে অগ্রসর হও।"

কবিতা রচনা

অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তোমার রচিত সঙ্গীত-সমূহ পাঠ করিয়া প্রীত হইলাম। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলিই এখনও ছাপাইবার যোগ্য হয় নাই এবং কতকগুলি আংশিক সংশোধনের পরে মুদ্রণালয়ে প্রেরণ করা চলিতে পারে। একটী রচনাও একেবারে নিখুঁত হয় নাই। তথাপি আমি তোমাকে এই সকল রচনার জন্য সম্বর্দ্ধনা জানাইব। তোমার ভিতরে ভাব আছে, তোমার

ভাষায় কোমলতা আছে, ত্রুটী মাত্র ছন্দের। স্থানে স্থানে প্রাণের ভাব সুস্পষ্ট হইয়া প্রকাশিত হইতে পারে নাই, বড়ই জটিল ও গ্রন্থিল পথে চলিয়াছে। কিন্তু তবু আমি তোমাকে উপদেশ দিতেছি যে, লেখার অভ্যাস ছাড়িয়া দিও না। অন্তরে যখন যে মহান্ ভাবের আলোড়ন উপলব্ধি কর, আবেগ আসা মাত্রই তাহা অক্ষরে নিবদ্ধ করিয়া ফেলিও। তুমি হয়ত জগতে মহাকবি নাম রাখিয়া যাইতে পারিবে না, কিন্তু তোমার ঐ ভগ্ন ভাষার মগ্ন ভাব একদা হয়ত কোনও মহাকবির আবির্ভাবের কারণ হইবে। বাল্মীকি, কালিদাস বা রবীন্দ্রনাথ যাহারই নাম কর, ইহারা সকলেই পূর্ব্ববর্ত্তী নিকৃষ্টতর কবিদের অস্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত ভাবকে স্পষ্টতর ভাবে নূতন সৌন্দর্য্যে প্রকাশ করিয়াছেন। কেহই নিজে নিজে স্বপ্রতিষ্ঠ নহেন, প্রত্যেকেই পূর্ব্ববর্ত্তীদের অমার্জ্জিত ভাবকে ঘসিয়া মাজিয়া সুশ্রী করিয়াছেন। বটতলার পুঁথির লেখকেরাই বাঙ্গলার অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ কবির প্রকৃত জন্মদাতা। অতএব নিজ অপটুতায় আড়ষ্ট হইয়া থাকিও না, ইহার ভিতর দিয়াই হাত-পা নাড়িতে থাক। দৈনিক দুই চারি চরণ করিয়া লিখিয়া যাও। রচনার প্রয়াসের ভিতর দিয়া তুমি তোমার নিজের অন্তর-পুরুষের হয়ত সাক্ষাৎকার একদিন পাইয়া যাইবে। পরমনোরঞ্জনও নহে, যশোলাভও নহে, নিজের অন্তর-পুরুষের সাক্ষাৎকার-লাভই কবির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার। তুমি এই পুরস্কারের সম্ভাবনাটীকে নিবারণ করিও না। কবি-

যশোলোভে নয়, নিজের অন্তরের ভাবকে নিজের নিকটে খুলিয়া ধরিবার জন্যই লিখিও। তোমার অন্তরে এক মহাকবি ঘুমাইয়া আছেন, তাঁহাকে লেখনীর আঘাতে আঘাতে জাগাইয়া তোল।"

ভগবানেরই গান ভগবান শোনেন

অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তর শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"কি আমার ইচ্ছা করে, জান? দীন-ধনী বিচার না করিয়া প্রত্যেকটী গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ভ্রমণ করিয়া বেড়াই, তোমাদের সকলের সুখ-দুঃখের, শান্তি-অশান্তির খবর লই, সকলের প্রাণের কথা শুনি, সকলকে প্রাণের কথা শুনাই। আমার প্রাণের কথাটী যে কি তাহা অবশ্য তোমরা কেহ কেহ জান। ওঠ, জাগ, মোহনিদ্রা পরিহার কর, নিজের দিকে তাকাও, বিশ্বের দিকে তাকাও, বিশ্বপতির দিকে তাকাও,—ঘরে ঘরে এই বাণী ছড়াইয়া বেড়াইবার জন্য আমি কি যে আকুলতা অনুভব করিতেছি, তাহা মানবের অসম্পূর্ণ-ভাষার সাহায্যে কি করিয়া তোমাকে বুঝাইব। বন, পাহাড়, মরুভূমি, উপত্যকা, অধিত্যকা ও সাগর চতুর্দ্দিক হইতে আমাকে অবিরাম কেবলই ডাকিতেছে,—এস বন্ধু,

এস, তোমার প্রাণের গোপন কথা আমাদের কাণে কাণে আসিয়া বলিয়া যাও, অনন্ত যুগ ধরিয়া আমরা তোমার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি। ব্রাহ্মণ-বৈদ্যের গ্রাম, মুচি-মেথরের গ্রাম, সকল গ্রাম আমাকে যুগপৎ ডাকিতেছে, সকল দিক হইতে টানিতেছে। * * * ডাক সকল দিক্ হইতে আসিলেও আমি আমার নিজের উপর কর্তৃত্ব কিছুই রাখি নাই। আমি নিজেকে পরমেশ্বরের হাতে ছাড়িয়া দিয়াছি, সঁপিয়া দিয়াছি। তিনি আমাকে ঘটনাবলির আবর্ত্তনে যেখান হইতে যেখানে নিয়া ফেলিবেন, আমি সেখান হইতেই সেই স্থানে যাইব এবং তাঁহার মধুর অমৃতময় নাম কীর্ত্তন করিয়া সকলকে শুনাইব। আমাকে তিনি যে গান গাহিবার ভার দিয়াছেন, মাত্র সেই গানটীই গাহিব, কোন্ আসরে, কেমন আসরে আনিয়া তিনি ফেলিবেন, তাহার বিচার করিব না। উচ্চ নীচ সকল শ্রোতা আমার নিকটে সমান শ্রোতা, সবাই আমার পরম আপন এবং প্রাণের ধন। ইহাদের কাছে কথা কহিয়া, গান গাহিয়া আমি আমার পরমপ্রভুর কাছেই কথা কহি, গান গাহি। একথা ভাবিতে কত যে আমার আনন্দ, কত যে আমার উল্লাস, তাহা তোমাকে বুঝাই আমি কি করিয়া? যাহা বুঝাইতে পারিব না, তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াই বা লাভ কি? আমার কণ্ঠে ভাষা দিয়াছেন তিনি, সুর-সংযোগ করিয়া দিলেন তিনি, তাঁরই গান তাঁরই ভাষায় তাঁরই সুরে তাঁকে শুনাইবার জন্যই গাহি। গাহিয়া শূন্য হৃদয় পূর্ণ করি,

তপ্ত হৃদয় শান্ত করি,—আমারও করি, তোমাদেরও করি। এই কারণেই আমার ক্লান্তি নাই, শ্রান্তি নাই, বিশ্রামের জন্য লোলুপতা নাই, অনিদ্রায় কাতর হই না, অবিশ্রান্ত শ্রমে দুর্ব্বলতা বোধ করি না। প্রেমময়ের দেওয়া জিনিষ আমার মহৎ ভাগ্যে পরম পুণ্যে প্রেমময়ের সেবায় লাগিয়া যে যাইতেছে, ইহাতেই আমার সমগ্র চিত্ত আত্মপ্রসাদে ভরিয়া ওঠে। ধন্য সে ভগবান্ যিনি এই ভাবেতে নিজের ইচ্ছা পূর্ণ করেন।"

জীবনের পরীক্ষা

জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"স্কুল বা কলেজের পরীক্ষাই জীবনের একমাত্র পরীক্ষা নহে। ইহা অপেক্ষা বৃহত্তর, মহত্তর ও জটীলতর পরীক্ষা আছে। সেই পরীক্ষা-সমূহে তোমাকে কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইতে হইবে, এই কথা সর্ব্বদা স্মরণে রাখিবে। আমি আশীর্ব্বাদ করি, কোনও পরীক্ষাতেই যেন তুমি অকৃতকার্য্য না হও। যে জীবন যত মহৎ, সেই জীবনে পরীক্ষা তত বেশী। যে জীবন যত বিশাল, সেই জীবনে পরীক্ষার দৌরাত্ম্য তত বেশী। মহৎ হইবে, শ্রেষ্ঠ হইবে, এই আকাঙ্ক্ষা অনুদিন অনুক্ষণ অন্তরে পোষণ কর। শত শত বিঘ্ন-বিপত্তি-গ্রন্থি-সঙ্কুল মারাত্মক পরীক্ষাও তোমাকে অনুত্তীর্ণ রাখিয়া যাইতে পারিবে

না, এমন ভাবে নিজ অধ্যবসায়কে পরম নিষ্ঠার সহিত প্রযুক্ত কর। ভগবানে বিশ্বাস রাখিও, ভগবদ্দত্ত বাহুবলে বিশ্বাস রাখিও। ভগবানে যে বিশ্বাস রাখে, জীবনে তাহার পরাজয় অসম্ভব। ভগবানে যে বিশ্বাস রাখে, আত্মশক্তিতে তাহার অবিশ্বাস অসম্ভব।"

সংসারের কর্ত্তা

অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সমগ্র পরিবারটীকে মহান্ আদর্শের অনুগত রাখিবার চেষ্টা করার দায়িত্ব জানিও সর্ব্বাগ্রে তাহার, যাহার উপরে সংসারের নেতৃত্বভার ন্যস্ত হইয়াছে। 'সংসারের কর্ত্তা' এই কথাটা শুনিতে বড়ই চমৎকার। কিন্তু কর্ত্তা যদি নিজের দায়িত্ব নিজে বোঝেন, তাহা হইলে আর নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করিতে পারেন না! সংসারের যিনি কর্ত্তা, তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে সংসারের আশ্রিত প্রত্যেকটী জীবের সেবক। একটী ক্ষুদ্র বিড়ালছানা বা কুকুরের বাচ্চাও তাঁহার সেবার দাবী করিয়া বেড়াইবে। কর্ত্তা হওয়া প্রকৃত প্রস্তাবে সেবক হওয়া, জানিও। লোকে 'কর্ত্তা' 'কর্ত্তা' বলিয়া হাঁক কপচায় বলিয়াই মনে করিও না যে, খুব বড় একটা কিছু হইয়া গিয়াছ। বরঞ্চ জানিও যে, পর্ব্বতের এমন একটা উদ্গত অংশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছ, যেখানে একটুখানি অসতর্কতার দরুণ

অনন্ত নিম্নে গভীর গহ্বরে পতিত হইয়া মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতে পারে।"

আমিত্ব-বোধ-মুক্ত হও

অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"কেন মনকে দুর্ব্বল হইতে দিতেছ? মনকে শক্ত কর, দুর্ব্বলতা দূর কর। ভগবানকে কর তোমার প্রত্যেকটী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অধিপতি। তাঁহাকে জানিয়া লও তোমার সর্ব্বেশ্বর বলিয়া। নিজের উপর হইতে সকল দায়িত্ব তুলিয়া নাও। তোমার-সব-কিছুর দায়িত্ব তাঁর চরণে অর্পণ করিয়া তুমি আমিত্ব-বোধ-মুক্ত হও। যে আমিত্ব বোধকে বলি দিতে পারে, তার সর্ব্বদোষ ভগবান্ নিজের হাতে ক্ষালন করিয়া দেন। অবশ্য, ভগবানকে সর্ব্বাধিপতি করিয়া লইতে সাহস লাগে, বলের প্রয়োজন হয়। কিন্তু সেই সাহস ও সেই বল তাঁর কাছেই চাহিয়া লও।"

মহৎ কর্ম্মের সহযোগী

অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"মহৎ ব্রত উদ্‌যাপনে মহান্ পুরুষের সহকর্ম্মী-রূপে আত্মপ্রকাশ করিবার অভিলাষ করিতেছ। মনে রাখিও, বড়

লোকের পিছনে হাটিলেই তাঁহার প্রদত্ত কর্ম্মের ভার গ্রহণের যোগ্যতা হয় না। যোগ্যতা হয়, তাঁহার পরিপূর্ণ বিশ্বাস অর্জ্জন করিতে পরিলে। কিন্তু বিশ্বাস যে তুমি পাইবে, তাহা কি কেবল বাহিরের চটকে? অনুগত হইয়া সর্ব্বকর্ম্মে প্রাণান্ত সহযোগিতা দিয়া চাতুরীবর্জ্জিত অকপট সরল ব্যবহারের মধ্যবর্ত্তিতাতেই বিশ্বাসের পাত্র হইতে হয়। তোমরা ত' অনেকেই দুঃখ করিতেছ যে, কেহই বৃহৎ কর্ম্মের ভার পাইলে না। কিন্তু ভার পাইবার যোগ্য কে কতখানি হইয়াছ, তাহা আগে বিচার কর। লম্বা লম্বা বচন ঝাড়িতে পারিলেই কেহ বিশ্বাসের পাত্র হয় না। তোমাদের অনেকেরই নিষ্ঠা জলের তিলকের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী। একটা কাজে দৃঢ় বিক্রমে কয়দিন লাগিয়া থাকিতেছ? একজনের প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধা কয়টা দিন নির্ব্বিচারে পোষণ করিতে পারিতেছ? আজ যাঁর নাম করিয়া দুনিয়ার হাজার লোককে লাঞ্ছনা দিতেছ, কাল যে তাঁরই গলদেশে পাদুকার হার পরাইয়া দিবার ষড়যন্ত্রে মাতিতেছ, তোমাদের এই চপলতার ত' স্বাভাবিক ফলই হইল মহৎ কার্য্যের ভার পাইবার অযোগ্যতা। অযোগ্যকে বিশ্বাস করিবে কে? ভালবাসা যাঁহার স্বভাব, তেমন প্রেমময় পুরুষ অযোগ্যকেও ভালবাসিতে পারেন, কিন্তু গুরুদায়িত্ব অর্পণ করিতে পারেন না। হৃদয়জীবি মহাপুরুষ কলসীর কাণা মারিলেও প্রেম বিলাইতে পারেন, অকৃতজ্ঞকেও ক্ষমা

করিতে পারেন, কৃতঘ্নের প্রতিও দয়া প্রকাশ করিতে পারেন, কিন্তু যে কার্য্যে বিশ্বাসের প্রয়োজন, তেমন কার্য্যের দায়িত্ব দিতে পারেন না। এই কথা স্মরণে রাখিয়া নিজের চরিত্রকে এমন করিয়া গঠন ও সংশোধন কর যেন ইহার ভিতরে কণামাত্র অকৃতজ্ঞতা, কৃতঘ্নতা ও অবিশ্বস্ততা না থাকিতে পারে। এম-এ, পি-আর-এস্ সকলে হইতে পারে না, কিন্তু বিশ্বাস-পাত্র হইবার যোগ্যতা সকলেই অর্জ্জন করিতে পারে।"

নিষ্ঠার শক্তি

অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"নিত্য নূতন পথের পরিবর্ত্তন ভাল নহে। এই পথেই প্রগাঢ় নিষ্ঠা নিয়া চলিবার শক্তি তোমাদের মধ্যে আমি দেখিতে চাহি। একবার বুদ্ধি-বিবেচনা-বিচার-পূর্ব্বক যে পথকে ধরিয়াছ, তাহা প্রাণান্তেও পরিত্যাগ করিবে না। কথায় বলে, লাগিয়া থাকিলে মাগিয়া খায় না। যে বস্তুকে অবলম্বন বলিয়া ধরিয়াছ, তাহা সবলে ধর, এমন বলে ধর যেন দেহ হইতে প্রাণ বহির্গত হইবার পূর্ব্বে হস্ত-মুষ্টি শিথিল না হয়।

আশ্রম-বাস তথা মাতৃপিতৃসেবা

অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"আশ্রমে ত' আসিতে চাহিতেছ, কিন্তু বাছা শূন্যোদরে ত' আশ্রমবাস সম্ভব নহে। আমি তোমাদের অন্নের ব্যবস্থা আমার আশ্রমে করিতে পারি নাই। আকাশ হইতে যাহা আসে, তাহা আমার মত অনশনাভ্যস্ত ব্যক্তির পক্ষেই পর্য্যাপ্ত, তোমরা তাহার অংশ মাত্র নিয়া প্রাণ ও দেহকে একত্র রাখিতে পারিবে না। অবশ্য বলিবে যে, না খাইয়াই আশ্রমে বাস করিবে, তোমাদের অন্নের জন্য আমাকে কোনও চিন্তা, চেষ্টা বা উদ্বেগ করিতে হইবে না। এরূপ আরও অনেকেই বলে দেখিয়াছি। কিন্তু এই বলার ভিতরে সরলতা থাকিলেও দূরদর্শিতা নাই। অন্নের প্রাচুর্য্যে সমৃদ্ধ প্রতিষ্ঠান যতগুলি কর্ম্মীকে ধরিয়া রাখিতে পারে, অন্নহীন প্রতিষ্ঠান তাহা পারে না। মানুষ কেবল উচ্চ উচ্চ আদর্শবাদ দিয়াই বাঁচে না, আদর্শকে অনুশীলন করিবার জন্যই দেহের ভিতরে প্রাণকে জীয়াইয়া রাখিবার বন্দোবস্তটুকু একান্ত প্রয়োজনীয়।

"আশ্রম-বাসের উদ্দেশ্য ত' চিত্তশুদ্ধির অনুশীলন করা? বর্ত্তমানে যে স্থানে আছ, একটুকু বুদ্ধি খাটাইয়া চলিলে সেখানেই চিত্তকে ঈশ্বরোন্মুখ রাখিবার প্রকৃষ্ট উপায় পাইবে। ওখানে এত বাধা তোমার নাই যে, পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিতে হইবে। বৃথা স্থানে স্থানে দৌড়াদৌড়ি করিয়া লাভ কি? একটী স্থানে থাকিয়াই নিখিল বিশ্বের সম্পদরাজি আহরণ করিয়া আনা যায়। একটী স্থানে বসিয়াই নিজের

ভিতরে চুম্বকের শক্তিকে বিকশিত করিতে যত্নবান্ হও। চতুর্দ্দিক হইতে তোমার আহরণীয় সকল সদ্‌গুণ আপনা হইতে ছুটিয়া তোমার কাছে আসিবে। সদ্‌বিষয়ের অনুশীলনের জন্য নানা স্থান ভ্রমণ সকল সময়েই প্রয়োজনীয় নহে, কখনও কখনও তাহা সম্পূর্ণই নিষ্প্রয়োজন হইয়া থাকে। যাহার প্রকৃতই আবশ্যকতা, তাহা হইতেছে, দৃঢ়, একনিষ্ঠ, কৃতসঙ্কল্প মন। মনকে কঠোর-সঙ্কল্প কর। নানা স্থানে দৌড়াদৌড়ির প্রয়োজন ইহার ফলেই কমিয়া যাইবে।

"নিজ মাতা এবং নিজ পিতার চরণসেবা-রূপ পবিত্র কর্ত্তব্যকে উপেক্ষা করিয়া সাধুদের আশ্রমে যাইয়া উপনিবেশ স্থাপনকে আমি খুব একটা প্রশংসার দৃষ্টিতে দর্শন করি না, জানিও। মাতা ও পিতা এই পৃথিবীর প্রথম প্রত্যক্ষ গুরু। তাঁহাদের অকপট সেবার ভিতর দিয়া অন্তরের শিষ্যত্বের ক্ষেত্রকে হল-কর্ষিত কর; যে মাতৃ-পিতৃ-নিষ্ঠ নয়, সে অকপট গুরুনিষ্ঠ কি করিয়া হয়, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। মাতৃ-পিতৃ-ভক্ত ব্যক্তির চিত্তের স্বাভাবিক মাধুর্য্য তাহাকে অকপট গুরুভক্তির সামর্থ্য যোগায়। সুতরাং সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় করিয়া জীবনকে পরমোন্নতির পথে ধাবিত করা যদি তোমার প্রকৃতই অভিপ্রায় হইয়া থাকে, তাহা হইলে আগে 'মাতৃদেবো ভব' 'পিতৃদেবো ভব' তারপরে দেখিও 'আচার্য্যদেবো ভব' কথাটী জীবনে ফুটিয়া উঠিতে অধিক বিলম্ব হইবে না।"

বিশ্বাস-ঘাতকতার পাপ

জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"মানুষের প্রতি মানুষের বিশ্বাস অটুট থাকে কখন জান? যখন একে অপরের বিশ্বাসকে আঘাত না করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টায় যতমান থাকে এবং কেহ কাহারও বিশ্বাসের কোনও অপকৃষ্ট সুযোগ নিবার চেষ্টা না করে। সহজ সরল বিশ্বাসের মাঝে নানা কুটিল কৌশল আমদানী করিয়া যখন একে অপরের নিকটে নিজের সত্য পরিচয় গোপন করিয়া রাখিবার চেষ্টা করে এবং ঝোপ বুঝিয়া কোপ মারিবার জন্য ওৎ পাতিয়া থাকে, জগতে অবিশ্বাসের কাজ তখন হইতে সুরু হয়। তোমরা আর যাহাই কর, কাহারও প্রতি কোনও কারণেই বিশ্বাস-ভঙ্গ করিও না। বিশ্বাসঘাতকতার চেয়ে বড় পাপ জগতে আর কিছুই নাই।"

ভগবানে আত্ম-সমর্পণ ও জগতের প্রতি কর্ত্তব্য

অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"শ্রীভগবানে আত্ম-সমর্পণই জীবনের চরম চরিতার্থতা। যত কিছু সাধন-ভজন, যত কিছু যোগ-তপস্যা, যত কিছু

ত্যাগ ও দান, সবকিছুর একমাত্র লক্ষ্য হইতেছে আত্ম-সমর্পণ। যতক্ষণ ভগবানে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ না আসিল, ততক্ষণ এই সকল অনুশীলনের প্রকৃত ফল লব্ধ হইয়াছে বলিয়া মনে করা যাইবে না। আত্মসমর্পণ আসিলেই সব কিছু সফল হইল। জীবনের এই পরম লক্ষ্যের প্রতি সমগ্র দৃষ্টি নিবদ্ধ কর। বাহিরের সহস্র পার্থিব ও ক্ষণিক কর্ত্তব্য-রাজির কোলাহলের মাঝে মেরুদণ্ড সরল ও মন-প্রাণ সজাগ রাখিয়া অন্তরের অন্তরে পরম-প্রেম-বিগ্রহ শ্রীভগবানের শ্রীচরণের দিকে বীর-বিক্রমে অগ্রসর হও। সর্ব্বজীবে অভয় প্রদানই তোমার কর্ম্ম-সাধনা। সকল জীবের প্রাণে অভয় এবং শান্তি বিতরণ করিতে করিতেই তুমি ভগবৎ-পাদপদ্মে লীন হও। জীবনের এই শ্রেষ্ঠ সার্থকতার কথা কখনও ভুলিও না এবং জগতের প্রতি এই মধুময় কর্ত্তব্যের বিষয়ে কখনও অনবহিতও হইও না। এই ধরণীর শ্যামল বক্ষে নামিয়া আসিয়াই তুমি ভগবানকে ডাকিবার, তাঁহাকে পাইবার পথের নির্দ্দেশ পাইয়াছ। এই ধরণীর প্রত্যেকটী পুত্রকন্যার প্রতি তোমার প্রেমময়, স্নেহময়, মধুময়, সুকোমল মনোভাব উপজাত হওয়া একান্ত আবশ্যক এবং ভগবৎ-পাদপদ্মে আত্মসমর্পণের ইহাই অত্যাশ্চর্য্য এবং সু-স্বাভাবিক পরিণতি এই যে, 'একজনারে বাস্‌লে ভাল বিশ্বভুবন আপন তোর।' ভগবানকে প্রাণের প্রাণ বলিয়া জানিলে জগতের সকল

ছোট-বড় ও উচ্চ-নীচ প্রাণী তোমার একান্ত আপন হইয়া যাইবে। 'কাহাকেও দুঃখ দিব না, কাহাকেও ব্যথিত করিব না',—জীবনের পথে ইহাই হইবে তোমাদের একান্ত মনোভঙ্গী। কেহ যদি নিজের দোষে ব্যথা পায় বা দুঃখ ভোগে, তবে তাহা তুমি নিবারণ করিতে সকল সময়ে পারিবে না, কিন্তু কেহ যেন দুঃখ না পায়, ব্যথায় না ভোগে, এই প্রার্থনা তুমি অবিরাম করিয়া যাইবে। ভগবচ্চরণের পরমা শান্তির সন্ধানে ছুটিয়া যাইবার কালে ভগবানের সকল ব্যথিত পতিত সন্তান-সন্ততির জন্য ব্যাকুল প্রার্থনাটী অবশ্যই জানাইয়া যাইবে যে,—'হে ভগবান, ইহারাও তো তোমারই সন্তান, ইহাদের মুখপানেও তুমি পরম করুণাভরে তাকাইও প্রভু।' ভগবানকে শুধু তোমার নিজের আত্মসমর্পণের জন্যই চাহিও না, চাহিও নিখিল জগতের সকলের নিত্যশুভের জন্য, নিখিল জগতের সকলের আত্মসমর্পণের জন্য।

আত্ম-সমর্পণ বনাম আত্ম-সুখ

"আত্ম-সমর্পণের সহিত আত্ম-সুখের একটা চিরস্থায়ী কলহ আছে। আত্ম-সুখী জীব ভগবানকে চাহে নিজের সুখের জন্য, আর প্রকৃত আত্ম-সমর্পণ আসে নিজ-সুখের প্রতি সম্যক্ ঔদাসীন্য হইতে। ভগবানের চরণে যে আত্ম-নিমজ্জন করিবে, তাহা শুধু ভগবানেরই পরিতৃপ্তির জন্য, জানিও। তিনি

তোমাকে জীবরূপে জগতে পাঠাইয়া দিয়া পুনরায় তাঁহারই ভিতরে তোমার পরিপূর্ণ আত্মদানের প্রতীক্ষায় দিন গণিতেছেন।"

বিদ্যাভ্যাস ও উপাসনা

অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"ছাত্রজীবনে বিদ্যাভ্যাসের অপেক্ষা মহত্তর কর্ত্তব্য তোমাদের আর কি আছে? কিন্তু পড়াশুনার সহস্র চাপের মধ্যেও নিজের উপাসনার প্রতি প্রখর নিষ্ঠা এবং লক্ষ্য তোমাকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। পড়াশুনা সাধারণতঃ ঐহিক উন্নতির জন্য অবশ্যকরণীয় কিন্তু উপাসনার শুভফল ঐহিক এবং পারত্রিক উভয়বিধ। বিদ্যালয়ের পড়াশুনা প্রধানতঃ পার্থিব বিদ্যা লইয়াই সীমাবদ্ধ বলিয়া পার্থিব উন্নতিতেই তাহার ফলও সীমাবদ্ধ। সর্ব্ববিদ্যার শ্রেষ্ঠ বিদ্যা যে ব্রহ্মবিদ্যা তাহা গ্রন্থাদি অধ্যায়ন ব্যতীতও একমাত্র নিয়মিত উপাসনার ফলে করামলকবৎ আয়ত্ত হইয়া থাকে। উপাসনা-পরায়ণ সাধনশীল ব্যক্তিরা যে ব্রহ্মবিদ্যা-সম্পর্কিত গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করেন বা তাহাদের পাঠ শ্রবণ করেন, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে বিদ্যা লাভের জন্য নহে, পরন্তু নিজেরা সাধন করিতে করিতে যখন তত্ত্বের যেরূপ সাক্ষাৎকার পান, তাহার সহিত প্রাচীনের ঋষিদের নিজস্ব অনুভূতির কি মিল রহিয়াছে, তাহা

অনুধাবনের জন্যই উহা করা হইয়া থাকে। শাস্ত্রাদি পাঠে পূর্ব্বাচার্য্যগণের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি-সমূহের বিশালতা, ব্যাপকতা এবং গভীরতা দর্শনে নিজের ক্ষুদ্রতর উপলব্ধিসমূহকে নিরন্তর সাধনের দ্বারা, একাগ্র তপস্যার দ্বারা, উদগ্র অধ্যবসায়ের দ্বারা বৃহত্তর করিয়া লইবার উৎসাহ বর্দ্ধনের জন্য এবং অধিকতর মনোবল সঞ্চয়ের জন্যই উহা করা হইয়া থাকে। সুতরাং পড়াশুনার চাপ তোমার উপরে যতই অধিক হউক, নিত্য উপাসনাকে একদিনের জন্য বা এক বেলার জন্যও অবহেলা করিও না।"

নারী-জীবনের দায়িত্ব

অপর এক পত্রলেখিকার পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"মা, তোমাদের পল্লীর প্রত্যেকটী রমণীর মনে ধর্ম্মভাব, সাত্ত্বিকী উদ্দীপনা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং সৎসাহস সঞ্চারিত করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা পাইও। প্রত্যেকের মনে দুর্দ্ধর্ষ আত্মবিশ্বাস জাগাইয়া দাও। রমণী-জীবন নিতান্তই তুচ্ছ একটা জীবন নহে, নিতান্তই অকাজে কুকাজে পুরুষের সহকারিতা করিবার জন্য নহে, শুধু খাইয়া বসিয়া শুইয়া কাটাইবার জন্য নহে, কেবলই গৃহের অন্ধকোণে আত্মগোপন করিয়া কাটাইয়া দিবার জন্য নহে। রমণীরাও জগৎকে অনেক মূল্যবান্

সম্পদ দান করিয়া যাইতে পারে এবং দেশের এই যুগসন্ধিক্ষণে প্রত্যেক রমণীকে তাহার করযুগে ধরিয়া জাতিগঠনের উপাদান ও উপকরণ-সমূহ অকাতরে পরিবেশন করিতে হইবে। ছোটকে কি করিয়া বড় করা যায়, নীচকে কি করিয়া মহৎ করা যায়, দুর্ব্বলকে কি করিয়া সবল করা যায়, কামুককে কি করিয়া নিষ্কাম করা যায়, বিক্ষিপ্ত-চেতাকে কি করিয়া আত্মস্থ করা যায়, আত্মাবজ্ঞাকারীকে কি করিয়া আত্মশ্রদ্ধী করা যায়, তাহার উপায় আজ যে দেশের রমণীদেরই অবলম্বন করিতে হইবে। আগামী যুগের বৃহৎ ও বৃহত্তর সংগ্রাম-সমূহে কি করিয়া সন্তানের জাতি জগতের বৃহত্তর সাফল্য অর্জ্জন করিয়া পুরুষ-নামের গৌরব বজায় রাখিবে, তাহার জন্য সর্ব্ববিধ আয়োজন আজ হইতেই নারীর কল্যাণহস্তকে স্পর্শ করিয়া বাহির হওয়া প্রয়োজন। রমণী-জীবনের ইহা অতি সুমহৎ দায়িত্ব। অনলস হইয়া তোমরা নিজ নিজ পল্লীর বালিকা, কিশোরী, যুবতী এবং প্রৌঢ়াদের ভিতরে নবীন প্রেরণা সৃষ্টি কর। কোমলমতি বালিকাকে আজ বুঝিতে দাও, তাহার সম্মুখে কত বড় বিশাল জীবন আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং সেই জীবনে তাহাকে কত মহৎ কার্য্য-সমূহের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। সুকুমারী কিশোরীকে আজ বুঝিতে দাও যে, প্রাণপণ যত্নে তাহাকে আত্মগঠন করিতে হইবে এবং নিজের অন্তরের সুপ্ত শক্তি-সমূহের ব্যাপকতম বিকাশ ঘটাইয়া জগতের হিতে তাহার পরিপূর্ণ

সদ্ব্যবহার তাহাকে করিতে হইবে। যৌবনপ্রাপ্তা পুষ্পসম-প্রস্ফুটিতা প্রত্যেকটী মহিলাকে বুঝিতে দাও যে, বিকশিত ইন্দ্রিয়-সমূহের সর্ব্বপ্রকার অপব্যবহার যথাসাধ্য সঙ্কুচিত করিয়া দিয়া নিজের ভাব, কর্ম্ম ও বাক্য-সমূহকে জগতের নিঃশ্রেয়স কল্যাণের দিকে পরিচালিত করিবার প্রয়োজন আজ কত অধিক। প্রৌঢ়া এবং বৃদ্ধাদিগকে নিজ নিজ অতীত জীবনের অসাফল্য বিস্মৃত হইয়া অতীতের হিতপ্রদ অভিজ্ঞান-সমূহের আলোকে উপদেশ দিয়া সমগ্র নারী-সমাজকে যুগের দাবী অনুযায়ী শুভপথে পরিচালনের জন্য যত্নবতী হইতে বাধ্য কর। নারী হইয়া জন্মিয়াছ বলিয়া তোমরা জলে ভাসিয়া যাইবার জন্য আসিয়াছ, অবিলম্বে এই কু-ধারণা বর্জ্জন কর। নারী-জীবনের দায়িত্ব নিতান্ত কম নহে এবং তাহা অতীব মহৎ ও গৌরবাবহ।"

দাম্পত্য একনিষ্ঠা

জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"অনেক দিকে অনেক রকমে নাকাল হইয়া এতদিনে নিজের মনোমত সহধর্ম্মিণী পাইতে সমর্থ হইয়াছ। এক্ষণে তোমার একমাত্র কর্ত্তব্য হইবে দাম্পত্য জীবনে পরিপূর্ণ একনিষ্ঠার সম্যক্ প্রতিষ্ঠা করা। পতি-পত্নীর মধ্যে সুগভীর একনিষ্ঠা স্থাপিত হইলে ভাবী সন্তান-সন্ততির মানসিক স্থৈর্য্য

সহজাত হয়। একনিষ্ঠ-প্রেমযুক্ত স্বামী ও পত্নীর মিলন-জাত সন্তান অতি সহজে জীবনের বিরুদ্ধ অবস্থা-সমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য এবং কুশলের শান্তিময় পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে। একথা স্মরণে রাখিয়া তোমরা উভয়ে উভয়ের প্রতি সর্ব্বতোভাবে একনিষ্ঠ হইবার জন্য চেষ্টান্বিত হও। দেহে, মনে, প্রাণে, কর্ম্মে, চিন্তায়, রুচিতে, বাক্যে ব্যবহারে এবং আহার-বিহারে সর্ব্বতোভাবে তোমরা একরূপ হইয়া যাইবার চেষ্টা কর। একজন যে অপর জনের প্রতিলিপি বা প্রতিচ্ছবি মাত্র, এই ভাবে একে অপরের সহিত মিলিয়া যাও। যে যে স্থলে ভেদ বিদ্যমান, সেই সেই স্থলে সকল ভেদকে অতিক্রম করিয়া মিল কি করিয়া স্থাপন করা যায়, তাহার জন্য উভয়ে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যাও। স্ত্রী চিরকালেই স্তনধারণ করিবে, তোমারও চিরকালই দাঁড়ী-গোফ গজাইবে। এই পার্থক্যকে দূর করিতে পারিবে না। কিন্তু এই সকল অবশ্যম্ভাবী পার্থক্য সত্ত্বেও কি করিয়া উভয়ের মনে, বাক্যে, ব্যবহারে, রুচিতে, প্রকৃতিতে, চরিত্রে পরিপূর্ণ ঐক্য স্থাপিত হইতে পারে, তাহার জন্য চেষ্টিত হও। উভয়েই এই ব্রত গ্রহণ কর যে, নিজ-সুখ-সম্পাদনের প্রতি দৃষ্টি দান না করিয়া অপরের সুখ সম্পাদনকেই একমাত্র লক্ষ্য করিবে। উভয়েই সঙ্কল্প কর যে, অপরকে সুখী করিতে যাইয়া অবশ্যম্ভাবী যে সুখ নিজের প্রাপ্য হইবে, তাহার অতিরিক্ত এক কণা সুখ অপরের কাছ হইতে আদায় করিয়া নিবার জন্য একজনেও চেষ্টা করিবে

না। একের জীবনকে নিবিড়তম ও পরিপূর্ণ সুখ, তৃপ্তি, আনন্দ এবং আত্মপ্রসাদের আগার রূপে পরিণত করিবার দিকেই অপরে লক্ষ্য রাখিবে। প্রতিটি আচরণের মধ্যে নিজের বিচক্ষণ ও সদাজাগ্রত হিসাবী বুদ্ধিটুকুকে জীয়াইয়া রাখ যে, তোমার কোন্ ব্যবহার, কিরূপ ব্যবহার, কোন্ বাক্য, কিরূপ বাক্য অপরের অধিকতম সুখ-সম্পাদন করিল। সুখ যদি দিবে, চরম সুখ দাও, চূড়ান্ত সুখ দাও, অল্প নহে, ক্ষণিক নহে। নিজের সুখের লোভে নহে, অপরের সুখ-পরিবর্দ্ধনের জন্যই তোমার উদ্ভাবনী শক্তিকে এমন পথে পরিচালিত কর যেন, ক্ষণস্থায়ী সুখকেও অতি দীর্ঘস্থায়ী সুখে পরিণত করা যাইতে পারে।

দাম্পত্য-জীবনে আদর্শবাদিতা

"উভয়ে উভয়ের মনে উচ্চ এবং পবিত্র ভাবসমূহের শ্রীবৃদ্ধি বর্দ্ধনের জন্যও চেষ্টাশীল হও। আদর্শবাদী দম্পতীর একনিষ্ঠা দীর্ঘস্থায়ী হয়। যেখানে একে অপরের কাজ হইতে নিজের সুখ ও নিজের তৃপ্তি মাত্র আদায় করিতে চাহে, সেখানে এই একনিষ্ঠা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। অর্থাৎ বাহ্যতঃ একনিষ্ঠার ভঙ্গীটুকু সমাজের ভয়ে বাঁচাইয়া চলিলেও মন বারংবার বিপথে ঘোরে। কেন না, অপরের কাছ হইতে নিজের সুখ মাত্র যে চাহে, সুখ সে অতি অল্প মাত্রায়ই পায় এবং যাহা সে পায়, তাহারও দৈহিক ও মানসিক প্রতিক্রিয়া

তাহার মনকে বিষাইয়া দেয়, দেহকে অবসন্ন করে। পরস্পরের সুখ-সম্পাদনের চেষ্টার ভিতর দিয়া দম্পতী যে সুখ আস্বাদন করে, তাহা কেবলমাত্র দৈহিক সুখেরই তৃপ্তি নহে, ভিতরে ধ্যানশীল মন আধ্যাত্মিক সুখেরও সঞ্চারণা করিতে পারে এবং এই ভাবেই অনিত্য সুখ ক্রমশঃ নিত্যসুখের পানে ধাবিত হয়। আদর্শবাদী দম্পতীর লক্ষ্য থাকে প্রথমতঃ অপরের সুখ-সম্পাদনে এবং পরিণামে তাহা রূপান্তর পায় ইন্দ্রিয়-নিরপেক্ষ, নির্ব্বিষয়, নিত্য, শাশ্বত, সনাতন ভূমাসুখের আস্বাদনে। যাহাতে তোমাদের উভয়ের আদর্শবাদিতা প্রত্যহ অল্প অল্প করিয়া বর্দ্ধিত হইতে পারে, তদনুকূল প্রয়াস এইক্ষণেই তোমাদের পাইতে হইবে।

বিবাহ ও অতীত প্রণয়

"অতীত একেবারে বিস্মৃত হইয়া যাও। সমাজের পারিপার্শ্বিক অবস্থা, এক অস্বাস্থ্যকর যৌন-আন্দোলনের অবাঞ্ছনীয় প্রসার, সভ্যতার নামে অসভ্যতার আত্মবিস্তার প্রভৃতির দরুণ কোনও যুবক বা কোনও যুবতী বিবাহের পূর্ব্বেই ইন্দ্রিয়গতভাবে অপর কোনও যুবতী বা যুবকের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকিতে পারে। প্রাচীনকালে এইরূপ আকর্ষণকে বিবাহের তুল্য জ্ঞান করা হইত এবং যাহাদের মধ্যে এইরূপ আকর্ষণ জন্মিত, তাহাদের মধ্যে বিবাহ অনুমোদন করা হইত। অধিকাংশ স্বয়ম্বর এবং গান্ধর্ব বিবাহ

কতকটা এই শ্রেণীরই ছিল। কিন্তু অতীতে যাহা সম্ভব হইয়াছে, এ যুগে নানা কারণেই তাহা সম্ভব নহে। অতীতেও সকল সময়েই সকল চেষ্টা সফল হইত না। অম্বা মন-প্রাণ শাল্বকে দিয়াছিলেন কিন্তু ভীষ্ম তাঁহাকে কাড়িয়া আনিলেন বলিয়া শাল্ব প্রত্যাখান-দ্বারা অম্বার প্রেমের মর্য্যাদাকে আঘাত করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। চখের নেশায় রূপের মোহে একজনকে মন-প্রাণ দিয়া ফেলিয়াই এযুগে তাহার সহিত বিবাহ সম্ভব হইয়া উঠে না। এই ক্ষেত্রে বিবাহ হওয়া মাত্র অতীতের প্রেম, অনুরাগ এবং ভালবাসাকে নির্ম্মম ভাবে হত্যা করিতে হইবে। তথাকথিত বস্তুতন্ত্রবাদী ঔপন্যাসিক শিরোমণিরা হয়ত এই কথাতে চটিবেন এবং ফ্রয়েড-পন্থীরা হয়ত এই কথাকে নিতান্তই অবাস্তব ও অসম্ভব বলিয়া উড়াইয়া দিবেন। কিন্তু মানুষের মনের দুর্ব্বলতাগুলি অপেক্ষা মানুষ-ব্যক্তিটা নিজে অনেক বড়। সে ইচ্ছা করিলে জগতে অনেক অসম্ভবকে সুসম্ভব করিতে পারে এবং মানুষের মত মানুষেরা অহরহ তাহা করিতেছেনও। সুতরাং উক্ত ভদ্রলোকদের রচিত সাহিত্য-সমূহের কোথাও কোথাও যে ক্লীব-জনোজিত দুর্ব্বল মনোবৃত্তির প্রশস্তি-গান হইতেছে, তাহাকে সম্পূর্ণ মিথ্যা, অবাস্তব কল্পনা এবং জাতিবিধ্বংসী কালকূট-পরিবেশন জ্ঞান করতঃ তোমাদিগকে দৃঢ় হইতে হইবে। অতীতে যে ভ্রম করিয়াছে, সে নিজেই তাহা সংশোধন করিবার শক্তি রাখে; সেই দায়িত্বও তাহার এবং তাহা

তাহারই কর্ত্তব্য। অতীতের উচ্ছৃঙ্খল ভালবাসাকে সকল দিক হইতে গুটাইয়া আনিয়া আজ তোমার বিবাহ-লব্ধ সঙ্গিনীর ভিতরে ঢালিতে হইবে এবং বিবাহ-মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে যে তোমার অতীত জীবন মুছিয়া গিয়াছে, এই কথা স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। অতীত প্রণয়কে নিতান্ত স্বপ্নদর্শন বলিয়া জ্ঞান করতঃ শাস্ত্রসম্মত আইনসম্মত সমাজসম্মত বিধিতে গৃহীত দাম্পত্য জীবনকে প্রেমানুশীলনের বৈধ, নিরাপদ এবং একমাত্র ভিত্তি বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

প্রণয়ের অভিনয়

"সৌধকিরীট বালিগঞ্জের ফ্ল্যাটের কাহিনী লইয়া রচিত উপন্যাসাবলীতে যেরূপ দেখিতে পাও, অতীত প্রণয় সকল সময়েই তেমনি করিয়া মৃত ব্যক্তির ভূতের মত পিছনে লাগিয়া থাকে না। একদা যাহাকে চ'খের নেশায় ভাল বাসিয়াছিলে বলিয়া মনে করিতেছ, হয়ত সত্য সত্যই তাহাকে একবিন্দুও ভালবাস নাই। যদি তাহার সহিত তোমার বিবাহ হইত, তাহা হইলে বিবাহের পরে একটী সপ্তাহ না ঘুরিতেই তাহা টের পাইতে। তবু যে, তাহাকে পাইলে না বলিয়া কত লম্ফন-উল্লম্ফন করিয়াছ, কত ধাবন-কুর্দ্দন চালাইয়াছ, কত দীর্ঘ নিঃশ্বাসের ঝড় বহাইয়াছ, কত অশ্রু-প্লাবন ঘটাইয়াছ, তাহা তোমার প্রেমের গভীরতার ফল নহে, তাহা তোমার চিত্ত-চপলতারই বহিঃ-প্রকাশ মাত্র। সেও হয়ত তোমাকে

একবিন্দু ভালবাসাও দিতে পারে নাই। দিতে হয়ত চাহিয়াছিল কিন্তু নিজের মোহে নিজে আবৃত বলিয়া সে তাহার অন্তরের ভালবাসাকে হৃদয়ের নিভৃত গহ্বর হইতে তুলিয়া আনিতেই পারে নাই। সেও করিয়াছে অভিনয়, তুমিও করিয়াছ অভিনয়। আর ইহা যে হইতেছে শুধু মাত্র অভিনয়, তাহা না জানিয়াই উভয়ে উভয়ের প্রতি পত্রে, বাক্যে, ব্যবহারে, কেবল অভিনয়ই করিয়া গিয়াছ। ইহা যে অভিনয়, তাহা জানিতে বুঝিতে ধরিতে পার নাই বলিয়াই অভিনয় তোমাদের এত নির্খুঁত হইয়াছে। যে তোমার জন্য কত কাঁদিয়া আকুল হইয়াছে, সুদীর্ঘ প্রেমলিপিতে নিবিড় প্রেম-সম্বোধনে তোমার সর্ব্বাঙ্গ হর্ষ-রোমাঞ্চিত করিয়াছে, হয়ত সে আজ অন্যত্র বিবাহিতা হইয়া সেইখানেই গভীর নিষ্ঠায় প্রেমের মধু পান করিতেছে। আর, যদি সে তাহা করিতে সমর্থ হইয়া না থাকে, তবে জানিও, তাহা তোমার প্রতি প্রেমবশতঃ নহে, পরন্তু তাহার চরিত্রের স্বার্থপরতা তাহাকে অন্তর-প্রদেশে সুপ্ত নিত্যধন প্রেমের সাক্ষাৎকার পাইতে বাধা দিতেছে বলিয়াই। অতএব অতীত প্রণয় সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হও এবং নূতন জীবনে নূতন ভাবে প্রেমের অনুশীলনে ব্রতী হও। অতীতে যাহাকে ভালবাসিয়াছিলে, তাহার প্রতি সামাজিক বা মানসিক, দৈহিক বা আত্মিক তোমার কোনও প্রকার কর্ত্তব্যই নাই জানিও। সে তোমার চক্ষে মৃত হইয়া যাউক। হিন্দুর সংস্কার দীক্ষা এবং

বিবাহকে নবজন্ম-গ্রহণের সমতুল বলিয়া গণনা করিয়া আসিয়াছে। সেই সংস্কার কুসংস্কার নহে, সৎ-সংস্কার।"

আচণ্ডাল-ব্রাহ্মণে ওঙ্কার-গীতি

অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"আমি দুই এক মাস মধ্যে তোমাদের অঞ্চলে তোমার গুরুভ্রাতা শ্রীমান্ অ—র গৃহে হয়ত আসিব। কবে আসিতে পারি, তারিখ শ্রীমানের নিকট খোঁজ নিয়া জানিবে। সেই সময়ে নিজের ভাবের অনুকূল আধ্যাত্মিক পন্থী যুবকদের লইয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও এবং মধুর হরি-ওঁ কীর্ত্তনে আকাশ-বাতাস পবিত্র করিয়া আমার প্রাণ-মন-বিনোদন করিও। হরি-ওঁ কীর্ত্তনের মধুময় আনন্দে যে যোগদান করে, সে আমাকে বিপুল এবং বিমল আনন্দ প্রদান করে। তোমরা যে যেখানে আছ, সর্ব্বজীবের সর্ব্ববর্ণের মধ্যে নিরঙ্কুশ মিলন ও সৌহৃদ্য-স্থাপনের উপায় স্বরূপে মঙ্গলময় হরি-ওঁ কীর্ত্তনের প্রথাকে স্বীকার ও গ্রহণ কর।

"আচণ্ডাল ব্রাহ্মণেরে ওঙ্কারের মহামন্ত্র গানে
জাগাও জাগাও আজি ব্রহ্ম-গায়ত্রীর মহাতানে।
অতীতের অন্ধকার—আত্ম-অবিশ্বাস কর দূর,
নীচতা-হীনতা-বোধ শত খণ্ডে কর আজি চূর।
বীর্য্যবান্ ব্রাহ্মণের তপস্যার কুণ্ঠাহীন বল,

ছোট-বড় সকলের মর্ম্মদেশ করুক নির্ম্মল।
ঋষি-মহর্ষির সুত ঋষি-তুল্য তপঃপুঞ্জ হোক,
স্বর্গের নন্দন-শোভা লভুক কদর্য্য মর্ত্ত্যলোক।
শোক-তাপ-জর্জ্জরিত প্রত্যেকের হৃদয়-কন্দরে,
মৃত্যুহীন পারিজাত ফুটুক আজিকে থরে থরে।

কুসঙ্গই ভুজঙ্গ

"যাহারা তোমার ইষ্টনিষ্ঠা-বর্দ্ধনের সহায়ক, তাহাদিগকে প্রাণের বন্ধু বলিয়া জানিবে। যাহাদের সংসর্গে ইষ্টনিষ্ঠা, ইষ্টভক্তি, ইষ্টানুরাগ কমে, তাহাদের সংসর্গ বিষধর ভুজঙ্গের সংসর্গ জ্ঞানে বর্জ্জন করিবে। কুসঙ্গই ভুজঙ্গ। ইহা অপেক্ষা মারাত্মক প্রাণী জগতের কোনও জঙ্গলে বা বিলে নাই। নিজের অন্তরের পবিত্র ভাব এবং বিমল আদর্শের অনুকূল ব্যক্তিগণের সংসর্গই কেবল করিবে।"

গুরুসঙ্গের আবশ্যকতা ও নিয়ম

জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সদ্‌গুরুর সঙ্গ যে শিষ্যের পক্ষে কত প্রয়োজনীয় ব্যাপার, বলিবার নহে। মাঝে মাঝে ভিতরের সৎ-সংস্কার ও সৎসঙ্কল্পগুলিকে ঝালাইয়া লইবার জন্য ইহা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু দিবারাত্র এবং বৎসরের পর বৎসর গুরুদেবের সঙ্গেই

থাকিবে, এই জাতীয় ইচ্ছার পূরণে অনেক বিপদ ও অসুবিধা আছে। শিষ্য যে গুরুর সঙ্গ করিবে, তাহাতে তাহার মনের ভঙ্গী হওয়া প্রয়োজন বিনীত ও সেবাবুদ্ধিযুক্ত। গুরুর কাছ হইতে কিছু আদায় করিবার বুদ্ধিতে নয়, গুরু নিজে দয়া করিয়া কতটুকু সম্পদ কোন সময়ে তাঁর কৃপাদৃষ্টির ভিতর দিয়া ঢালিয়া দেন, তার জন্য উন্মুখ হইয়া গুরুসঙ্গ করা প্রয়োজন। নতুবা গুরুসঙ্গের উদ্দেশ্য অনেক পরিমাণে ব্যর্থ হইয়া যায়। গুরুদেবকে নিজের আদেশ-প্রতিপালক ভৃত্যের মত জ্ঞান করা আর তাঁর উপরে দাবী-বিশেষের পূরণের জন্য চাপ দেওয়া প্রায় এক কথা জানিও। গুরুর প্রতি এই জাতীয় মনোভঙ্গী আধ্যাত্মিক সাধনের জমাট-বাঁধার বিশেষ পরিপন্থী।"

বিপদ হইতে সম্পদ আহরণ

অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"প্রাণভরা সাহস লইয়া চল। চতুর্দ্দিকের বিভীষিকা দেখিয়া ভীত হইও না। প্রত্যেকে অভয়-মন্ত্রে দীক্ষিত হও, ভয়কে পদাঘাত করিয়া দূরে অপসারিত কর। নিজ নিজ অসমসাহসের দৃষ্টান্ত দিয়া পুরুষ, নারী, বালক, বৃদ্ধ, সবল, দুর্ব্বল, সনাথ, অনাথ সকলের মনে সাহসের সঞ্চার কর। প্রাণরক্ষা বড় কথা নহে, প্রাণের মায়া প্রত্যেকে পরিত্যাগ কর। প্রাণাপেক্ষা প্রিয় বস্তুগুলির মর্য্যাদার দিকে তাকাইয়া মরণকে উপহাস

করিতে শিখ। কোনও বিপদই বৃথা আসে নাই। এই বিপদ চলিয়াও যাইবে। কিন্তু বিপদ হইতে তোমরা কতটুকু সম্পদ আহরণ করিতে পার, তাহা দেখ। বিপদ যেন বৃথা আসিয়া বৃথাই চলিয়া না যায়। বন্যা আসে, দেশ ডোবে, ফসল মরে, কিন্তু জমিতে পলিমাটীর সার রাখিয়া যায়। ঝঞ্ঝা আসে, ঘর পড়ে, মানুষ, গরু, কবুতর মরে, কিন্তু দেশের যত দূষিত বায়ু উৎক্ষিপ্ত করিয়া নিয়া যায়। তোমরা এই বিপদের বাজার হইতে কিছু সম্পদের সওদা কিনিয়া রাখ। এই জন্যই প্রত্যেকে প্রস্তুত হও। প্রত্যেকের বক্ষঃস্থল অতুল সাহসে স্ফীত হউক, ভীরুতা, কাপুরুষতা, চিত্ত-দৌর্ব্বল্য, আত্ম-অবিশ্বাস, দ্বিধা ও সংশয় দূরে যাউক।"

দেশের সেবা ও দলাদলি

অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তোমরা এক ধর্ম্মমতের যত লোক আছ, সবাই মিলিয়া একই কেন্দ্রে বসিয়া বা একই নেতৃত্বের অধীনে দুর্ভিক্ষ, বন্যা, মহামারী ও উপদ্রবের সময়ে সেবাকার্য্য করিবে, তোমাদের এইরূপ আগ্রহ স্বধর্ম্মাবলম্বীর প্রতি অতিশয় মমত্বের পরিচায়ক সন্দেহ নাই, কিন্তু এই বিষয়ে জিদ্‌কে খুব বেশী দূর পর্য্যন্ত টানিয়া নিলে তাহা একটা অবাস্তব এবং হাস্যকর ব্যাপারে পরিণত হইবে। বৃহৎ বা ব্যাপক সমস্যা-সমূহের

সমাধান-কালে সেবার প্রকৃতি অনুযায়ী সেবা-কার্য্যকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করিয়া এক এক প্রকারের সেবা-কার্য্যের ভার এক এক দল কর্ম্মীকে দিতে হয়। একই ধর্ম্মমতাবলম্বী সকল ব্যক্তিরা সকলেই যে ঠিক্ একই প্রকৃতির সেবা-কার্য্যের উপযুক্ত হইবেন, তাহা ত' নহে! এই কারণে আমার মতে যে যেই প্রকৃতির সেবা-কার্য্যের উপযুক্ত, তাহার পক্ষে সেই প্রকৃতির সেবা-বিভাগে যোগ দিয়া উপস্থিত বিপদ হইতে দেশ তথা দেশবাসীকে মুক্ত করিবার জন্য ত্বরিত হওয়া উচিত। কেহ হয়ত রাত্রি জাগিয়া কলেরা বা টাইফয়েড রোগীর সেবা-কার্য্যে অধিক পটু, কেহ হয়ত খিচুড়ী রাঁধিয়া দলে দলে নিরন্নদিগকে প্রতিদিন বেশ একটা নির্দ্দিষ্ট সময় মত খাওয়াইয়া দিতে অধিকতর পটু, কেহ বা দূরদূরান্তর হইতে বিপন্ন ও আর্ত্তদের খুঁজিয়া আনিয়া নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছাইয়া দিতে পটু, কেহ বা ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক শ্রম, দক্ষতা, সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব-সাপেক্ষ অন্যতর কঠিন কাজের পক্ষে নিতান্ত যোগ্য। যে যে কাজের যোগ্য, তাহার সেই কাজেই হাত দিয়া সেবা-কার্য্যে অবিলম্বে ব্রতী হওয়া উচিত। এই সব ব্যাপক বিপদের সময়ে যত দ্রুত কাজে হাত দেওয়া যায়, ততই মঙ্গল। বিলম্বের ফলে এমনও ঘটিয়া যাইতে পারে যে, হয়ত জাতিকে এই ক্ষতির ফল শতাব্দীর পর শতাব্দী বহন করিয়া বেড়াইতে হইবে এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া অশ্রুমোচন করিতে হইবে। যতগুলি দল

বা প্রতিষ্ঠান অগ্রসর হইয়া দেশমাতার অঙ্গের ক্ষত নিবারণে চেষ্টিতে হইয়াছেন, তাঁহাদের দলগত বুদ্ধি না রাখিয়া বা দলগত দৃষ্টি না দিয়া, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহার সহিত যোগ দিয়া দ্রুত কাজ করিতে যাহার সুবিধা হইবে, তাহার পক্ষে তাঁহার সহিত যুক্ত হইয়া পড়া একান্ত আবশ্যক। ব্যবস্থাপক-সভার সদস্য হইবার ব্যাপারে যখন ভোট লইয়া কাড়াকাড়ি পড়ে, তখন দলাদলি শোভনীয়। কিন্তু বিপন্ন দেশের সেবার কাজে দলাদলি কেবল শোচনীয়ই নহে, অতীব মারাত্মক। যাহারা এই সব দলাদলিকে ইন্ধন বা প্রশ্রয় দেয়, তাহারা দেশের শত্রু।

"আরও একটী কথা আছে। সকলে সকল স্থানে যাইয়া সকল কাজ সকল সময়ে করিতে পারে না। নিজ গৃহের নিকটবর্ত্তী স্থানে প্রতিষ্ঠিত কোনও কেন্দ্রে গিয়া সেবা দিয়া অনেকেই সঙ্গে সঙ্গে গৃহ-কর্ম্মগুলিকে অব্যাহত রাখিতে সমর্থ হয়। এই কারণেও তাহাদের পক্ষে দল-বিশেষের প্রতিষ্ঠিত সেবা-প্রতিষ্ঠানের শাখা স্থাপনের প্রতীক্ষায় বসিয়া বসিয়া দেরী করা উচিত নহে। যেখানে উদ্দেশ্য সকলের এক, সেইখানে যেই প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়াই এই উদ্দেশ্যের অংশ-বিশেষ সফল হউক না কেন, যে যেখানে আছ, সে যদি সেই স্থানে হইতে দূরে গিয়া কাজ করিতে অসমর্থ হও, তাহা হইলে সেই প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই ঢুকিয়া পড়। পৃথিবীতে

সকল দেশেই দলাদলি আছে কিন্তু চরম প্রয়োজনের মুহূর্ত্তে ভিন্ন ভিন্ন দলগুলি যেখানে মিলিয়া যাইতে সমর্থ হয়, সেইখানেই দেশলক্ষ্মীর দুঃখ, দুর্দ্দশা, দুর্ভাগ্য ও অপমান অল্প সময়ে দূর হয়।

ত্যাগ ও চিত্তশুদ্ধি

অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তুমি কিছুদিন পরে পরেই আমাকে দুই একটী করিয়া টাকা পাঠাইয়া থাক। তুমি দরিদ্র, তবু আমাকে টাকা পাঠাইবার বেলা নিজ দারিদ্র্য ভুলিয়া যাও। ইহা দ্বারা আমার প্রতি তোমার ভক্তি এবং আমার কর্ম্মের ও সাধনার প্রতি তোমার অনুরাগ সূচিত হইতেছে। ত্যাগ হইতেছে চিত্তশুদ্ধির পরিচয়-প্রদাতা। যার চিত্ত যত শুদ্ধ, তার ত্যাগের ক্ষমতা তত বেশী। ত্যাগের দ্বারা একদিকে যেমন চিত্তের মালিন্য দূর হয়, শুদ্ধতা বর্দ্ধিত হয়, চিত্তের শুদ্ধতা আসিলে তেমন ত্যাগের রুচি বাড়ে, ত্যাগের শক্তি বর্দ্ধিত হয়। অনেক ধর্ম্ম-গুরুরা যে নিজ নিজ শিষ্যদিগকে নিয়মিত ভাবে দান করিবার জন্য সুদৃঢ় নির্দ্দেশ দিয়া থাকেন, তাহা সর্ব্বক্ষেত্রেই ধর্ম্মগুরু বা পুরোহিত-সম্প্রদায়ের অর্থলিপ্সা-হেতু নহে, সঙ্গত ও প্রকৃত হেতু ইহা।

বিপন্ন-সেবা তথা প্রকৃত গুরুসেবা

"কিন্তু আমার অর্থের প্রয়োজন অতি অল্প। আমার সমাজ-কল্যাণমূলক ব্যাপক কল্পনাগুলিকে বাস্তবে রূপ দিবার সম্পর্কে যদি বল, তবু বলিব, সেই কাজেও আমার অর্থ অতীব আবশ্যকীয় নহে। আমার কল্পনা যখন তোমাদের ন্যায় শত শত পুত্রকন্যার ভিতরেও গিয়া বাসা বাঁধিতে পারিবে, সেই সময়ে এত অর্থ আপনি আসিয়া যাইবে, যাহা ঢালিয়া দিলে সপ্ত-সমুদ্র ভরাট হইয়া যাইবে। অর্থ সম্বন্ধে আমি সন্দিগ্ধও নহি, নিরাশও নহি, পরন্তু লিপ্সু নহি। আমার সমাজ-কল্যাণ পরিকল্পনাগুলি একাকী আমার জন্য নহে, একটা জাতি যাহাতে ভিক্ষার সহজ পথ পরিহার করিয়া পৌরুষের ও আত্মশক্তির কঠোর পথ বাছিয়া নিয়া নিজেদের পরিকল্পনা নিজেরা সফল করিবার জন্য নিজেদের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে পাকা করিবার উদ্দেশ্যে যত্নশীল হয়, তাহার জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান-সমূহে আমি অবশ্যই হাত দিবার সুযোগ সময় মত গ্রহণ করিব। কিন্তু তথাপি আমার অর্থের প্রয়োজন অতি অল্প। সুতরাং তোমার নিকটে আমার একটী অনুরোধ এই যে, চিত্তের শুদ্ধ প্রীতির টানে আমাকে কখনও অর্থ প্রেরণের তাগিদ অনুভব করিলে আগে একবার তোমার চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিও যে, তোমার প্রতিবেশীবর্গের মধ্যে

কোনও অভাব-গ্রস্ত ব্যক্তি আছেন কিনা, যাহাকে তোমার অবিলম্বে সাহায্য করা প্রয়োজন। যদি এইরূপ কেহ থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার ভিতরে আমিই আছি বিবেচনা করিয়া তোমার পবিত্র মুদ্রাগুলি তাঁহারই সেবায় নিয়োজিত করিও। তুমি আমাকে অতিশয় ভালবাস, অতিশয় ভক্তি কর, এই জন্যই এই এক অকাট্য সত্য কথা তোমাকে আজ শুনাইয়া রাখিতেছি যে, আমার অস্তিত্ব ঐ নিরন্নের দগ্ধ জঠরে, ঐ বস্ত্রহীনের কটিতটে, ঐ শোকাতুরার চখের জলে। এই জঠরে অন্ন দিতে হইবে, এই কটিতে বস্ত্র পরাইতে হইবে, এই চখের জল তোমাদিগকে স্নেহ-কর-পরশে মুছিয়া দিতে হইবে। দুর্ব্বলের তোমরা দুর্ব্বলতা হরণ করিবে, বিপন্নের তোমরা বিপদ নিবারণ করিবে, অনাথের তোমরা নাথ-স্বরূপ হইবে, নিরাশ্রয়কে তোমরা আশ্রয় প্রদান করিবে। জানিও বাবা, ইহাই তোমাদের প্রকৃত গুরুসেবা।"

(পঞ্চদশ খণ্ড সমাপ্ত)

পঞ্চদশ খণ্ডের বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

অখণ্ড সংহিতা

বা

পঞ্চদশ শ্রী শ্রী স্বামী খণ্ড

স্বরূপানন্দ পরমহংস দেবের

উপদেশ - বাণী

অখণ্ড সংহিতা বা

পঞ্চদশ শ্রী শ্রী স্বামী খণ্ড

স্বরূপানন্দ পরমহংস দে র

উপদেশ - বাণী

অখণ্ড - সংহিতা

পঞ্চদশ খণ্ড

অখণ্ড সংহিতা বা

ঞ্চদশ শ্রী শ্রী স্বামী খণ্ড

পানন্দ পরমহংস দেবের

উপদেশ - বাণী